

নব্য চিন্তা

নারায়ণ সান্যাল



ବାସାଙ୍ଗୀ

ନାରାୟଣ ଆଗ୍ରାଲ -

ପ୍ରେକାଶ ଭବନ

୧୫, ବହିର ଚାଟୋର୍ଡି ଷ୍ଟ୍ରିଟ

କଲିକାତା-୧୨

প্রথম সংস্করণ—অক্টোবর ১৯৬৯

প্রকাশক :

ত্ৰিংশটীক্ষনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রকাশ ভবন

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট

কলিকাতা-১২

মুদ্রক :

ত্ৰিগোপালচন্দ্র রায়

লক্ষ্মীনারায়ণ প্রেস

৬, শিবু বিহার লেন

কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ-শিল্পী

ত্ৰিভানাই পাল

কল টীকা

উৎসর্গ

কৈশোরে যার “ভূগোল” পড়ে বুঝতে শিখেছিলাম
যে বিজ্ঞান ও কাব্য-সাহিত্যের সম্পর্ক অহি-নকুলের
নয়, অগ্রজপ্রতিম সেই কবি-রাজ বলাইদা'কে—

মাগচম্পার অগ্রজ :

বকুলভদ্রা পি. এম. কাম্প (২য় সঃ)

বন্দ্যোপ

ব্রাহ্ম

যনায়া

অমলীন (৩য় সঃ)

নৈমিষায়া (২য় সঃ)

মৌলিয়ার নীল

অলকনন্দা

মহাকালের মন্দির (২য় সঃ)

দণ্ডকশব্দী (৪র্থ সঃ)

পথের মহাশয়ান

বাস্তব-বিজ্ঞান (২য় সঃ)

অপরাধ অজ্ঞা (রবীন্দ্র পুরস্কার-প্রাপ্ত

ভাষ্যের বস্তু

মতাকাম

আমি নেতাজীকে দেখেছি

নেতাজী রহস্য সন্ধান

জাপান থেকে ফিরে

কলিঙ্গের দেব-দেউল

আমি রামবিহাৰীকে দেখেছি '

॥ এক

এ কাহিনীর নারিকাকে আমি চাক্ষুষ দেখিনি, সে আমার কাছে প্রতি
মাত্র। খল-নারককে চাক্ষুষ দেখেছি বটে, তবে এ নাটকের পটোত্তলনের
অনেক আগে, প্রায় বিশ বছর আগে এবং নারককেও দেখেছি তবে নাটকের
একেবারে শেষ পর্যায়ে। ফলে এ নাটকটা আমার চোখের উপর অভি-
নীত হতে দেখিনি। আমি এর দর্শক হিসাবে কোন দাবী রাখছি না।
বিভিন্ন স্তরে টুকরা টুকরা খবর সংগ্রহ করেছি। হুম্মারবাবু এবং বাহু-
সাহেবই অধিকাংশ মাল মশলা সংগ্রহ করে বোঁগান দিয়েছেন আমাকে,
কিছুটা শুনেছিলাম মিসেস রায় চৌধুরীর কাছে। মিঃ রায় চৌধুরী অর্থাৎ
স্বতন্ত্র সরকারী এজিনিয়ার, আমার সহপাঠী এবং সহকর্মী। মিসেস রায়
চৌধুরীর বাতায়ন আছে আমার বাড়িতে, তিনিই বলেছিলেন এ গল্পটা
লিখতে। না, তুল বললাম, প্রথম অস্বরোধ করেছিল কোশিক, এ কাহিনীর
নারক। তা সে বাই হোক, মোট কথা পাঁচ জনের কাছ থেকে শুনে
গল্পটার কাঠামো খাড়া করেছি, নিজের করনা মিশিয়ে আজ লিখতে বসেছি।
এ জাতীয় কাহিনীতে নাম ধাম বদল করতে হয়, বখালাখ্য চেষ্টা করেছি।
তবু যদি আপনাদের কারও মনে হয় এ কাহিনীর কোন চরিত্রকে চেনা
চেনা ঠেকছে, সে দায় আমার নয়। সমস্ত চরিত্রই কাল্পনিক বলে গোড়াতেই
একটা কতোরা জারি করা চলত; কিন্তু সমস্তটা বেহেতু বাস্তব তাই ও
কথা বলা বোধহয় ঠিক হবেনা। 'কাল'টা সত্য, স্থান ও পাত্র আমার
কল্পনাশ্রুত। সে করনার বাস্তবের ছোঁয়া কতটা আছে, আলো আছে কিনা
তা তোল করার দায় আপনাদের। নারকের চরিত্রের ক্রমপরিবর্তনটার
আমি অভিতূত হয়েছিলাম এ কথা অনস্বীকার্য। তারপরে বাস্তবিক
উজ্জ্বলে একটা কবিত্বন কেমন করে বিকশিত হয়ে উঠতে চেয়েছিল, কি
ভাবে বারবার পাখরের প্রাচীরে প্রতিহত হয়ে কতবিকৃত হয়ে উঠেছিল
তার কবিত্বা, কিভাবে রোমাঞ্চিক ভাবানু কবি হয়ে উঠল বিদ্রোহী বাস্তব-
বাদী, তা লক্ষ্য করেছিলাম পড়ীর অভিনিবেশ মিরে। আমাকে সে বলে-

ছিল : 'ডিসপেন্স' মানুষজনদের নিয়ে তো অনেক লিখলেন, এবার না হ' 'মিসপেন্স' মানুষদের নিয়ে কিছু লিখুন।

কথাটা মনে লেগেছিল। তাকে কথা দিয়েছিলাম। কিন্তু কী :
তাতে ? 'ঘৃণ-ঘৃণ-ঘৃণ-ঘৃণাপন্নঃ' মস্তুর তো বদল হবে না। ঘৃণে ধঃ
অচলায়তনে সে কথায় কেউ কর্ণপাত করবেনা।

জি. বি. এস. এর নাটকে আখ্যানভাগটা গৌণ, মুখ্য নাটকের মুখ-
বস্তুটুকু। আমরা এ কাহিনীতেও যেমন গোয়েন্দা কাহিনীর চড়া সুগার
কোট চড়িয়েছি - তার পিছনে যে ট্রাজেডিটা রয়ে গেল সেটার কথা
গেলে কাহিনী ছেড়ে প্রবন্ধ লিখতে হয়। লাইট-ট্রিগেডের ছরশত
সোজা ছুটে চলে গেল নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে, 'সাকালো না ডাইনে
সুখালোনা কেন এ আদেশ। আমরা তাদের সে মৃত্যুভয়ী বীরাঙ্গণ
জেগে মাথা তুলিয়ে তুলিয়ে মুখস্থ করি, সানস্টোন টেকরী করে মুখস্থ করি,
ব্যাখ্যা লিখে মুখস্থ করি, এবং নির্দিষ্ট দিনে পরীক্ষার খাতায় উগ্রে দিয়ে
আমি, একবারও প্রশ্ন করিনা : আচ্ছা সেই লাইট ট্রিগেডকে ঐ ভুল নির্দেশটি
যিনি দিয়েছিলেন তাঁর কি খবর মশাই ? অথবা এমন মারাত্মক বিজ্ঞাতিক
নির্দেশটা কেমন করে এসেছিল মশাই ? সে সব প্রশ্ন অবাস্তব, সে
সব প্রশ্ন যেমন প্রশ্নপত্রে আসেনা, তেমনি পাঠকের মনেও আসেনা। আসলেও
সে সব মাথা চাপা দেওয়ার আইন আছে। মাপ্তোরমশাইকে প্রশ্ন করে
দেখবেন, তিনি প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বলবেন, সে খোঁজে তোমার কি দরকার
হে ছোকরা ?

বাস্তবিকই তো। চার্জ অফ দ্য লাইট ট্রিগেড কবিতার মাহাত্ম্য তো
মেথানে নয়। হকুম পাওয়া যায় মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে কি ভাবে ঐ 'ছরশত'
মৈনিক মরণের মুখে ছুটে চলে গেল তাই প্রতিপাদ্য বিষয়। কে ভুল নির্দেশ
দিয়েছিল, কেন দিয়েছিল, তার কোর্টমার্শাল হয়েছিল কিনা এসব অবাস্তব
প্রশ্ন কেন ? এসব প্রশ্ন অবৈধই শুধু নয়, এতে কবিতাটির মাদুর্ষ নষ্ট হয়ে
যায়। ওদের বীরত্ব গাথার অভিকূত হয়ে যদি দু ফোঁটা চোখের জল
কেনতে পার তবেই এ কবিতাপাঠ সার্থক।

আমি প্রবন্ধকার নই, জি বি. এসও নই, কলে মুখবন্ধ বন্ধ করে সরাসরি
গল্পটার নেমে পড়া যেতে পারে। গল্পের ফাঁকে ফাঁকে যদি ভুলক্রমে
প্রশ্ন করে যদি ঐ ভুল হকুমটা ধারা জারি করেছিলেন, তাঁদের কি

শাস্তি হওয়া উচিত, তাহলে সে কটা পাতা না হয় আপনারা উল্টে
যাবেন !

*

*

*

অফিসে বসে কাজ করছিলেন এম. কে. আগরওয়াল। প্রকাণ্ড বড় গ্রাসটপ
মেক্রেটারিয়েট টেবিল, গদি-আটা ঘূর্ণায়মান চেয়ার, টেবিলে কলমদানি,
টেবিল-পত্রিকা, ফাইল, কাগজচাপা আর সাদারঙের একটা টেলিফোন।
সাধনের দেওয়ালে বিজলি-চালিত দেওয়ালঘড়ি। গোপন-উৎস থেকে বিচ্ছুরিত
কন্সেন্ট বাতির কৃত্রিম আলোর ঘরটা উদ্ভাসিত। বৈদ্যুতিক পাখা নেই।

প্র-দরজা বন্ধ। পিছন দিকে প্রাচীরে গাঁথা একটা এরার-কুমার।

আগরওয়াল না-প্রোট, না বুদ্ধ। শাস্ত্রে বানপ্রস্থে যাবার নির্দেশ আছে
সে মেট বয়সে উপনীত হয়েও তিনি নতুন কোম্পানি ক্রোট করবার
ইচ্ছা রাখেন। যাকে বলে কর্মবীর। অনেকগুলি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর নাম
যুক্ত। কর্মব্যস্ত প্রায়বৃদ্ধি যে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত তা তাঁকে দেখলেই বোঝা
যায়। মুখে বার্ষিক্যের বলিরেখা পড়তে শুরু করেছে, চোখের কোণে অত্যাচারের
কালিমা, যদিও মাথার চুলগুলি আনের অব্যবহিত পরে না হলে আর সবসময়েই
কুচকুচে কালো। স্টাটেড-বুটেড নন সব সময়। কখনও কখনও তার পরশে
কৌচানে। ধূতি, সিকের পাঞ্জাবি, গলার সোনার চেন, কপালে খেঁচামনের
কৌটা। এই আজ যেমন।

আগরওয়াল-সাহেব একটা মোটা খাতার একটি যোগ অঙ্ক পরীক্ষা
করছিলেন। গভীর মনোযোগ সহকারে। পিস্তন বনোয়ারিলাল পর্দা সরিয়ে
রে ডেকে। টেবিলের উপর একখণ্ড কাগজ নিঃশব্দে রেখে যায় কাচের
কাগজ-চাপার ঢাকা দিয়ে। ধীরপদে ফিরে যায় আবার। আগরওয়াল
কন্সেন্ট করেন না। আপন মনে মোটা বাঁধানো পাতাটা পরীক্ষা করতে
কেন।

যোগ অঙ্কটা শেষ করে পেন্সিলের একটি টিক চিহ্ন দিয়ে তারপর কাগজের
করাটা টেনে নেন। বেল বাজিয়ে বনোয়ারিলালকে আবার ডাকেন : কি চার
কটা ?

বনোয়ারিলালের সঙ্গে দেখা করতে চায়, একখানা চিঠি নিয়ে এসেছে।

: চিঠি ! কার চিঠি ?

: বলছে তো স্তার, জীমুতবাহন-সাহেবের কাছ থেকে এসেছে।

●

আগরওয়ালার ক্র দুটি কুঁচকে ওঠে। কলমটা কলমদানিতে রেখে দেন।
ব্লানটপ টেবিলের উপর দু-হাতের দশটা আঙ্গুল অহেতুক টকে-টকা বাজাতে
থাকে। বোঝা যায়, তিনি কিছু একটা চিন্তা করছেন। দু'-চার সেকেন্ড।
আবার প্রশ্ন করেন : মেমসা'ব নামেনি ?

: না হজুর।

: নকুল আর রসময় আসেনি ?

: এসেছেন স্যার, নকুলবাবুই আপনাকে খবর দিতে বললেন।

: ঠিক আছে। লোকটাকে পাঠিয়ে দাও।

বনোয়ারিলালের প্রস্থানের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যে ছেলেটি ঘরে ঢোকে তার
দিকে এক নজর তাকিয়ে দেখে নিম্নেই নিশ্চিন্ত হ'লেন আগরওয়াল। লোকটি
নিতান্তই পত্রবাহক। চেয়ারে বসতে বলার প্রয়োজন নেই। পরশে খাকি
প্যান্ট; উজ্জ্বল বালাই নেই। প্রায় পায়জামার আকার ধারণ করেছে সেটা।
রবারের চঞ্চল-পরা চরণযুগল রাঙামাটির আচ্ছন্ন। গায়ে চেককাটা সস্তা
চিটের আদময়লা বুশ-সার্ট। বুক-পকেট ব্লু-ব্ল্যাক কালির মানচিত্র। বোধ-
করি ফাউন্টেন পেনটা মাঝে মাঝে খুলে যায় ওর। বছর চব্বিশ বয়স হবে
মনে হয়। চুলগুলো কৃষ্ণ অবিকৃত। দিন কয়েকের না-কামানো গালে খোঁচা
খোঁচা দাড়ি।

তা হোক। তবু ছাই চাপা আগুনের মত ঐ দীন হীন বেশবাসের মধ্যেও
মেহনতি যন্ত্রণার স্পর্শিত দেহটা দর্শনীয়। দীর্ঘ বলিষ্ঠ পেনীবহুল চেহারা।
চোখ দুটি উজ্জল। পাপোশে চটিটা ভাল করে ঘসে নিয়ে ছোকরা ঘরে ঢোকে।
দীর্ঘ যন্ত্রণাটো বিনয়ে বিগলিত হয়ে বুঁকে পড়ে নমস্কার করে।

: কী চাও প্রশ্ন করেন আগরওয়াল।

সময়মে কালির ছোপধরা বুকপকেটের গহ্বর থেকে একটি বন্ধ খাম উদ্ধার
করে সেটি এগিয়ে ধরে নিঃশব্দে। ক্রতহাতে আগরওয়াল খামটা খুলে
ফেলেন। ছোট চিঠিখানার উপর একনজর চোখ বুজিয়ে নিয়ে আবার
ক্রকুটি করেন। এবার ছেলেটিকে আশাদমস্তক দেখে নিয়ে আবার খুঁটিয়ে
চিঠিখানা দেখতে থাকেন। ছোট চিঠি, কিন্তু এবার পড়তে অনেক সময়
নিলেন তিনি। তারপর আগন্তকের দিকে সন্ধানী একজোড়া চোখের দৃষ্টি
মেলে ধরে বলেন : জীমূতবাহন মহামাত্র সাহেব তোমাকে কতদিন ধরে
চেনেন ?

ছোকরা রীতিমত ঘাবড়ে যায়। আমতা আমতা করে বলে : তা বছর দুই হল শ্রাব !

চিঠিখানা ওর দিকে বাড়িয়ে ধরে আগরওয়াল সাহেব বলেন, পড়ো তো হে চিঠিখানা।

ছেলেটি চিঠিখানা হাত বাড়িয়ে নেয়, উন্টেপান্টে দেখে কথা বলে না।

: কই পড় ?

কাঁপা কাঁপা গলায় ছোকরা বলে : আমি ইংরাজি জানি না স্যার।

: কতদূর লেখাপড়া করা হয়েছিল ?

হাতটা ঘাড়ের কাছে চলে যায়। ঘাড়টা চুলকাতে চুলকাতে বলে, ক্রাম ফাইড।

: তারপর থেকে রকুদাজি করছ ?

মাথাটা নিচু করে থাকে। হাসে কিনা বোঝা যায় না।

: ড্রাইভিং লাইসেন্স কতদিনের ?

: দু বছর শ্রাব। এর আগে ভিলাইয়ে এক সাহেবের গাড়ি চালাতাম। তা তিনি গাড়ি বেচে দিয়ে দেশে ফিরে গেলেন, তাই—

চিঠিখানা ফেরত নিয়ে আগরওয়াল বলেন, তোমাকে আমি খোলা কথা বলছি ; আমার একজন ড্রাইভারের প্রয়োজন আছে, ঠিক কথা। মহাপাত্র সাহেব তোমাকে সুপারিশ করে পাঠিয়েছেন, ঠিক কথা। কিন্তু একটা ব্যাপার আমাকে বুঝিয়ে দাও তো বাপু। সমস্ত চিঠিটা কালো কালিতে লেখা, শুধু তোমার নামটা নীল কালিতে কেন ?

ছেলেটি জবাব দেয় না। নীল কালিতে নাম লেখা হয়েছে বলে তার কেন চাকরি হবেনা তা বোধকরি বুঝে উঠতে পারে না। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। আগরওয়াল আবার বলেন, তোমাকে তিনি দু-বছর ধরে চেনেন, তাহলে তোমার নামটা কাক রেখে তিনি চিঠিখানা লিখেছিলেন কেন ?

বেকার মানুষটা হাত দুটি জোড় করে বলে : তা জানিনা হজুর। উনি বিরাট লোক, আমীর আদমী ; আমাকে দেখলে চিনতে পারবেন ; কিন্তু নামটা হস্ততো মনে করতে পারবেন না। এ সুপারিশ চিঠিখানা আমার কাকা জোগাড় করে দিয়েছেন। চিঠিখানা সাহেব নিজের হাতে লিখেছেন কিনা তাই আমি জানিনা। কাকা বললে, এই চিঠিটা নিয়ে হজুরের কাছে আসতে, তাই এসেছি।

: আচ্ছা তুমি একটু বাইরে অপেক্ষা কর ।

কোমর থেকে উদ্ধারিত ভেঙ্গে যায় । নিচু হয়ে নমস্কার করে ছেলেটি বেরিয়ে বাবার আগেই বেল বাজালেন আগরওয়াল । বনোয়ারিলালকে বললেন : লোকটাকে বাইরে বসিয়ে রাখ । ব্যাটা ভেগে না পড়ে । মালপত্র এনেছে কিছু ?

: আচ্ছা ইয়া হুজুর । একটা টিনের প্যাটরা আর বিস্তারা ।

: ঠিক আছে । নজর রেখ, কেটে না পড়ে ।

বনোয়ারিলাল বেরিয়ে বাবার সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোনটা তুলে নেন । শ্রীমুতবাহন মহাপাত্রের নাথারটা ডায়াল করতে থাকেন । যে দিনকাল পড়েছে, কাউকে বিশ্বাস নেই । ড্রাইভারের প্রয়োজন তাঁর আছে ঠিকই । ক'দিন আগে একটা কক্‌টেইল পার্টিতে মহাপাত্র সাহেবই তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন একজন ড্রাইভার রাখতে : বলেছিলেন আপনি এ ভাবে আর নিজে ড্রাইভ করবেন না কিছু । এই নীতেই কি অপারেশন করানো যাবে ? কি বলছে ডাক্তার ?

: বলছে তো এখনও ঠিকমত পাকেনি । আরও মাস ছয় সময় লাগবে । ব্রাডস্‌গারটাও রয়েছে তো । চোখটা কাটানোর আগে সেটাও কমানো স্বরকার ।

: তাহলে একটা ড্রাইভার রাখুন ক'মাসের জন্য ।

গলাটা খাটো করে আগরওয়াল বলেছিলেন, আপনি তো সবই জানেন আর ; বেগানী লোক কারবারে ঢোকাতে চাই না । ড্রাইভার মানেই সে বেটা সঙ্গে সঙ্গে ঘুরবে । কখন কোথায় যাচ্ছি, কি করছি, গাড়িতে বসে কার সঙ্গে কি কথা বলছি—

মহাপাত্রের ততক্ষণে বেশ নেশা ধরে গিয়েছিল, হেসে বলেছিলেন, অনেক তো বরস হল আগরওয়াল সা'ব, এ বরসে আর ডন-জুরানি খেলাটা নাই খেললেন ?

সত্যিকারের লজ্জা না পেলেও আগরওয়াল সলজ্জ হওয়ার অভিনয় করেছিলেন । তাড়াতাড়ি চাপা গলায় বলেছিলেন : না, না, সে সব কিছু নয় । তবে আমার বিনম্রের ব্যাপারটাতো জানেন, আপনার কাছে আর কি লুকাবো—কোন হুজ্রে ড্রাইভারের ছদ্মবেশে এক বেটা বিভীষণ ঢুকে পড়বে—

মহাপাত্র এবার গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন : আমি জানি! আপনি কিছু ভাববেন না । খুব বিশ্বস্ত একজন লোক দেব আপনাকে ।

আগরওয়াল মনে মনে হেসেছিলেন। মহাপাত্র নিজেই বে কিছুদিন ধরে আগরওয়ালের কারবারের ছিন্ন অন্বেষণ করতে উঠে পড়ে লেগেছেন, এ কথা জানা ছিল তাঁর ভাল করেই। তাঁর উদ্দেশ্যটা আন্দাজ করতে অসুবিধা হয় না; কিন্তু মুখে তিনি একেবারে নিশ্চিন্ত হওয়ার ভাব ফুটিয়ে বলেছিলেন, আপনার লোক হলে অবশ্য অন্য কথা। তবে লেগা পড়া জানা লোক পাঠাবেন না, এনেই ইউনিয়ানের পাণ্ডাগিরি করতে চাইবে—

মহাপাত্র হেসে বলেছিলেন, বেশ বেশ, গওমূর্খ ই পাঠাবো একটি !

সেই মহাপাত্রের সুপারিশ নিয়ে এসেছে এই গওমূর্খ ছোকরা। জীমূতবাহন মহাপাত্র অত্যন্ত প্রকাডাজন ব্যক্তি। বয়সে বোধকরি আগরওয়ালের চেয়ে কিছু ছোটই হবেন, অর্থসম্পদেও ধনকুবের আগরওয়ালের নাগাল পান নি, কিন্তু পদমর্যাদায় তিনি আগরওয়ালের নমস্। আটকশোর দেশসেবা করে এসেছেন জীমূতবাহন। গত বিশবছরের হিসাব বাদ দিলে তাঁর কর্মজীবনে কারাবাসের সময়টা বড় কম নয়। খন্দর ছাড়া পরেন না এবং বিশবছর রাজনীতির ট্রপিক্সে খেলা দেখাতে গিয়ে পা-পিছলেও কখন পড়েন না। পর পর তিনবার নির্বাচনে জয়যুক্ত হয়েছেন, একই কেন্দ্র থেকে, এই জেলা-সদর শহর থেকে। স্বাধীনতার পর প্রথম পাঁচবছর ছিলেন বিধানসভার সভ্য। পরের দুটি নির্বাচনে গিয়েছিলেন লোকসভায়। রাজি হলে অনারাসে তিনি মন্ত্রী করতে পারতেন; কিন্তু তিনি রাজি হন নি। বাইরের লোক অথবা প্রেসের লোকেরা প্রশ্ন করলে তিনি বলতেন গদিতে বসবার কোন বাসনা নেই তাঁর, আজীবন তিনি দেশের সামান্য সেবক হিসাবেই কাজ করে যেতে চান। আর ঘনিষ্ঠ মহলে কেউ এ প্রশ্ন করলে বলতেন, ডি. এল. রায়ের ‘চন্দ্রগুপ্ত’ পড়েছ? তার হিরো কে? চন্দ্রগুপ্ত না চাণক্য? ‘কিং’ হতে চাননা তিনি, ‘কিং-মেকার’ হয়েই থাকতে চান। এ জেলার, শুধু এ জেলার কেন, এ দেশের রাজনীতি সম্বন্ধে যার বিন্দুমাত্র ধারণা আছে সেই জানে জীমূতবাহন যতদিন বাঁচবেন ‘পোর্ট-ফোলিও-হীন’ সামান্য দেশ-সেবক হিসাবে, দীন-হীন ‘কিং-মেকার’ হিসাবেই ত-কুড়ি-সাতের খেলা খেলে যাবেন। আগামী নির্বাচনে তিনি জিতবেন কিনা এ প্রশ্নটা কেউ করে না। প্রতিপক্ষ ডাঃ সুলতান আলির জামানতটা জব্ব হবে কি না এ সম্বন্ধেই বরং কিছু মতভেদ শোনা যায়—শহরের বিভিন্ন চারের দোকানে, কাবে, রক-আড্ডায়।

এ ছেন জীমূতবাহনের সুপারিশ মানেই আদেশ। কিন্তু আগরওয়ালও

টপিকের খেলার ওস্তাদ গেলোরিড। তাঁর পথও কুরশু ধারা। বিদ্যুদ্ভাষী
 বিচ্যুতি মানেই একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যাওয়া। গত বিশ্ববছর ধরে তিনি
 চেয়ার-অফ-কমার্সের রক্তকুমিতে যে খেলাটা দেখাচ্ছেন, মস্তীত চালানোর
 চেয়ে তাও কিছু কম রোমাঞ্চকর নয়। তাই তাঁকেও খুব সাবধানে পদক্ষেপ
 করতে হয়। ও চোকরা যে চিঠিখানা এনেছে তা জীমুতবাহনের লেটার-হেড
 প্যাডের কাগজে হাতে লেখা ইংরাজী চিঠি—টাইপ করা নয়। তিনি লিখেছেন,
 পত্রবাহক তাঁর বিশেষ পরিচিত এবং একান্ত বিশ্বাসভাজন। কিন্তু একটা খটকা
 লেগেছে আগরওয়ালের। এ হেন বিশেষ পরিচিত এবং বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিটির
 নামটা একই কালিতে লেখা হল না কেন? অবশ্য চিঠির নিচে যে সইটা
 আছে সেটা জীমুতবাহনের এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। এ স্বাক্ষর তাঁর
 চেমা। তবু সাবধানের মার নেই। লোকটাকে বাইরে বসিয়ে রেখে
 টেলিফোনে মহাপাত্র সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করেন : হ্যালো, মহাপাত্র
 সাহেব কি—

: কী খবর, আগরওয়াল সা'ব ? ইয়া, আমিই কথা বলছি—

এটা জীমুতবাহনের একটা বৈশিষ্ট্য। পরিচিত কেউ তাঁকে ফোন করে
 আত্মপরিচয় দেবার সুযোগ পায় না। কর্তৃকর শুনেই উনি বলে ওঠেন : কে,
 মুখাজি ? আরে, মিসেস্ পাকড়াশি যে, অনেক দিন পরে অধ্যমকে স্মরণ
 করেছেন, কি খবর ? অথবা আই থিংক ইট্‌স্‌ রাঘবন অন্‌ দি আদার এণ্ড,
 হ্যালো হোয়াট নিউস ? মহাপাত্র সাহেবের একান্ত-সচিবের পরিসংখ্যান
 অনুসারে শতকরা পঁচানব্বইটি ক্ষেত্রেই অনুমান নির্ভুল বলে প্রমাণিত হয় ;
 শতকরা পঞ্চাশটি ক্ষেত্রে জবাব হয়, গলার স্বর শুনেই কেমন করে চিনলেন ?
 মহাপাত্র তখনও রহস্য করে বলতেন, গলার স্বর তো দূরের কথা, টেলিফোনে
 রিঙ টোন শুনে বুঝেছি আপনি ; অথবা আপনি কি বাইরের লোক,
 আপনজনের গলার স্বর শুনে চিনব না ? কিংবা মহিলা হলে বলেন, কর্তা যখন
 শুধু কড়া নাড়ে চিনতে পারেন কেমন করে ?

এ ক্ষেত্রেও আগরওয়াল প্রত্যুত্তর করার পূর্বেই উনি নিশ্চিন্ত হয়ে বলেন :
 আপনার ডাইভার পৌঁছেছে ?

: আপনি পাঠিয়েছেন কাউকে ?

: ভিয়ার মি ! এখনও রিপোর্ট করেনি ?

: কী নাম বলুন তো লোকটার ?

: বিত্ত। বিশ্বনাথ দাস। আজকালের মধ্যেই যাবে।

: যাক, তাহলে আপনারই লোক ঐ বিত্ত দাস?

: তার মানে? ও দেখা করেছে আপনার সঙ্গে? আমার চিঠি দেখার নি?

আগরওয়াল হেসে বলেন, হেঁপিয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি আমার একটু সন্দেহ হয়েছিল। প্রথমতঃ চেহারা ঠিক ডাউডাব ক্লাসের নয়, কেমন যেন ছাত্র ছাত্র গন্ধ!

হো হো করে হেসে ওঠেন জীমুতবাহন : ছাত্র-ছাত্র গন্ধ আবার কি মশাই? ছাত্রদের গারে আবার বিশেষ কোন গন্ধ থাকে নাকি?

আগরওয়ালও হেসে বলেন : আপনি রাজনীতি করেন, আপনি নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন—ছাত্র গন্ধ, মজদুর সুবাস, মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের মৌরভ অথবা নক্সালবাদি সৌগন্ধ এসব আপনি আমার চেয়ে ভাল বোঝেন—

হাসতে হাসতে মহাপাত্র বলেন, তা যেন হল আর দ্বিতীয়তঃ?

: দ্বিতীয়তঃ আপনি লিখেছেন ছোকরাটি আপনার বিশেষ পরিচিত, অথচ তার নামটা আপনি চিঠি লেখার সময় মনে করতে পারেন নি। সমস্ত চিঠিটা কালো কালিতে লেখা, শুধু নাম নীল কালিতে। সন্দেহ হওয়ারই কথা—

আগর দিলখোলা হাসির জলতরঙ্গ ভেসে আসে বৈজ্ঞাতিক তরঙ্গ বেয়ে : এত পাকা খেলায়াড় আপনি, আর এটা বুঝলেন না? গোটা চিঠিটা আমার নিজের হাতে লেখা নয়। একজনকে বলেছি সে লিখে দিয়েছে। শুধু পত্র-বাহকের নামটা আর সইটা আমার নিজের হাতে লেখা।

: সে সম্ভাবনাও মনে হয়েছিল আমার। দেখলাম সইটা আপনি ঐ কালো কালিতেই করেছেন, একটু কলমে, শুধু পত্রবাহকের নামটুকু তির কলমে নীল কালিতে লেখা।

মহাপাত্র তৎক্ষণাৎ সম্ভাবজনক কৈফিয়ৎ দাখিল করেন, তার কারণ যিনি চিঠিখানা লিখে দিয়েছিলেন তাঁরই কলমটা নিয়ে আমি স্বাক্ষর করেছিলাম। কিন্তু পত্রবাহকের নামটা বসিয়েছি অনেক পরে, পত্র লেখকের গ্রহান-অস্তে। আপনার ব্যাপার তো, তাই এই বিস্তৃপ্ত সাবধানতা। ডান হাতে কি দিই বা হাতকে জানতে দিই না!

এতকণে ওর হাসির জলতরঙ্গ আগরওয়ালের কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে। মিষ্টি হাসিটা কিরিয়ে দিয়ে আগরওয়াল বলেন : এটা কিন্তু বেশ বলেছেন স্যার! বা-হাতে কি নিলেন, ডান হাতকে তা জানতে দেন না।

হুজনেই একসঙ্গে রিসিভার দুটো নামিয়ে রাখেন।

এর বেশী টেলিকোনে বলতে নেই। শেরানে শেরানে যখন কোলাহুলি হয় তখন এমনি আকারে ইজিতেই তা হওয়া বাছনীয়। মনে মনে খুশী হয়ে ওঠেন আগরওয়ার। বেশ মুখের মতন জবাবটা দিয়েছেন তিনি। জীমুতবাহনের কাছ থেকে তিনি পেয়েছেন প্রচুর, দিয়েছেন প্রচুরতর। না, ভুল হল। জীমুতবাহন প্রচুর দেন নি, তিনি না-দিয়েছেন প্রচুর এবং সেই না-দেওয়ার জন্তই তাঁকে প্রতিদান দিতে হয়েছে প্রচুরতর পরিমাণে। জীমুতবাহনের সেই না-দেওয়ার জন্তই যে তিনি কৃতজ্ঞ। জীমুতবাহন বাধা দেন নি, জীমুতবাহন চোখ বুঁজে থেকেছেন, এটুকুই তাঁর তরফে দান। পরিবর্তে আগরওয়ার বা দিয়েছেন তা না-ধর্মী নয়, নগদে।

আবার ডাক পড়ে বিত্ত ড্রাইভারের। গরু-চোরের ভজিতে সেই পাংলুন-প্যাটধারী লোকটা তার সুগঠিত বলিষ্ঠ দেহটা ছুজ করে এসে দাঁড়ায়। মালিক এবার সরাসরি কাজের কথাই নেমে পড়েন : দেখ বাপু, ড্রাইভারের আমার সতিয়ই কোন প্রয়োজন নেই। শুধু মহাপাত্র সাহেবকে খুশী করতে তোমাকে নেওয়া। এখন কত টাকা মাইনে চাও বল ?

: আমি আবার কি বলব স্যার ? দরদারি করে যা দেবেন—

: বাজে কথা বলনা। আমি যদি বলি পনের টাকা মাস মাইনা, তাতে রাজি হবে তুমি ?

ছেলেটি ষাড় চুলকাতে চুলকাতে বলে : অমন অক্লান্ত কথাটা আপনি বলতেই পারবেন না।

: হ্যাঁ। অক্লান্ত কথা আমি বলি। ক্লান্ত কথাটা শোন। তোমাকে আপাতত পঞ্চাশটাকা করে দেব। খাওয়া-খাওয়া ক্রি। যদি দেখি তুমি কাজের লোক তাহলে একমাস পরে আরও দশটাকা বাড়িয়ে দেব।

লোকটা কাতরভাবে বলে, দরদারি করছি না স্যার, তবে এর আগে ভিনাইসাহেবের কাছে আশিটাকা পেতাম। অন্ততঃ গোটা মাসের আমি আশা করেছিলাম স্যার।

: না। ঐ বা বলেছি ওর এক পরসাগ বেশি নয়। তোমাকে আগেই বলেছি ড্রাইভারের আমার সতিয়ই কোন প্রয়োজন নেই। নেহাৎ মহাপাত্র-সাহেবের মত মানী লোক তোমাকে সুপারিশ করে পাঠিয়েছেন, তাই !

: বেশ স্যার, আমি তাতেই রাজি।

: বাড়ি কোথায়? সেখানে কে কে আছে?

: বাড়ি শুয়া-হাবড়া, বনগাঁর কাছে। বাবা আছে। আর কেউ নেই।

: বিয়ে কর নি?

: না স্তার, খাওয়ার কি?

: তবে আর কি? খাওয়া-খাকার খরচা নেই। এক সেট ডাইভারের পোষাকও না হয় দেওয়া বাবে তোমাকে। তোমার তো এ কেরে পকাশ টাকার খুশী হওয়ার কথা।

: আমি খুশীই হয়েছি স্তার।

আগরওয়ারাল গভীর হয়ে বলেন, তুমি ঐ ফিয়াট গাড়ীটা চালাবে। যার হকুম তোমাকে চলতে হবে তাঁকে তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। ছুটো কথা বলব, এক নম্বর, ঐ ইউনিয়নের মধ্যে মাথা গলাবে না। পাণ্ডা-গিরি করতে যেও না, মারা পড়বে। আর দু' নম্বর, যা দেখবে যা শুনে দেওয়ালের কাছেও গল্প করবেনা। গাড়ি কখন কোথায় যায়, কে কি করে এ সব কোন কথা কারও মধ্যে আলোচনা করবে না। এমন কি আমার অফিসের কেউ জিজ্ঞাসা করলেও বলবে না।

বিশ্ব বলে: আজ থেকে স্তার আমি অন্ধ আর কালা।

আগরওয়ারাল হেসে বলেন: একেবারে কালা হয়ো না বাপু, ডাকলে সাড়া দিও। একেবারে অন্ধও হয়ো না, চোখ খুলে গাড়ি চালিও।

সাহেবরা রসিকতা করলে হাসতে নেই। মাথা নিচু করতে চয়। এটুকু শালীনতা জান বিশ্ব দাসের আছে দেখে খুশী হলেন সাহেব। বেল বাজিয়ে বনোয়ারিলালকে ডেকে বলেন মেস সা'ব নেমেছেন?

: ইয়া হুজুর।

: তবে সেলাম দেও।

বনোয়ারিলালের প্রস্থানের অল্প পরেই তুলে উঠল পর্দাটা। ঘরে ঢুকলেন যে ভহ্মহিলা তাঁর বয়স কুড়ি একশ চতে পারে। পরনে সাদা রঙের একটা সিকন। খাটো চোম্বী ধরনের ব্লাউস। নীবিবন্ধের কাছে অনেকটা খনাকুত। কণ্ঠে কোন আভরণ নেই। কাশে সবুজ পাখিরের এক জোড়া তুল। এক হাতে এক গাছি বালা, অপর হাতে সাদা নাইলনের ব্যাগে বাঁধা হাতখড়ি। সন্ধ্যা মান করে এসেছেন মনে হয়। মাথার আজগা একটা খোঁপা কাঁধের উপর ভেঁজে পড়েছে। এসাধন উগ্র নয় ঘোটেই। সন্তোষাতা মেয়েটি শ্রিতহাস্তে

একটা প্রকৃত্তার হাওয়া বয়ে নিয়ে এল যেন। একটু অপ্রস্তুতের হাসি হেসে বসতে যাচ্ছিলেন কোন একটা কথা। বোধকরি বিজয় হওয়ার কৈফিয়ৎ ; হঠাৎ ঘরের ভিতর তৃতীয় একজনকে দেখে থমকে থমে পড়েন। এ জাতীয় একটা প্রাণী যে ঘরে আছে তা তিনি অনুমান করেন নি। আপাদমস্তক লোকটিকে ঘাচাই করে নিতে চান। ড্রাইভার কিন্তু চোখাচোখি হতেই দৃষ্টি নত ক'রে। আগরওয়াল রকিং চেয়ারটার হেলান দিয়ে দোল খাচ্ছিলেন এ এক, উপভোগ্য একটা দৃশ্য দেখতে দেখতে। মহিলাটি ঘুরে তাঁর মুখোমুখি হতেই তার জিজ্ঞাসু দৃষ্টির কৈফিয়ৎ চিন্তাবেই যেন বলে ওঠেন : গুড মনিং লেডী চ্যাটার্লি ! লেট মি হাভ দ্য অনার অফ ইন্ট্রাডিউসিং মাই নিউ ড্রাইভার টু য়োর লেডিশীপ !

‘লেডী চ্যাটার্লি’ বলে যাকে সম্বোধন করা হল তিনি ধীরে ধীরে আসন গ্রহণ করেন। একবার আড় চোখে দেখে নেন তৃতীয় ব্যক্তিটির দিকে। মুখখানা ক্রমশঃ লাল হয়ে ওঠে তাঁর। দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরেন। কয়েক সেকেন্ড বোধহয় ভাষা খুঁজে পাননা তিনি। তার পর ইংরাজিতে প্রশ্ন করেন : হোয়াট মেক্স যু সো ফিল্মথিলি জোভিয়াল মিঃ আগরওয়াল ?

আগরওয়াল কিন্তু তখনও হাসছেন। ইংরাজিতেই কবাব দেন তিনি : ভয় নেই সূজাতা, ও ক্রাস ফাইভ পর্যন্ত পড়েছে। লরেন্স ওর কাছে গ্রীক !

তারপর বিস্তর দিকে ফিরে বলেন : ইনি মিস্ চ্যাটার্লি। হুমি আমার গাড়ি চালাবে না, এঁর গাড়ি চালাবে। যখন যেখানে যেতে চাইবেন নিয়ে যাবে। অল্প কেউ গাড়ি ব্যবহার করতে পারবে না এঁর অল্পমতি ছাড়া। যখন যেখানে যাবে, যত মাইল ঘুরবে তা লগ্ বুকে লিখিয়ে নেবে এঁকে দিয়ে, কিন্তু পেট্রল, মবিল, ডিফ্রিল ওয়াটার, জুট-কাড়ন ইত্যাদি তোমার বা যখন চাই তা নকুলবাবুর কাছে চাইবে। এঁকে বিরক্ত করবে না। মনে রেখ, ইনিই তোমার মালিক, এঁকে খুলী রাখতে পারলেই তোমার চাকরি থাকবে। এখন বাইরে অপেক্ষা কর। উনি একটু পরেই যাচ্ছেন।

বিশ ড্রাইভার হাত দুটি জোড় করে নমস্কার করে। একবার না হু-বার। পালাবার পথ পেয়ে সে যেন বেঁচে যায়। শুৎকণাৎ বেরিয়ে যাব মর ছেড়ে।

আগরওয়াল মুখে হাসি টেনে এনে বলেন, তুমি আমার রসিকতার চটে
গেছ মনে হচ্ছে।

মিস্ চ্যাটার্জি গম্ভীর হয়ে বলেন, না চটিনি। ভালগারিটি বাধ দিয়েও
যে রসিকতা করা যায়, এটা আপনার জানা নেই তা আমি জানি।

: বিশ্বাস কর, ও ছোকরা বিন্দু-বিসর্গ বোঝেনি। ওকে দেখেই
কেন জানি আমার সেই লেডি চ্যাটার্জির ল্যাভারের কথা মনে পড়ে গেল।
চমৎকার হাস্য ছোকরার!

: ও কথা থাক। ডেকে পাঠিয়েছিলেন কেন? কাজের কথা বলুন।

আগরওয়াল হেসে বলেন এই তো কাজের কথা স্বজ্ঞাত। তুমি স্বন্দর,
রাগলে তোমাকে আরও স্বন্দর দেখায় এই সব কথা বলবার জন্যই তো যাদে
দু-তিনবার এখানে ছুটে আসি!

স্বজ্ঞাতা আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

: বস বস! আচ্ছা শোন, কাজের কথাই বলি। আজ বিকালে আমাকে
কলকাতা যেতে হচ্ছে। নেক্সট বুধবারে আবার আসব। আর রেলওয়ের
অর্ডারটা আমি ক্যানসেল করে দিলাম।

স্বজ্ঞাতা চলে যাবে বলেই উঠে দাঁড়িয়েছিল, এ কথায় আবার বসে পড়ে।
বলে, ক্যানসেল ক'রে দিলেন? মহাপাত্র সাহেবকে অত ধরাধরি করে
অর্ডারটা আমি আদায় করলাম আর আপনি সেটা প্রত্যাখ্যান করলেন?

: যে দামে আমরা মাল তৈরী করছি তাতে আমাদের কাউকে ধরাধরি
করতে হবে না। ঘরে বসেই আমরা যথেষ্ট অর্ডার পাব।

: তা হোক, তবু রেলওয়ের অত বড় অর্ডার—

: অত বড় অর্ডার বলেই তা নিতে পারলাম না। অত মাল আমরা
সময় মত দিয়ে উঠতে পারব না। শেষ পর্বন্ত হেভি পেনাল্টি দিতে হবে।

স্বজ্ঞাতা দৃঢ় প্রতিবাদ করে, আমি একটা কথা কিছুতেই বুঝে উঠতে
পারিনি। আপনি প্রডাক্টসান বাড়াবার চেষ্টা করছেন না কেন? কিছু
লোক বাড়ালেই তো তা করা যায়। কাঁচা মালের অভাব নেই, ক্যাপিটালের
অভাব নেই, মার্কেটের অভাব নেই, ওয়াকিং স্পেসও যথেষ্ট। তবু আপনি
ঐ দশটি লেবার নিয়ে টুক টুক করে ছেলে খেলা করছেন—

বাধা দিয়ে আগরওয়াল বলেন, লেবার ট্রেন্ড কেন বাড়তে চাই না তা
তো তুমি জান স্বজ্ঞাত।

: না জানি। আপনি বলেন, মজদুরের সংখ্যা বৃদ্ধি হলে আমাদের বিসনেস সিক্রেটটা জানাজানি হয়ে যাবে। তার কোন বৃদ্ধি নেই। কুলিরা তো নির্দেশমত গত্তরে খেটে কাজ করবে। আপনার সিক্রেট ওরা জানবে কেমন করে ?

আগরওয়াল এবার স্পষ্টই বিরক্ত হলেন, বলেন, তোমার ভালর জগুই বা কিছু করছি আমি। এ বিসনেসের সিক্রেট তথ্যটা কি তা তুমি জাননা, আমি জানি। কেমন করে সে গোপনীয়তা রক্ষা করব তাও আমাকে স্থির করতে দাও। তুমি শুধু নিজের লভ্যাংশটা ঠিকমত পাচ্ছ কিনা হিসাব রেখ। ঐ একটি হিসাব তুমি ঠিকমত দেখে নিচ্ছ এটুকু জানতে পারলেই আমি নিশ্চিত থাকব। তোমার লাভের হিসাবটা।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে সূজাতার। আবার উঠে পড়ে সে চেয়ার ছেড়ে। যাবার আগে শুধু বলে, আপনার জাল কেটে বেরিয়ে যাবার পথ আমি রাখিনি, এ কথা আপনি ভালভাবেই জানেন। আর তাই বারে বারে আমার লাভের অঙ্কটার উল্লেখ করেন আপনি। কিন্তু আমার লোকসানের খতিয়ানটা আপনি খতিয়ে দেখেছেন কোন দিন ?

: সূজাতা প্রীম্। ডোন্ট বি সেন্টিমেন্টাল।

: আপনি যে সাহায্য আমার বাবাকে এবং আমাকে করতে চেয়েছেন তার জন্ত আমরা কৃতজ্ঞ ; কিন্তু তার পরিবর্তে আমরা কি দিয়েছি তা কি কখনও হিসাব করে দেখেছেন ? আপনার জমার খাতাটা ?

: সূজাতা—

কিন্তু সূজাতা আর অপেক্ষা করে না। ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যায় ঘর ছেড়ে।

আগরওয়াল মনে মনে একটু হাসেন। একটু আগে তিনিও কি ঠিক ঐ কথাই বলেন নি দীমুতখানকে ? ডান হাতে দেওয়া আর বাঁ-হাতে নেওয়ার প্রসঙ্গে ?

কিন্তু কথাটা তো ও মিথ্যা বলেনি। তিনি সূজাতাকে কী দিতে পেরেছেন ? কিছুটা নিরাপত্তা, কিছুটা স্বচ্ছন্দ জীবনের উপকরণ, আর ভবিষ্যতের একটা রঙীন স্বপ্ন ! কিন্তু বিনিময়ে ঐ কুমারী ঘেরেটা যে তাঁকে তার সবকিছুই দিতে উত্তম হয়েছে। সত্যিই তো এ জাল কেটে বেরিয়ে যাবার পথ সে রাখেনি। জালে ধরা পড়েও হার যানে নি, কিন্তু—

আচ্ছা, ওর বক্তব্যের মধ্যে কি কোন অন্তর্গত ব্যঙ্গনা আছে! ডক্টর চাটার্জির মৃত্যু সংক্রান্ত কোন ইঙ্গিত কি দিয়ে গেল ঘেরেটা। বোধহয় নয়। এ নিছক অভিমান। তা অভিমান করতে পারে স্বভাবত। হঠাৎ হাসি পায় আগরওয়ালার। এই বুক বরসে তিনি কি নতুন করে সেক্টিয়েন্টাল হয়ে পড়ছেন নাকি? না হলে যেহেতু মাহুকের অভিমান নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন তিনি? তিনি! ময়ূরকেতন আগরওয়াল?

॥ দুই ॥

ই।।। ময়ূরকেতন আগরওয়াল। এ নাটকে সেই আগরওয়াল প্রথম দৃষ্টের প্রথম দৃষ্টে যখন রক্তমণ্ডকে প্রবেশ করেছে তখন সে বাহার বছরের বৃদ্ধ। তার বাঁ চোখে ছানি পড়তে শুরু করেছে, সে একটু কুঁজো হয়ে যাচ্ছে, তার গালে গলার চামড়া খুলে পড়তে আরম্ভ করেছে, তার চুলে কলপের ধার চোখের কোণে অত্যাচারের কালিয়া। সে একটু অকালেই বুড়িয়েছে যাতে। চবিও জমেছে দেহে, এ্যালকহলিক ফ্যাট। কিন্তু আমি যখন তাকে প্রথম দেখি তখন সে বজ্রিশ বছরের যুবা। তখন সে সত্যিই ডন-জুয়ান। বেশ বছর আপেকার কথা বলছি আমি। তাকে একবারই দেখেছিলাম, বিচিত্র পরিবেশে। ধূমকেতুর মত লোকটা এসেছিল আমার জীবনপথে, ধূমকেতুর মতই মিলিয়ে গিয়েছিল হঠাৎ। কোথা থেকে এল, কোন মহাকাশে সে বিলীন হয়ে গেল তার পাভাই পাওয়া যায়নি। হেলীর ধূমকেতুর মত সে যে আবার অতিদীর্ঘ পথ পরিক্রমা সমাপ্ত করে আমার জানা জ্বলন্ত কখনও কিরে আসবে একথা সেদিন ভাবিনি। শুধু যে অদ্ভুত পরিস্থিতিতে লোকটাকে একবার যাত্রা দেখেছিলাম, তাতে এ দীর্ঘ বিশ বছর ব্যয়ধানেও তাকে ভুলতে পারিনি আমি। ওর নামটাও যে বড় অদ্ভুত—ময়ূরকেতন আগরওয়াল।

তখন আমি সবে চাকরিতে ঢুকেছি, সরকারী পূর্ত-বিভাগে। সাদা বাঙালার পি. ডাব্লু ডি-এর এ্যাসিস্টেন্ট এজিনিয়াররূপে। উনিশ শ' আটচল্লিশ সালের কথা বলছি। তখন এজিনিয়ারদের কাছে চাকরির বাজারটা ছিল

সন্ধ্যা বেলায় চৌরঙ্গী এলাকায় ট্যাক্সি ড্রাইভারদের মত। ডিগ্রিধারীদের তুলনায় চাকরি দেনেওয়ালারা সংখ্যায় ছিল বেশী। যদি বা কোন এজিনিয়ার ঘটনাচক্রে চাকরি পোয়ায় তবে সহজে সে সেকথা স্বীকার করে না। যিটারে 'গ্যারেজ' অথবা 'ডিফেক্টিভ' বোর্ড টাঙিয়ে বাজার ঘাটাই করতে থাকে। লম্বা-পাল্লার যাত্রী খোঁজে। আজকে যারা বাস্তবিকতার ডিগ্রিটা কোলিও ব্যাগে ভরে চাকরির সন্ধানে ঘরে ঘরে ব্যর্থ সন্ধানে ঘুরে মরছে, রাত দশটার হাওড়া-স্টেশন ফেরত কাঁক বাঁধা খালি ট্যাক্সির মত তাদের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন হবে যে আমি যেদিন সরকারী চাকরিতে প্রথম প্রবেশ করি সেদিনও আমি পুরো-দস্তুর এজিনিয়ার হইনি। অবিশ্বাস্য হলেও কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্য। ব্যাপারটা খুলেই বলি।

পরীক্ষা দিয়েছি, ফলাফল বের হয়নি। ভোঁ-কাটা ঘুড়ির মত ভেসে ভেসে বেড়াছি এখানে ওখানে। হঠাৎ মিশন-রো'র মোড়ে দেখা হয়ে গেল সুব্রতর সঙ্গে। সুব্রত আমার সহপাঠী, একই সঙ্গে শিবপুর এজিনিয়ারিং কলেজ থেকে বি. ই. পরীক্ষা দিয়েছি। সুব্রত বললে : কীরে নরেন, কেমন আছিস ?

বলি, হ্যাঁ—আগামী সপ্তাহে না কি রেসাল্ট বের হবে ?

বললে—তাই তো শুনিছি। তুই এখন কি করছিস ?

: করব আবার কি ? ভ্যারেণ্ডা ভাঙছি।

: সে কি রে ? চাকরি-বাকুরি ধরিস নি ?

: রেসাল্টই বের হয়নি, চাকরি দিচ্ছে কে ?

সুব্রত হো-হো করে হেসে ওঠে আমার কথা শুনে। তার কথার জানতে পারি, আমাদের সহপাঠীরা প্রায় সকলেই কোথাও না কোথাও ঢুকে পড়েছে। সুব্রত নিজেও বুঝি কোন প্রাইভেট কার্মে ঢুকেছে। এখন এ্যাপ্রেন্টিস এজিনিয়ার, রেসাল্ট বের হলেই পোস্টিং পাবে। সুব্রত বললে—স্টেটসম্যানের ওরিয়েন্ট কলামটা পড়িস ?

স্বীকার করতে হল ওটা আমি আরো পড়ি না। আমার ধারণা ছিল রেসাল্ট বের না হওয়া পর্যন্ত কোথাও পাতা পাওয়া যাবে না। শুনে সুব্রত অবাক হয়ে যায়, বলে, এতদিন তাহলে কি করছিলি ?

সলজ্ঞ স্বীকার করতে হয়, একটা উপভাস লিখবার চেষ্টা করছিলাম।

আবার হো-হো করে হেসে ওঠে সে। বলে, তোর এজিনিয়ারিং পড়তে

আসাই কুল হয়েছে নরেন। তা সে থাক্ গে। তুই বরং এক কাজ কর। সরকারী চাকরি করবি? তুই যে রকম গঁতো-মার্কী, আর লেখাপড়া নিয়ে থাকতে ভালবাসিস, তোর পক্ষে গভর্ণমেন্ট সার্ভিসই ভাল। ওরা একটা নতুন স্কীম নিয়েছে। গ্রামে গ্রামে হাসপাতাল তৈরী করার প্রোগ্রাম। কুরান-হেল্প-সেন্টার-বিল্ডিং স্কীম। তের জন নতুন এজিনিয়ার নেবে, এক এক জেলায় এক একজন। দেখনা চেষ্টা করে। হয়ে যেতে পারে। ঠিকানা লিখে দিচ্ছি, সোজা গিয়ে চীফ-এজিনিয়ারের সঙ্গে দেখা কর।

ভয়ে ভয়ে বলি, রেজান্ট বের না হতেই?

—কেন? তোকে কামড়ে দেবে?

এরপর আর না গিয়ে পারিনি। ছক ছক বুকে চীফ এজিনিয়ার সাহেবের ঘরে স্লিপ পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। অল্প পরে ডাক পড়ল। প্রৌঢ় ভদ্রলোক প্রকাণ্ড একটা টেবিলে বসে আছেন। চীফ এজিনিয়ার মিঃ বোস। ঘরে দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই। জানতে চাইলেন, আমি কী চাই। বললাম আমার কথা।

: চাকরি নিতে পারি, কিন্তু ক'লকাতায় হবে না, বাইরে।

: বাইরে মানে কোথায়?

: বালুরঘাট, দার্জিলিং অথবা বর্ধমান। যেখানে যেতে চাও।

এমন সহজ সরল প্রাক্তন জবাব পাব আশ্চর্য করিনি। একটু ঘাবড়ে যাই। ভয়ে ভয়ে বলি, আমাদের রেজান্ট কিন্তু এখনও বার হয়নি স্যার।

: আই নো।

বেল বাজিয়ে পি. এ-কে ডেকে পাঠালেন। সে ভদ্রলোক আমার পর তাঁকে বললেন, একে দিয়ে একখানা দরখাস্ত লিখিয়ে নাও তো হে। ওর নাম আর রোল নাথারটাও আমাকে দিও।

ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারি না। নির্দেশমত পার্সোনাল এজিস্টেন্টের কাছে একখানা দরখাস্ত লিখে দিয়ে এলাম। উনি প্রশ্ন করেন, কোথায় পোর্স্টিং চান? দার্জিলিং, বর্ধমান না পশ্চিম দিনাজপুর?

আবার ভয়ে ভয়ে বলি, আমার কিন্তু রেজান্ট এখনও বার হয়নি।

পি. এ. হেসে বলেন, সে তো সাহেবকে একবার বললেন। আপনাকে নিয়ে পাঁচজন হল। সবাই আপনার ক্লাস ফ্রেণ্ড।

: নামগুলো জানতে পারি?

: স্বচ্ছন্দে । দেখুন না ।

একটা ফাইল থেকে নামগুলো পড়ে গেলেন । সবাই আমার সতীর্থ, আমার সহপাঠি । জিজ্ঞাসা করি এরা সবাই জয়েন করেছে ?

: না । আপনি বোধহয় জানেন না, এভাবে সরকারী গেজেটেড অফিসার নিয়োগ করা হয় না । গেজেটেড-চাকরি চীফ এঞ্জিনিয়ার দেন না, দেয় পি. এস. সি । তাছাড়া রেজাল্ট বার না হওয়া পর্যন্ত চাকরির প্রশ্নই ওঠে না । তবে ডাক্তার রায়ের ব্যাপার তো জানেন । হেলথ সেক্টার বিল্ডিং স্কীম এ্যাপ্রোভড হয়েছে, ক্যাবিনেট স্যাংসন দিয়েছেন, এ বছর টাকাও এ্যালটমেণ্টে ধরা হয়েছে, এখন এই মুহূর্তে কাজ শুরু না হলে তিনি কোন কৈফিয়ৎ শুনবেন না । আমরা আগাম কাজ গুছিয়ে রাখছি মাত্র । যাতে রেজাল্ট বের হওয়া-মাত্র আমরা এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার ছাড়তে পারি । কোথায় পোস্টিং চান বলুন । এখনও আমার হাতে আছে ব্যাপারটা ।

দাঁড়িলিঙে বেজার ঠাণ্ডা, সামনে নীতকাল । ওদিকে বালুরঘাট কলকাতা থেকে অনেক দূর । যেতেও হবে পাকিস্তানের ভিতর দিয়ে, হিলি দিয়ে । আসাম লিঙ্ক তখনও হয়নি । তারচেয়ে আমার ঘরের কাছে বর্ধমানই ভাল । তাই জানালাম পি. এ. কে ।

উনি বললেন, কাল বাদে পরশু একবার খবর নিয়ে যাবেন । কেন, আর বললেন না । আমিও এতটা অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম যে সে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিনি । নির্দেশমত দুদিন পরে যেতেই উনি আমার হাতে একখণ্ড হলুদ রঙের কাগজ ধরিয়ে দিয়ে বললেন, যান, সীতাভোগ মিহিদানার দেশে যান এবার ।

তাৎক্ষণ ব্যাপার ! দ্বীতিমত নিয়োগপত্র । সরকারী ছাপমারা কর্তৃক তৈরি খোদ চীফ এঞ্জিনিয়ারের স্বাক্ষর ! অবাক হয়ে বলি, তবে যে পশুদিন বললেন পাবলিক সার্ভিস কমিশন অনুমোদন না করা পর্যন্ত...

বাধা দিয়ে উনি বললেন, ঠেলার নাম বাবাজি । ডাক্তার রায়কে আপনি চেনেন না । আপনার নিয়োগপত্র পরে যথারীতি পি. এস. সি-কে দিয়ে অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে ।

: তাড়া রেজাল্টও বার হয়নি যে—

পি. এ এবার হেসে বলেন, আপনি পাশ করেছেন । ডব্লু কংগ্রেসমেন্স ! এক নব্বয় পরীক্ষার পাশ, দু-নব্বয় চাকরি পাওয়া ।

আমি তাঁকে মামুলী ধন্যবাদটাও জানাচ্ছি না দেখে বলেন, 'ও যে পল্লীমহলথ সেন্টার স্বীয় হচ্ছে ডাক্তার রায়ের পেট-কীম ! তাঁর চেহারাটা দেখেছেন তো ? গোটা রাইটাস-বিল্ডিং তাঁর দাবড়ানিতে কাপে । চীফ এঞ্জিনিয়ার সাহেব বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে জেনে নিয়েছেন আপনাদের ক'জনের খবর । সাতটা দিন এগিয়ে গেল কাজটা । খাদা-জল খেয়ে এবার গ্রামে গ্রামে হেলথ সেন্টার বানান গিয়ে ।

এই ছিল আমাদের আমলে এঞ্জিনিয়ারদের ডাকরিব বাতায় । সন্তোষাধীন এক মহান উপদ্বীপে তখন শুধু কাজ আর কাজ । উনিশ শ আটচল্লিশ সালের কথা বলছি । প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তখনও ছাপাখানা দূরের কথা টাইপ-রাইটারেরও মুখ দেখিনি । 'তু-শ' বছর বিদেশী শাসনে, সন্তোষাধীন মহাদুঃক, মহামারীতে এবং সর্বোপরি দেশবিভাগে তখন এ শক্তিক-বাঙলার একেবারে হাড়িসার অবস্থা । রোগীর নাভিখাস উঠেছে রীতিমত । পশ্চিম এ পশ্চিমবাঙলার সেদিন এক বৃদ্ধ চিকিৎসক তখন এগিয়ে এসেছেন এই অসুস্থজী রোগীকে ডাঙার টেনে তুলবেন বলে । নানান পরিকল্পনার তিনি হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন একের পর এক । ক্রতগতি বদলে ফেলতে দেশের চেহারা । রাস্তা বানাতে হবে, ব্রীজ বানাতে হবে, গ্রামে গ্রামে বাছাকেন্দ্র চাই—চাই চরিত্রঘাটার দুখ প্রকল্পের রূপায়ন, কল্যাণীতে নতুন নগরীর পত্তন, চিত্তরঞ্জে এঞ্জিন তৈরীর কারখানা স্থাপন, হুগলিতে লৌহ-নগরী গঠন—দামোদর-কানাই-ময়ূরাকী প্রকল্পের বাস্তবরূপায়ন । তার উপর চাই আশগানা বাঙলার উদ্বাস্ত মানুষের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা । দুবুলিচাঁ-রূপলী-দুধকুণ্ডি-দুপাস' অসংখ্য ক্যাম্পে আশ্রয় দিয়েছেন মানুষগুলোকে ; তাদের জন্ত অনাবাদী নতুন জমি হাশিল করতে হবে, অসংখ্য উপনগরীর পত্তন করতে হবে । হাজার হাজার মাইল পথ বানাতে হবে, কলকারখানা সম্প্রসারণ করে তাদের কর্ম-সংস্থানের আয়োজন করতে হবে । এর জন্ত চাই কারিগরী কাজ জানা মানুষ । রাজমিস্ত্রী, ছুতার, সার্ভেয়ার, ইলেকট্রিসিয়ান, প্রাচীর, গুভারসিয়ান আর এঞ্জিনিয়ার । 'তু-পাঁচ শ' নর, হাজারে হাজারে । রাষ্ট্রের যিনি প্রধান কর্ণধার তিনি বলেছেন, 'আমি চাই আরও কারিগরী কাজ জানা মানুষ । হাজার হাজার এঞ্জিনিয়ার ! মসীজীবী নর, আইনজীবী নর, ইন্সলমেন্টার নর, শুধু কারিগরী কাজ জানা মানুষ—এঞ্জিনিয়ার, সিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, মেটালজিক্যাল, কেমিক্যাল এঞ্জিনিয়ার ।'

বর্ধমান অফিসে যোগ দিলাম পরের দিনই। ছোট অফিস। সবে খোলা হয়েছে। একজন কেরানি, একটি পিয়ন এবং একজন ওভারসিয়ার। কেরানি পিয়নের নতুন চাকরি। আমারই যতন আনাড়ি, সরকারী আইন কাঙ্ক্ষনের ব্যাপারে। ওভারসিয়ার বিনয় মিত্রের অবস্থা পাকা পুরানো লোক। খোদ পি. ডাবলু ডি থেকে এসেছে। সরকারী চাকরি তার খাট বছরের। যাঁৎ ঘোঁৎ জানে। আশাহুজা কলেজের বাহু লোক। সেই এ অফিসটা ভাড়া করেছে। চার্জও বুঝিয়ে দিল সেই। চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে চলে গেল আসানসোলে। সেখানেই তার হেড কোয়ার্টার।

এই বর্ধমানেই সাক্ষাত পেয়েছিলাম স্বনামধন্য যমুরকেতন আগরওয়ালের। না, তখনও তিনি বাণিজ্য-চুফক হয়ে ওঠেন নি। তখনও ঠিক স্বনামধন্যও নন। সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

দিন সাতেকও চাকরি হয়নি আমার। একদিন কেরানিবাবু একখণ্ড কাগজ আমার সামনে বাড়িয়ে ধরে প্রশ্ন করলেন, এটার কি করব স্যার?

: কি শুটা?

: আজ্ঞে 'সার্ভে রিপোর্ট'। আসানসোলের এস. এ. ই পাঠিয়েছেন।

এস. এ. ই অর্থে লাব-এ্যাসিস্টেন্ট এজিনিয়ার। অর্থাৎ কিনা ওভারসিয়ার। সেই আশাহুজা কলেজে পাশ আমার একমেবাবিধীয়ম সহকারী বিনয় মিত্রের। তিনি নাকি ডাক যোগে একটি 'সার্ভে রিপোর্ট' পাঠিয়েছেন তাঁর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে, অর্থাৎ সচ-চাকরি-পাওরা এই অধম আনাড়ির কাছে, নির্দেশ চেয়ে। এবং কেরানিবাবু করেন এ্যাসিস্ট্যান্টের যে কার্যদায় তাঁর ক্রিডেনসিয়াল বাড়িয়ে ধরেন, তেমনি সমস্তই সেই কাগজখানি আমার দিকে বাড়িয়ে ধরেছেন নির্দেশের অপেক্ষায়, এটুকু বোঝা গেল। কিন্তু কী হুকুম দেব আমি? কী হুকুম এ ক্ষেত্রে আমার দেওয়ার কথা? 'সার্ভে' মানে তো জরিপ। আসানসোলের ত্রিসীমানায় কোন জরীপের কাজ চলছে বলে তো জানিনা। ওভারসিয়ারবাবু তো কষ্ট দে কথা আমার কিছু বলেননি কখনও। এই তো পত্রই আসানসোল থেকে ঘুরে এলাম! একটা পরিত্যক্ত মিলটারী ক্যাম্প ভেঙে উদ্ভাস্তদের জন্য পি. এল. ক্যাম্প বানানো হচ্ছে। কোন জরীপের স্বত্বপাতি তো তার পারে কাছে দেখিনি? অথচ ওভারসিয়ারবাবু জরীপের একটা রিপোর্ট যখন পাঠিয়েছেন তখন জরীপ নিশ্চয় হচ্ছিল, আমি খবর পাইনি।

: তাহলে এটার কি করব তার ? তাগাদা কেন কেরানিবাবু।

আমাকে গভীর হতে হয়। কিছুই যখন বুঝছি না তখন অফিসার জনোচিত গাভীরটার প্রয়োজন সবার আগে। রাশভারী কণ্ঠে বলি : দেখুন, এসব হচ্ছে টেকনিক্যাল ব্যাপার। আপনাকে কিছু করতে হবে না। যা করবার আমি করব। সার্ভে রিপোর্টটা রেখে যান।

কেরানিবাবু চলে যেতেই কাগজখানা নেড়ে চেড়ে দেখি। হরিবোল ! কোথায় জরীপের রিপোর্ট ! হৃদয়ে রঙের চারখানা সরকারী ছাপানো ফর্ম। চার বছর শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যে মস্তিষ্কের সাহায্যে বাধা বাধা ইন্টুগ্যাল ক্যালকুলাস আর আর. সি সি ডিভাইনের অঙ্ক নিয়ে ধস্তাধস্তি করেছি সেই মস্তিষ্কের সাহায্যে এ ধাঁধার উত্তর খুঁজে পেলাম না। যেটুকু বুঝতে পারছি তার সঙ্গে সার্ভে বা জরীপের কোন সম্পর্ক নেই। মনে হচ্ছে লেখা আছে—পুরাতন মিলিটারী ছাউনি ভেঙে একুনে এক হাজার তিনশ একত্রিশ-খানি ভাঙ্গা ঝরঝরে করোগেটেড টিন পাওয়া গেছে, যার কোন বাজার দর নেই, যা সেকেণ্ড-হাণ্ডে কেউ কিনবে না। ফলে ঐ ভাঙা টিনগুলি রাইট-অফ্ করবার নির্দেশ দেওয়া হ'ক। অর্থাৎ কিনা ফেলে দেবার হুকুম দেওয়া হ'ক।

সময়ে 'ডাক' থেকে সরিয়ে কাগজখানা প্যাণ্টের পকেটে রেখে দিলাম। সন্ধ্যাবেলা অফিসার ক্রাবে রঘুদাসদাকে দেখাতে হবে কাগজটা। রঘুদাস-দা-ও পি. ডাবলু. ডি-র এঞ্জিনিয়ার। বর্ষমানের পোস্টেড অঙ্ক কাজে। রাস্তা তৈরীর কাজে। রঘুদাস বাউল আমার অনেক সিনিয়ার। রঘুদার মাধ্যমে এ ভাবে অনেক মুশ্‌কিলই আসান করতে হত তখন আমাকে।

ক্রাবে সুযোগমত কাগজখানা রঘুদাসদাকে দেখালাম। বলি, এ কী ধরনের 'সার্ভের' রিপোর্ট দাদা ? কলেজে নানান জাতের সার্ভে শিখিয়েছিলেন অফিসার পি. বি. জি. ; —চেন সার্ভে, গ্লেন টেবল, প্রিসম্যাটিক কম্পাস আর থিয়োডোলাইট ; কিন্তু ঝরঝরে ভাঙা করোগেটেড টিনের সার্ভে—

রঘুদাসদা হো হো করে হেসে উঠে বলেন : দেয়ার আর মোর থিংস্ ইন দ পি. ডাবলু ডি ড্যান আর ড্রেম্‌ট অফ ইন মোর কলেজ নোটস্ ! এ সেই কলেজী সার্ভে নয় ভাবা ! পি. ডাবলু. ডি-র আইনে সার্ভে রিপোর্ট শব্দটার একটা বোগরুচ অর্থ আছে ; অনর্থও বলতে পার। অর্থাৎ কিনা বাস্তব মালের হিসাব, বেহিসাবও বলতে পার। হিসাবের বাইরে নেবার চেষ্টা ইতি বে-হিসাব !

কোন পাকা ছাদ ঘেরামত করতে গিয়ে তিন ইঞ্চি উচ্চতার একটি অশ্বখের চারা যদি লাখ টাকা কন্ট্রাক্টের ঠিকদার উপড়ে ফেলে, আর তার মাপ যদি তুমি খাতায় তোল তবে ঐ অশ্বখ শিশুর অস্তিম গতির খতিয়ানটাও তোমাকে খাতা কলমে প্রমাণ দিতে হবে। যুত অশ্বখ শিশুর জন্ত উপরে একটি সার্ভে রিপোর্ট তোমাকে পাঠাতে হবে এবং উপরওয়ালার চকুম ছাড়া সেই অশ্বখ শিশুর যুতদেহটি সংকার করা চলবেনা। সরকারী আইন বড় কড়া ভায়া। লাইনের টানেল পাথে হাতীর কারাভান নিয়ে ড্যাং ডেডিয়ে চলে যাও কেউ টু-শকটি করবেনা কিন্তু বে-আইনি শূঁচের ফুটোর সূতো কেন গলোছে সে কৈফিয়ত দিতে দিতে ফেরবার হয়ে যাবে তোমার।

: তা তো বুঝলাম কিন্তু ঐ ভাড়া টিনের কি গতি হবে ?

: না দেখে কিছু করনা। সরেজমিনে স্বচক্ষে আগে গিয়ে দেখে এস ব্যাপারটা। হাজারের উপর টিনের হিসাব ; হোক ভাড়া, না দেখে রায় দিওনা। যদি মনে কর নিলাম ডাকলে ও টিন কেউ খরিদ করতে আসবেনা তবে তোমার উপরওয়ালা অর্থাৎ এক্সিকিউটিভ এক্সিনিয়ারকে ঐ সার্ভে রিপোর্ট পাঠিয়ে দিও 'রাইট অফের' নির্দেশ চেয়ে। অডার তিনিও দেবেন না, আনিয়ে দেবেন তাঁর উপরওয়ালার কাছ থেকে।

রঘুদার পরামর্শ মত পরদিনই আসানসোল ছুটি। সরেজমিনে এবং স্বচক্ষে দেখে এলাম ব্যাপারটা। হায় খোদা! কোথায় টিন! কড়কড়ে করে ভাঙা নেমস্তন্ন বাড়ির পাঁপড় ভাঙার বুড়ি! কে বলবে এগুলি এককালে কয়োগেটেড সীট ছিল। লুচি ভাঙার কাঁকরাতেও প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে এতগুলো ফুটো থাকেনা। সবুজরঙের কামোফ্লেজ করা ব্ল্যাকসীট। কোন পদার্থ নেই, কেউ কিনবেনা। বাড়ি বয়ে নিয়ে যাবার খরচও উঠবে না। ফলে কেনা দূরে থাক বিনা পয়সাতেও কেউ নেবেনা। সুতরাং নিঃসন্দ্বিগ্ধচিত্তে এক্সিকিউটিভের কাছে সুপারিশ করে পাঠালাম রাইট অফের নির্দেশ চেয়ে। অর্থাৎ সরকারী খরচে মালটাকে ফেলে দেবার ব্যবস্থা করতে।

সাতদিনের মাথায় জবাব এল উপর থেকে। আমার সাহেব আমার সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। নির্দেশ পাঠিয়েছেন ঐ বাস্তব পাঁপড় ভাঙার বাড়ির নিলামে বিক্রয়ের চেষ্টা করতে। যদি কোন খরিদার নেহাৎ না আসে তখন তিনি রাইট অফের নির্দেশ দেবেন—তার আগে নয়।

অগত্যা আবার দৌড়াতে হল রঘুদারদার কাছে। তাঁর কাছ থেকে

বখোচিত নির্দেশ নিয়ে নিলাম, নোটিশ জারি করা গেল। নির্দিষ্ট দিনে আবার রওনা দিলাম আসানসোল যুথো। মনে আছে ট্রেনে যেতে যেতে মনে হয়েছিল কী বিচিত্র এই সরকারী আইন। পাঁচনিকে পরসাদ দিয়েও যে মাল কোন নির্বোধে কিনতে আসবেনা তার পিছনে আমার ছ-ছবার আসানসোল ট্যুর হয়ে গেল। আমার টি. এ. দিল বাবদ ইতিমধ্যেই গোটা পঞ্চাশ টাকা খরচ হয়ে গেছে সরকারের। কিন্তু সরকারী ব্যবস্থাপনাকে দোষারোপ করে কি হবে? এ দোষ তো আইনের নয়, আমার উদ্ধতন কতৃপক্ষের নিবৃদ্ধিতা। থামোনা কেন তিনি নিলামের ব্যবস্থা করতে ত্রুটি দিলেন? একটি লোকও আসবেনা। অহেতুক আমার দোড়াদোড়িই পণ্ড্রম।

যা হোক স্টেশানে নেমে আমি একটা সাইকেল রিক্সা নিলাম। রওনা দিই সেই পরিভ্রান্ত মিলিটারী ছাউনিটার দিকে। আমাদের স্টোর ইন্সপেক্টর কাছাকাছি এসে দেখি খান তিনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। একটা জীপ, একটা কুটার এবং একখানা প্রকাণ্ড বিলাতী মডেলের কালো গাড়ি, ফোর্ড কিংবা শেভ্রলে। এ আবার কি বখেড়া? গাড়ি কার?

ওভারসিয়ার বিনয়বাবু আমাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে আসে। হাত তুলে নমস্কার করে। প্রথমেই বলি : গাড়ি কার?

: যারা নিলাম ডাকতে এসেছেন তাঁদের।

চম্কে উঠি। ঐ গাড়িতে চেপে নিলাম ডাকতে লোক এসেছে এই তেপান্তরের মাঠে? আমি কিছু খবরের কাগজে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে যোগাল টেওয়ার ডাকিনি! আগপাণের ছ পাঁচটা অফিসে নিলাম নোটিশ পাঠিয়ে অতুরোধ করেছিলাম নোটিশ বোর্ডে টাঙিয়ে দিতে। এরা খবর পেল কেমন করে? ঐ খাস্তা টিন কিনতেই বা এসেছে কেন?

বিনয়বাবু একটু জনান্তিকে সরে এসে বললে, ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না স্যার। ইতিমধ্যে তিনজন এসেছেন নিলাম ডাকতে। পৃথক পৃথক। প্রথমে এসেছেন কুটারে চেপে একজন পাঞ্জাবী শিখ, তারপর ঐ জীপে চড়ে এসেছেন এক সিদ্ধি ভদ্রলোক, আর এই কিছুক্ষণ আগে এসেছেন একজন মাতোয়ারী ঐ প্রকাণ্ড কালো গাড়িটার। কি বলন স্যার, তিনটেই পাড় যাতাল। কেউ কাউকে চিনত না, কিন্তু এখানে এসে ওদের বেশ দোষ্টি হয়ে গেছে। পাঁট পাঁট মদ গিলছিল এতক্ষণ।

আমি বলি, তা নিজের পরসার মদ খেলে আপনি আমি বাধা দেবার কে ?
কিন্তু ওদের টিনগুলো দেখিয়ে দিয়েছেন তো ?

: হ্যাঁ স্তার এতক্ষণ তাই তো দেখাচ্ছিলাম ওদের । তিনজনেরই পা
টলছে ।

: চলুন তা হলে । সময় তো হয়ে এল ।

: একটা কথা । আমাদের তো একটা রিসার্ভ ভ্যালু ধরতে হবে । কত
থেকে শুরু করব ?

আমার ধারণা ছিল পাঁচসিকে পরসার দিয়েও এ মাল কেউ কিনবেনা । কিন্তু
তিন তিনজন কাপ্তেন পেট্রোল পুড়িয়ে যখন এতদূর এসেছে এখন ব্যাপারটা
ভেবে দেখতে হবে । মাতালের কাণ্ড তো । দশ বিশ টাকা হঠাৎ হেঁকে বসতে
পারে । আমি মতটা পালটে বললাম, পঁচিশ টাকা !

আমরা দুজনে অগ্রসর হয়ে আসতেই ওঁরা তিনজনে চেয়ার ছেড়ে উঠে
দাঁড়ালেন । ‘আইয়ে আইয়ে বৈঠিয়ে’ বলে যেভাবে তিনজন অমায়িক আপ্যায়ন
করতে থাকেন তাতে মনে হচ্ছিল আমিই খরিদার, ওঁরাই অতিথি সংকার
করছেন বুঝিবা । একজন ড্রাইভার ভাড়াভাড়া বোতল আর গ্লাসগুলো উঠিয়ে
নিরে গেল, আর একজন ঝাড়ন দিয়ে আমার চেয়ারটা ঝেড়ে মুছে দিল ।
তিনজনের মুখপাত্র হিসাবে এগিয়ে এলেন মারবার তনয় । ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসরের
যুবাপুরুষ, কপালে একটা খেতচন্দনের ফোঁটা, গলার মোনার চেন, পরনে একটা
লংকোট, মাথার কাজকরা বাহারে টুপী । তিন তিনজনের হয়ে সবিনয়ে
নিবেদন করেন—সরকারী টিন তাঁরা দেখেছেন এবং তাঁরা তিনজনেই ঐ মাল
খরিদ করতে ইচ্ছুক ।

নিলামের নিয়মাবলী বুঝিয়ে দেবার একটা প্রথা আছে । আমি সে প্রচেষ্টা
করবার উদ্যোগ করতেই ওঁরা আমাকে থামিয়ে দেন : উলব বাৎ তো লিখাই
হয় নোটিশমে । আপনি নিলাম শুরু করেন হজুর ।

অপভ্রা নিলাম ডাক শুরু করি : আমাদের ডিপার্টমেন্টাল রিসার্ভ ভ্যালু,
পঁচিশ টাকা । পঁচিশ টাকা দর কেউ দিচ্ছেন ? পঁচিশ রুপেরা । পঁচিশ, পঁচিশ,
পঁচিশ এক—

পাঞ্জাবী বলেন : পঁচাশ ।

সিদ্ধি বলেন : শত !

মাড়বার তনয় বলেন : শও পঁচিশ !

আমি তো খ ! কিন্তু ওখানেই শেষ নয়, আমি কিছু একটা বলবার চেষ্টা করতে করতেই ওরা আরও এগিয়ে যান ।

: দেড় শত !

: দু শত !

: পুরা তিন শত !

আরে, এ কী কাণ্ড ! আমি ভাড়াভাড়া বলে উঠি, থামুন থামুন । আপনারা কোন টিনের বাতুল দেখেছেন বলুন তো ?

ওদের মুখপাত্র হিসাবে সেই মারবারী ভদ্রলোকই আবার নিবেদন করেন :
ধবঢ়াইবেন না সর ! হামরা ঠিক স্ট্যাকই দেখিয়ে এসেছি । শুধামে তো পুরাণো ব্র্যাকসীটের একটিই স্ট্যাক আছে, বাদবাকি তো বিলকুল নোটুক গ্যাল-ভ্যানাইকড্ সীট । গলতি হোবে কেন ? না কি বলেন উভারসিয়ারবাবু ?

তা ঠিক ! তা হলে এরা অমনভাবে ডাকাডাকি করছে কেন ?

: তব ফিন্ ডাক চলুক সর ? না কি বলেন ?

আমাকে মায় দিতে হয় : উপায় কি ? চলুক ।

আমাকে আর পরিশ্রম করতে হচ্ছেনা । নিলামদারকে ওরা যেন আর পাঁতাই দিতে চায়না । তিনজনে বেশ মুখোমুখি বসেছে, যেন জি-ছাও ব্রীজ খেলছে, আমার দিকে চোখ তুলে তাকাবারও অবকাশ নেই । পাঁজাবী একটি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলেন, আপ কেবনা তক্ বাড়া খা জী ? তিন শত ? মায় বোলতা হুঁ কি পুরা চার শত !

সিদ্ধি ভদ্রলোকও ছোড়নেবালা নন । তিনিও একটি বর্মা সিগার ধরিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলেন, চারশ ও পঁচাশ !

মারবারী ভদ্রলোক রূপার বাটা থেকে এক খিলি পান নিয়ে মুখ বিনয়ে ফেলে চর্বন করছিলেন । কথা বলার সুযোগ নেই তাঁর, হীরের আর পোক-রাজের আংটি পরা দুটি আঙ্গুলের সঙ্গে বাকি তিনটি আঙ্গুল উঠিয়ে তিনি ইঙ্গিতে বললেন : পাঁচ ।

পাঁজাবী বলেন : ঐসিন নেহি হোগা জী, কহ্‌নে পড়েগা । খয়ের, মায় বোলতা হুঁ কি ছয় শত !

সিদ্ধি সংক্ষেপে বলেন : সাত ।

: আট ।

: নয় !

যারবার তনয় পানের শিক্কা ফেলে এবার বলেন : পুরা হাজার
রুপেরা !

উত্তেজনাতে কিছু না ভেবেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছি আমি ।

যারবার তনয় ঠেং বিরক্ত হয়ে বলেন : ফিন্ ক্যা হুয়া ?

আমি বলি : সৰ্ত্ত অল্পসায়ী যিনি সর্বোচ্চ দরে মাল খরিদ করবেন তাঁকে
নতকরা পঁচিশ টাকা হিসাবে নগদ টাকা জমা দিতে হবে—তা জানেন তো
আপনারা ?

হঠাৎ বাধা পড়ায় ওরা তিনজনেই ফুৎ হয়ে উঠেছেন মনে হল । ওদের
ভাবখানা—আমরা তিন কাপের ডাকাডাকি করে নিলামের দর বাড়ানি আর
তুমি কে হে হরিদাস পাল এসেছ নগদ টাকার গাওনা শোনাতে ?

পাণ্ডাবী বিরক্তি প্রকাশ করে বলেন : উ-বাং তো লিখাই হয় নোটশ
মে স্তর ?

সিদ্ধি বলেন : বেশক !

আমার সন্দেহ কিন্তু তাতে ঘোচেনা । কোথাও নিশ্চয় কিছু ভুল
হচ্ছে । যারাত্মক পরণের ভুল । হয় এরা তিনজনেই বক উন্মাদ, নয়
আমাকেই এখন যেতে হয় উন্মাদাশ্রমে । স্বচক্ষে না দেখলে আমার বিশ্বাসই
হতেনা, এই বাতিল টিনের গুহ কোন সুহ-মস্তিষ্ক ওয়ালো মানুষ হাজার টাকা
খরচ করতে চায় । বাধা হয়ে বলি : আপনারা কেন এত বেশী দরে ডাকছেন
আমি জানিনা, কিন্তু...

পাণ্ডাবী আমাকে বাধা দিয়ে বলেন, ক্যা কুছ কহুর হুয়া হয় হমারা ?

মাড়োয়ারী তাকে ধামিরে দিয়ে হাত দুটি জোড় করে আমাকে বলেন,
একবাং পুঁছু স্তর ?

: বলুন ?

: লচ্-ম্চ্-কহিয়ে তো, আপ নেহি চাতে কি হম ওর ভি বাড়ে ?

দূর ঘোড়ার ডিম । আমি নিলামদার, আমি দর বাড়াতে আপত্তি করতে
যাব কেন ? তাড়াতাড়ি বলি—না না, তা কেন ? বত ইচ্ছে বাড়ুন না
আপনারা । আমি আপত্তি করতে যাব কোন হুঃখে ?

: আপ কো তো খুদ ইয়ে টিনা কো কোই জরুর নেহি হয় না ?

: না না সরকার তো এ টিন বেচে দিতেই চাইছেন । তাই তো এই
নিলাম ডাকছি ।

মারবারতনর মুখটা নিচু করে এক চোখ বন্ধ করে বলেন : সরকারকা বাং না আছে বাবুজি, আপনার তো এ টিনার কোঠি জরুরং না আছে না ?

তারপর প্রায় কানে কানে বলার স্বরে বলে—ইন্ দোনো কো ভিতর আপনকা কোই বেনামদার না আছে না ?

কী সর্বমোশে কথা ! বেটা বলে কি ? আমি ঐ টিন খরিদ করতে এঠে সিদ্ধি অথবা পাঞ্জাবীকে বেনামদার খাড়া করেছি ? তাই বারে বারে বাধা দিচ্ছি সবটা বাতিল না বাড়ে ?

সময় দিয়ে উঠি, কী যা তা বকছেন। বাড়ুননা যত খুশী বাড়তে চান ! তবে এরপর যিনি ডাকবেন, তাঁকে আপনাকত আড়াই শ টাকা জামানত কমা রাখতে হবে।

পাঞ্জাবী বলেন, সচ্ বাং মো সিকঠি হায়।

সিদ্ধি ভুল্ললোক দেখছি কম কথার মানুষ। তিনি পুনরুক্তি করেন : বেশক।

যা হোক, তিন মক্কেলই পকেট থেকে বাব করে দিলেন কড় কড়ে নোট।

মারবার তনর গড় বপকীর মত হাত দুটি ফোড় করে বলেন : অস হু কম দিল্লিগে মাব, চম শুক করে ? কিন বাড়তে চলে ?

স্বাক্ষরসিয়ার বিনয়বানু আমার কর্ণযুগে নিবেদন করে : তিনাটেই পাড় মাতাল স্যাব।

তা মাতালই হক আর দাতালই হক, সে-আঠনি কাজ তো করা কিছু করাচ না। জান তো টনটনে। নগদ টাকা জামানত কমা দিয়েছে, পোশ দেখাচ্ছে নিলামের দর বাড়িয়ে চলেছে, আমি বাধা দেবার কে ?

পাঞ্জাবী দাড়ির কালিটা খুলে ফেলেন। গালে দাড়ির জন্তলে বোধহয় একটা পোকা ঢুকেছে। চুমকাত্তে চুমকাত্তে আবার সেই প্রশ্নটি পেশ করেন তিনি : আপ কেংনা ডক বাচা থা কী ? পরা হাজার ? মাস বোলতা তঁ কি এগারো শও কপেরা !

সিদ্ধি ভুল্ললোকও মাথার পাগড়িটা খুলে ততক্ষণে টাকে হাত বুলাচ্ছেন। কম কথার মানুষ তিনি, সংক্ষেপে বলেন বাবা শুন।

আমি বাধা দিচ্ছি না মেখে মারবার তনর এতক্ষণে খুল্লিয়ার হয়ে উঠেছেন। এক টিপ জর্দা মুখ বিবরে নিক্ষেপ করে বেশ নাটকীয় ভাবে বলে ওঠেন : লাগ্, লাগ্, লাগ্ ডেরা শও !

আমি ততক্ষণে হাল ছেড়ে দিয়েছি। আর বাধা দেবনা : বেটা বলে

কিনা আমি বেনামদার খাড়া করে ঐ ভাঙা টিন কিনবার তালে আছি ! বাড়ুক যত খুশী বাড়ুক ওরা। দেবা থাক্ কোন্ চুলোর গিয়ে খামে। শেষপর্যন্ত পাগড়িটা মাথার চড়িয়ে সিঁদ্ধি ভদ্রলোক উঠে পড়েন। জীপে গিয়ে বসেন। একটু পরে পাঞ্জাবীও নিছ হটলেন। শেষডাক ডেকে নিলেন ত্রিশ বত্রিশ বছরের ঐ মারবারী ভদ্রলোক নগদ এক হাজার সাত শ' পঞ্চাশ টাকায়।

আমার ঘাম দিয়ে জর চাড়ল। পিয়নটাকে বলি, একগ্লাস ঠাণ্ডা জল খাওয়াও তো হে।

আবোল-ভাবোলবর্ণিত জাড়ার যত হাসি হাসি মুখে মারবারী ভদ্রলোক এগিয়ে এসে নিয়কঠে বলেন, হিসাব জুড়ে নিলম স্তর; এক এক টিনার দর হইল কি এক রূপেয়া পাঁচ আনা ! বহু সস্তা হইল, বিলকুল জলের ভাও।

ওভায়সিয়ার ততক্ষণে অন্য একটি হিসাব করছিলেন, বলেন, চারশ' আটত্রিশ টাকা কলমানি জমা দিতে হবে আপনাকে। তার আড়াই শ' টাকা আপনি আগেই দিয়েছেন, সুতরাং বাকি থাকল—

বী চাতে শূন্যে হাওয়ায় এক খাপড় মেরে মারবার তনয় বিনয়বাবুকে ধামিয়ে দেন : ছোড়িয়ে বহু বাৎ উপরসিওরবাবু। পুরা রূপেয়া লে কর মুখে রসিদ দে দিজিয়ে।

আড়াই শ' টাকা আগেই দেওয়া আছে, আরও পনেরখানা করকরে একশ টাকার নোট বাড়িয়ে ধরেন ভদ্রলোক। রসিদ কেটে দিলাম। প্রাপক ত্রীময়ুরকেতন আগরওয়াল, সাকিন ধানবাদ, বিহার।

মাথামুণ্ড কিছুই বোধগম্য হলনা। আমার তো নতুন চাকরি, অভিজ্ঞতা কিছুই নেই। পি. ডাবলু. ডি-র পোড়-খাওয়া ঘাঘু বিনয় মিত্তির পর্যন্ত তাজব। টাকা জমা দিয়ে প্রথমত ভদ্রলোক রসিদ নিলেন সরকারী ছাপানো কাগজে। শীল ও সহি দিতে হল আমাকে। লরি-মুভমেণ্টের ধানকতক পারমিট লিখে দিতে হল। বর্ধমান থেকে ধানবাদ যাবার অসুযতি পত্র। কবে মাল ডেলিভারি নেওয়া হবে তা জানা না থাকায় তারিখগুলো বমানো গেলনা।

বললাম, হাজার টিন নিয়ে যেতে এত লরি লাগবে কেন ?

: লাগবে স্তর, টিনা খাতা আছে না ? আদা লাদ করা তো চলবেনা।

তা ঠিক। এক লরীতে বেশী মাল চাপালে নীচের টিনগুলো পাণর-ভাজার কুচো হয়ে যাবে।

কাগজপত্র গুটিয়ে নিয়ে তিন-ভূগ ঝাঁক। সবুজ টিনের থেকে একটি সিগারেট খাইয়ে ময়ূরকেতন গাভ্রোখান করেন, সবিনয়ে বলেন, মেহেরবানি হোয় তো আপনাকে টিসানে ছেড়ে দিতুম্ !

মেহেরবানি করার ইচ্ছা আমার আদৌ ছিল না। ধন্যবাদ জানিয়ে বলি, আপনি রওনা দিন। আমার দেয়ী হবে।

পাভাবী এবং মিছি ইতিপূর্বেই রওনা হয়ে গেছেন। উনিও তাঁর কালো রঙের প্রকাণ্ড গাড়িটা চেপে গ্র্যাণ্ড-ট্রাংক রোড ধরে পশ্চিমমুখো রওনা হলেন—ধানবাদের দিকে। যাবার আগে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেন যে সাত-দিনের মধ্যে মাল উঠিয়ে নিয়ে যাবেন।

রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে বলি, এসেছিলাম নিলাম ডাকতে, দেখে গেলাম পি. সি. সরকারের ম্যাজিক !

বিনয় মিত্র কিন্তু হাসিতে যোগ দিলেন না। গম্ভীর হয়ে বলেন, এ কী বখেড়া বলুন দেখি ! কোথাকার তিন পাড়-মাতাল এসে নিমেষে একেবারে দক্ষয়জ্ঞ করে দিয়ে গেল !

আমি তখনও হাসছি, বলি : দক্ষয়জ্ঞ হবে কেন ? এ তো ভালই হল ! আশাতীত দরে মালটা বিক্রি হয়ে গেল, এ তো আনন্দের কথা—

আমার নিবুঁকিতার বিনয় মিত্রের ফুল হয়েছেন মনে হল ; বলেন, আপনি ব্যাপারটা বুঝছেন না স্যার। আমি রিপোর্ট পাঠিয়েছি ও টিনের স্ট্যাক 'রাইট-অফ' করতে ; আপনি নিজে সরেজমিনে মাল দেখে গিয়েও লিখলেন 'রাইট-অফ' করতে। অর্থাৎ আপনার আমার মতে দু-পাঁচ টাকাও দর হবে না ও-টিনের। আমরা বলেছি, বরের থেকে খরচ করে লোক লাগিয়ে ভাঙা টিনের সূপ সরিয়ে জায়গা সাজা করতে হবে। আর মাল না দেখেই বড় সাহেব লিখে পাঠালেন, 'অজ্ঞান' করতে। অমনি আমরা এক লাফে রিসার্ভ ভ্যালু ধরলাম পঁচিশ টাকা ! আর কার্যকালে দেখা গেল মালটার প্রকৃত বাজার দর পোনে দু-হাজার টাকা ! এরপর বড় সাহেব যদি মনে করেন, আপনি আর আমি—

সঙ্কোচে চূপ করে যাব বিনয় মিত্রের।

ভাই তো ! এ দিক থেকে তো সমস্তটা ভেবে দেখিনি।

বিনয়বাবুই বুদ্ধি বাতমান, এক কাজ করি স্যার, কোন ছুতার মালটা ডেভিডারি দিতে আমি দেয়ী করি—

: তাতে কি লাভ ?

: মালটা আপনি হে. ই-সাহেবকে স্বচক্ষে একবার দেখিয়ে দিন।

কী জবাব দেব বুঝে উঠতে পারি না। মিস্টার আগরওয়ালের আগ্রহ দেখে আমার মনে হয়েছিল, ঐ ঝরঝরে পাপর-ভাজার বাঙালিগুলি তাঁর ভাঁড়ারে না পৌছানো পর্যন্ত বুঝি আজ রাতের আহারই তাঁর মুখে রুচবে না। বড় দোর রাতটা কাবার করে কাল সকালেই তিনি ট্রাক পাঠাবেন। নগদ টাকা যেভাবে মিটিয়ে দিলেন, আংশিক অগ্রিম নয়, পুরো টাকা, তাতে মনে হয় না যে উনি একদিনও দেৱী করবেন। এ ক্ষেত্রে কোন ছুতার ডেলিভারি দিতে দেৱী করা যাবে ?

মিস্টার মিস্টারবাবু বলেন, সাহেবের ট্রাক প্রোগ্রাম তো এসেছে। আগামী শুক্রবারে তিনি আসছেন। সে কদিন যেমন করে হ'ক ঐ মালটিকে ঠেকিয়ে রাখব আমি।

সেই মতই ব্যবস্থা হল। ঘটনাচক্রে অবশ্য শুক্রবারের মধ্যে আগরওয়ালের লোক মাল ডেলিভারি নিতে এল না। এক্সিকিউটিভ এজিনিয়ারের ট্রাক হয়ে গেল। নিলাম-ডাকের কলাকলটা আমি ইচ্ছা করেই তাকে তখনও জানাই নি। কাজ-কর্ম দেখানো শেষ হলে গান্ধী দেওয়া ভাড়া টিনের পাহাড়টা দেখিয়ে বলি : এটারই মাতে রিপোর্ট পাঠিয়েছিলাম স্যার।

: ও, এই টিন ? এ আর অক্সান করে কি হবে ?

বিনয়বাবুর সঙ্গে আমার দৃষ্টি বিনিময় হয়। স্বস্তির নিবাস পড়ে আমাদের দু-জনেরই। আমি বলি, আচ্ছ না, আপনার নির্দেশমত আমরা অক্সান করেছি। বেশ ভাল দর পাওয়া গেছে।

: তাই নাকি ? এ টিনের 'বিভার' এসেছে ? ক'টাকা দর উঠল ?

: পৌনে দু-হাজার টাকা !

: হোয়াট ! কী যা ত বলছ ?

খটুঝু আশঙ্কা ছিল তাও খুঁচে গেল। এরপর আর সাহেব আমাদের দোষা-রোপ করতে পারবেন না, যে আমরা কোম্পানিকা মাল দরিরাতে ঢালতে চেয়েছিলাম।

: চূপ করে আছে কেন ? এই টিনের দাম পৌনে দু-হাজার টাকা ?

রীতিমত ধমক খাচ্ছি ! কুলি মজুর বারা আসে পাশে দাঁড়িয়ে আছে তারা

বোধহয় ভাবছে আমি বিক্রেতা নই, ক্রেতা। অর্থাৎ পোনে দু-হাজার টাকার ঐ রকি ভাঙা টিন আমি খরিদ করেছি সরকারী অর্থের অপচয়ে।

আজ প্রান্ত ঘটনাটা তখন ঠকে বিস্তারিত গল্প করি।

উনিও ঠিকমত বিশ্বাস করতে পারলেন না। শেষে আমাকে জনান্তিকে ডেকে নিয়ে বললেন, ভিতরে কোথাও না কোথাও কিছু গড়বড় আছে। তুমি যে বর্ণনা দিলে সে জাতীয় বিস্মেনসম্যান মাতলামি করে এভাবে টাকা ওড়ায় না। অতি দূর্ত ওরা। মাতলামি বলে ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তুমি ব্যবস্থা কর যাতে সাতদিনের মধ্যে মালটা আগরওয়াল উঠিয়ে নিয়ে যায়। তুমি জান, দু-ওয়ারান নতুন গ্যালভানাইসড-সীট সাইটে আসছে ছাউনির কাজে। আমি চাই সে মাল এসে পৌছানোর আগেই যেন এ মাল ডেলিভারি হয়ে যায়। তুমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মাল ডেলিভারি দিতে পারলেই আমি নিশ্চিত হতাম, কিন্তু তা যখন সম্ভবপর হচ্ছে না, তখন এ মাল ফিরায় হয়ে গেলেই নতুন টিনের স্টকটা ভোরফাই করাবে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে। আমার দৃঢ় ধারণা ভিতরে কোন মাংকি বিস্মেনস্ আছে।

: মাংকি বিস্মেনস্ মানে ?

: মানে তোমার ঐ বিনয় মিস্ত্রি। এখন ভাব দেখাচ্ছে যেন ভাঙ্গা মাহু-খানা উল্টে খেতে জানেনা ; কিন্তু সে নিজেই ঐ আগরওয়ালের সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছে তলে তলে। ডেলিভারি দেবার সময় বেশ কয়েক টন নতুন টিনও ভাঙা টিনের তলায় আত্মগোপন করে পাচার করা হবে।

অর্থাৎ রঘুদাসদার ভাবার আইনের টানেল পথে হাতীর ক্যারানান পাচার করার ব্যবস্থা।

এল্লিকিউটিও এঞ্জিনিয়ারের নির্দেশ মত ওভারসিয়ারকে কড়া তাগাদা দিলাম, এক সপ্তাহের ভিতর শুদাম সাকা করে ফেলতে। কিন্তু কী তাৎকালিক ব্যাপার, ক্রমাগত তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও ক্রেতার কোনসাদা পাওয়া গেল না। মাল উঠিয়ে নিয়ে যাবার কোন গরজই যেন নেই তার। বিনয়বাবুর উপর আমার সন্দেহটা ঘনীভূত হল এতদিনে। দু মাসের মধ্যে পাঁচটা রিমাইণ্ডার দিয়েও যখন জবাব এল না তখন ধানবাদের ঠিকানায় রেজিষ্টারী চিঠি দিলাম রীতিমত ওকালতি ভাষায়। রঘুদাই চিঠিখানা ড্রাফ্ট করে দিলেন। ‘হোয়ায়ান’ দিয়ে শুক সে চিঠির বক্তব্য যে আগামী সাতদিনের মধ্যে বিক্রিত টিন উঠিয়ে না নিয়ে যাওয়া হলে আমরা মাল অন্তভাবে পাচার

করব, এবং সে ক্ষেত্রে আগরওয়ালের টাকা বাজেয়াপ্ত হয়েছে বলে
খবর হবে।

এবার কাজ হল। যদুরকেতন আগরওয়াল নব্বিনের জানালেন, অল্পত্ন ব্যস্ত
খাকার মালটা উঠিয়ে নিয়ে যেতে তাঁর দেরি হয়েছে, একত্ন তিনি হুঃখিত।
বা হোক নির্দেশমত সাতদিনের মধ্যেই তিনি আমার গুদাম সাবাড় করে
দেবেন। দিলেনও তাই। একসঙ্গে অনেকগুলো টাক এল, বট্টা করেকের
মধ্যেই সময় ডাঙ্গা টিন উঠিয়ে নিয়ে গেল।

টুটিমধ্যে আশাদের নতুন টিনের ওয়াগন এগেছে। তাই তৎক্ষণাৎ যাটার-
রোলে লোক নিয়োগ করে নতুন টিনের স্টকটা আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে
গুন্ডি করলাম। না, নতুন টিন যেমন ছিল তেমনই আছে। 'মাংকি
বিসনেন্' কিছু হয়নি।

আগরওয়াল এপিসোডের এখানেই শেষ। এরপর গত বিশ বৎসরের
ভিতর যদুরকেতন আগরওয়ালের সাক্ষাত আমি পাইনি। ব্যাপারটা অবস্ত
আমার কাছে অত্যন্ত রহস্য বন লেগেছিল। তিন তিন জন বেগানা লোক
এনে অহেতুক ডাকাতাকি ক'রে মগধ পৌনে দু হাজার টাকার এমন কতক-
গুলো ডাঙা খাতা টিন কিনে নিয়ে গেল বা দিবে কোনও কাজ হওয়া সম্ভবপর
নয়। সবটাই যাতালের খেয়াল? তা কেমন করে হবে? নিলাম মোটিশ
দেখে তিন তিন জন লোক পৃথক পৃথক দাঁড়িতে ওখানে সমবেত
হ'ল কেমন করে? নির্দিষ্ট তারিখে, নির্দিষ্ট সময়ে তারা এল, রীতিসম্মত
নিলাম ডাকল, আদ্বানমাত্র জামানত জমা দিল, এবং নিলাম
পেয়ে বাকি টাকাও জমা দিল—এর কোনটাই তো যাতলায় নয়।
তাহলে?

সমস্তার সমাধান অবস্ত হয়েছিল, অনেকদিন পরে। আর তিন বছর পরে
ওখান থেকে বখশ বহলি হয়ে বাই তখন। বিনয় মিত্তিরই সমস্তার সমাধানটা
পেশ করেছিলেন। ওতারসিয়ার মিত্তিরেরও মনে শক্তি ছিল না, এমন একটা
ডাকব ব্যাপার কেন ঘটল জানবার অস্ত তিনি রীতিমত অস্বস্তান চালিয়ে-
ছিলেন। পেয়ে একদিন সকলকায় হয়ে আমাকে জানালেন, আগরওয়ালের
ব্যাপারটা এতদিনে পরিষ্কার হল তার।

: তাই নাকি? কী ব্যাপার বলুন তো?

: ঐ পাতাবী আর সিডি ভরলোক দুজন আগরওয়ালেরই লোক। আমায়

আজাদ! এসেছে, বাতে আমরা সন্বেহ না করি! ওরা হুজুমেই বেনামদার এসেছিল দরটা বাড়াতে।

সমাধান কোথায়? এ বে আরও ভালিবে দিচ্ছে। একজন লোক মাল কিনতে এসেছে, এবং পাছে কম দামে মালটা কেনা হয়ে যায় তাই হুজুন বেনামদার জুটিয়ে নিয়ে এসেছে—এ আবার কোন জাতীর সমাধান?

বিনয়বাবু আমার অবস্থাটা অল্পধাবন করেন। হেসে বলেন, মাফে সতের =' টাকার লোকটা আমাদের ঐ ডাড়া টিনের আবর্জনা কিনতে আসেনি আদৌ। সে এসেছিল ঐ টাকার দুটি জিনিস কিনে নিয়ে যেতে। প্রথমতঃ ছাপানো সরকারী ফর্মে আপনার মীল ও বাকর সম্বন্ধে একখানা রশিদ, আর দ্বিতীয়তঃ বাঙলা থেকে বিহারে পাচার করার উপযুক্ত খানকতক আনতেটেড্ লবি যুডয়েন্টের রোড পারমিট।

: ব্যাপারটা কি বুঝিয়ে বলুন তো?

বিনয় মিস্ত্রির রহস্যটা পরিষ্কার করে দেন। বে-আইনি হুঁচের ছিদ্র পথে আমরা সূতো গলতে দিইনি, কিন্তু আইনের টানেল পথে হস্তযুগের লম্বা কারাভান চলে গেছে গ্র্যাণ্ডট্রাক রোড বরাবর পূর্ব থেকে পশ্চিমে। শ্রীল শ্রীযুক্ত ময়ূকেন্দ্রন আগরওয়াল হচ্ছেন সচা স্বাধীন এ মহান উপহাসের একজন সরকার অস্বীকৃত করোপেটেড টিনের ভীলার। টিন হচ্ছে কন্ট্রোল্ড কমোডিটি। বিভিন্ন প্রকারে হাজার হাজার টন করোপেটেড টিনের প্রয়োজন হচ্ছে। সরকার তাই কন্ট্রোল করেছেন। সাধারণ ক্রেতা করোপেট টিন পাচ্ছে না। কালো বাজারে টিনের দাম আকাশ ছোঁয়া। এমনি বাজারে শ্রীযুক্ত আগরওয়াল আশ্বঃ-প্রাচীনিক কালো বাজারে টিন বিক্রয় করারবে নেমেছেন একটি পক-বাবিকী পরিকল্পনা ফেঁদে। পাঁচ বছরে লক্ষপতি হবেন কোটিপতি! বাঙলাদেশে উদ্ভাস্ত পুনর্বাসনের প্রয়োজনে লক্ষ লক্ষ বাঙালি টিন আসছে। বিহারে তাই টিনের কালোবাজারি দাম চতুর্গুণ! লরী যোগে তিনি উদ্ভাস্ত প্রকারের টিন পশ্চিমবাঙলা থেকে বিহারে পাচার করার উদ্দেশ্যে করেকশত লরি বিনিয়োগ করলেন। প্রতি ঘণ্টাতে পুন্ডিশকে পান বাঙলাবার নিখুঁত ব্যবস্থা আছে। লরি পিছু কোন ঘণ্টাতে কত লরী দিতে হবে তা ঠিক আছে। আগরওয়ালের পক-বাবিকী পরিকল্পনা প্রকল্প-হুটীর সময় তালিকা বন্ধ ঠিকই চলছিল। এমন সময় বাঙলা-বিহার সীমান্তে বে চেক পোস্টটি আছে, সেখানে এসে হাজির হলেন একজন বেরাফা ধরনের গৌরার পুন্ডিশ-অফিসার। থাকে টাকা দিবে

কেনা পেল না। নতুন বাধীন এ মহান উপবীপে সে যুগে এ জাতীয় নিৰ্বোধ সরকারী অফিসার মাঝে মাঝে আবির্ভূত হয়ে ওঁদের চালু কারবারে বাধার সৃষ্টি করতেন। কিন্তু তাই বলে তো কর্মবীর আগরওয়াল তাঁর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বানচাল হতে দিতে পারেন না। উদ্ভোগী পুরুষসিংহ তিনি। তৎক্ষণাৎ বের হয়ে পড়লেন সমস্তা সমাধানে। কিছু রোড পারমিট তাঁর চাই; আনডেটেড এবং লরির নাথার বাতে বসানো নেই। উদ্ভোগী পুরুষসিংহকে কে ঠেকাবে? সাড়ে সতের শ' টাকার অসম্ভবকে সম্ভব করলেন। সংগ্রহ করলেন সেই রকম খানকতক রোড পারমিট। ওঁর লোক সেই কয়টি ব্রহ্মাঙ্গ বুক পকেটে নিয়ে অকুতোভয়ে শত শত লরিতে হাজার হাজার বাণিজ্য টিন পাচার করেছে বাঙলা থেকে বিহারে। সেই মূৰ্খসম্রাট অফিসারটির অধঃস্থান কর্মচারীরা ব্যাপারটা জানত। তারা বাধা দেয়নি। পাওনা-গণ্ডার হিসাবটা দেখে নিয়ে তারা চুপচাপ ছিল। আর অফিসার স্বয়ং যে কারবার নিয়ে লরি ধামিরে চ্যালেঞ্জ করেছেন, আগরওয়ালের লোক তৎক্ষণাৎ লরি নাথার এবং তারিখ বসিয়ে রোড পারমিট হাখিল করেছে। সন্দেহ হবার কোন কারণ নেই। পি. ডাব্লু. ডি-র ছাপা সরকারী কর্মে একজন গ্রেডেটেড অফিসার নগদ পৌনে-দুহাজার টাকার প্রাপ্তি স্বীকার করে রসিদ দিয়েছেন আগরওয়ালকে, রোড পারমিট দিয়ে অকুমতি দিয়েছেন বিক্রিত টিন বাঙলা থেকে বিহারে নিয়ে যেতে। টিন নতুন কি পুরানো, ভাঙা কি গোটা তা তো আর কাগজে লেখা নেই। দু-চার-শ টাকার রসিদ হলে সন্দেহ হতে পারে তাই আগরওয়াল সাহেব দুজন বেনামদার সঙ্গে করে এনেছিলেন। তাদের একজন জালবাধা দাড়ি চুলকিয়ে এবং অল্পজন 'বেশক' মদ্র আউড়িয়ে টাকার অঙ্কটাকে রিসার্ভ ড্যানু পঁচিশ টাকা থেকে ঠেলতে ঠেলতে পৌনে দু-হাজারে টেনে তুলেছিল। ভাঙা টিনগুলো? সেগুলো বোধকরি গ্রাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোডের ধারে ঐ মিলিটারী ক্যাম্প থেকে অদূরের কোন অসাজমিতে অস্তিত্বপতি লাভ করেছিল।

আগরওয়ালের সাকাত আমি আর পাইনি। পেলে বোধকরি পারের ধুলো বিভাষ তাঁর। আমাকে ভুল্ললোক শ্রেক বুড়বক বানিয়ে ছেড়েছিলেন।

। ভিন্ন ।

তাই সূর্য্যবাবু যখন কৌশিক মিত্রের মাঝলার হঠাৎ আগরওয়ারালের কথা ভুললেন তখনই কোতুহলী হয়ে উঠেছিলাম আমি। ব্যাপারটা তলিয়ে দেখতে চেয়েছিলাম।

সূর্য্যবাবুর আবির্ভাবও বিচিত্র।

আমার অফিসে এসে দেখা করেছিলেন তিনি। না, সেই বর্ষমানের ছোট্ট অফিসের কথা বলছি না। এ একেবারে হাল আমলের কথা, এই তো সেদিন। এ বিশ বছরে আমারও যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। কয়েক ধাপ উপরে উঠে বর্তমানে কলকাতায় অফিস খুলে বসেছি। অফিসে বাণ কাস করছি। আদালী একটি ভিজিটিং কার্ড এনে রাখল আমার পোকে। সুপারিন্টেন্ডিং এজিনিয়ারের সাক্ষাত প্রার্থীর নাম শ্রীসূর্য্যবাবু গুপ্ত, আই, সি। এনফোর্সমেন্ট বিভাগের অতি উচ্চপদস্থ অফিসার। টেলিফোনে যোগাযোগ করেন নি। বিনা এ্যাপয়েন্টমেন্টে অন্তর্ভুক্ত হোমরা চোমরা অফিসার হঠাৎ এসে পড়েন না। সাক্ষাতের বিষয়বস্তুর ধরে লিখেছেন গোপনীয়। সে কথা লেখা বাহ্যিক। এনফোর্সমেন্ট বিভাগের অফিসার হাটলেও তা গোপনীয়, কানলেও তাই। আশ্চর্য্য করি, আমার কোন কর্মচারীর বরাতে কিরেকে। বাঘের আবির্ভাব যখন ঘটেছে তখন আঠারো ঘা হবেই। টানা হেঁচকা চলবে কাউকে নিয়ে। একটা অকল্পিত রিপোর্টের ডিক্টেশান দিচ্ছিলাম। কিন্তু ভিজিলেন্সের দাবী সবার আগে। স্টেনোকে সাময়িক বিদায় দিয়ে সাক্ষাত-প্রার্থীকে ডেকে পাঠাই। সূর্য্যবাবু এসে বসলেন সামনের চেয়ারে। আদালীকে ডেকে হু' কাস কফি বানাতে বললাম।

মি: গুপ্ত বসেন, এ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আনিমি, বসন্ত আপনার কাছে আনিমি টিক। আপনার ঘরের সামনে দিবে যেতে যেতে বাড়লা হরকে আপনার নামটা দেখেই কোতুহল হল। আপনার সঙ্গে আমার আলাপ নেই, তবে আপনার নামটা জানি।

সিগারেটের কেসটা বাড়িয়ে ধরে বলি, আপনি যে চাকরিতে আছেন,

তাতে আমার নামটা আপনার জানা আছে তবু আমি কিছু খুব কিছু উল্লসিত হতে পারছি না।

হো-হো করে ছাদ ফাটানো হাসি হাসলেন হুকুমার গুপ্ত। বলেন, আরে না না, সে সব কিছু নয়। থাকি পোষাক খুললেও আমার একটা পৃথক দত্তা থাকে, সে লোকটা বাড়লা গল্পের বই পড়তে ভালবাসে। যেমন আপনি অফিস কেবলত ধড়াচুড়া খুললে—

বাধা দিয়ে বলি, বর্তমানে সাহিত্য আলোচনা করতে আসেননি নিশ্চয়?

: না! আমি এসেছি একটা বিচিত্র অনুরোধ নিয়ে। অবশ্য হয়তো তাতে পরোক্ষভাবে আপনারও কিছু উপকার হতে পারে। একটা ভালো গল্পের গুট পেয়ে যেতে পারেন।

: কী ব্যাপার বলুন তো?

মিস্টার গুপ্ত যেটুকু ব্যক্ত করেন তার মর্মার্থ এই রকম:

কৌলিক মিত্র নামে একজন হাজতি আসামী আমার সাক্ষাতপ্রার্থী। সম্রাট বংশের শিক্ষিত ছেলে। শিবপুর এজিনিয়ারিং কলেজ থেকে বছর দুই আগে ফার্স্ট-ক্লাস নিয়ে সিভিল এজিনিয়ারিং পাশ করেছে। ঘটনাক্রমে একটা খুনের মামলার সে জড়িয়ে পড়েছে। পুলিশ তার বিরুদ্ধে ফার্স্ট ডিগ্রি মার্জার চার্জ এনেছে। সে নাকি কোন উকিলের পরামর্শ নিচ্ছে না। হুকুমারবাবুর প্রচেষ্টায় অরুপরতন মহাপাত্র নামে একজন উদীয়মান এডভোকেটকে পাঠানো হয়েছিল তার কয়েদখানায়। আসামী তাকে ওকালত-নামা দিতে অস্বীকার করেছে—

বাধা দিয়ে বলি, কিন্তু আপনি তো খুনের মামলার সরকার পক্ষের লোক। আসামীর উকিলের ব্যবস্থাপনার আপনার গরজ কি?

মিস্টার গুপ্ত বলেন, গরজ হু-তরফা। প্রথমত: বিচারাধীন আসামী যদি নিজ ব্যয়ে উকিল নিয়োগ করতে না পারে তাহলে সরকারী ব্যয়ে তাকে আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে অবশ্য আরও একটি কারণ আছে। সেটা ব্যক্তিগত। আমি নিজেই বিচিত্রভাবে জড়িয়ে পড়েছি কেসটার। বিবেকের কাছে আমাকেও একটা কৈফিয়ৎ দিতে হচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে কৌলিক যে এই মামলাটার পড়েছে সেজন্য পরোক্ষভাবে আমিও দায়ী! আমি নিজেই একটা ভাল বিস্তার করছিলাম একজন নামকরা ব্র্যাক-মার্কেটিয়ারের বিরুদ্ধে। যেমন খুবকর লোক তেমনি উপর

মহলে প্রতিশক্তি-ওয়ারা রাধব-বোরাল। জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে বাবার আশঙ্কাই ছিল বোলো আনা। বস্তুতঃ পুলিশের জালে যে ময়ূরকেতন কোনদিন ধরা পড়বে এ সৌভাগ্য স্বপ্নেও ভাবিনি, কিন্তু—

আমি বাধা দিয়ে বলি, কী নাম বললেন? ময়ূরকেতন?

: হ্যাঁ। চেনেন নাকি? নামকরা লোক! ময়ূরকেতন আগরওয়ার।

নামটা শুনে কোতুহল বেড়ে গেল আমার। প্রশ্ন করি : ময়ূরকেতন আগরওয়ার কি করোগেটেড টিনের ডীলার?

: এ প্রশ্নের কি জবাব দেব বলুন?

: কেন? 'হ্যাঁ' অথবা 'না'। কাঠগড়ার যেমন বলে।

: আপনি যদি বলেন 'রবীন্দ্রনাথ মানে কি সেই দাড়িওয়ারা ভদ্রলোক, যিনি বীরভূমের কি একটা গ্রামের স্কুলে মাস্টারি করতেন?' তার কি জবাব দিতে পারি?

আমি হাসতে থাকি।

: হ্যাঁ ময়ূরকেতন আগরওয়ার করোগেটেড টিনের হোলসেল ডীলার, শুধু টিনের নয়, সিমেন্টেরও স্টকিস্ট। কিন্তু সেটুকুই তাঁর পরিচয় নয়। তিনি কর্মযোগী। আধ ভদ্রন লিমিটেড কোম্পানীর বোর্ড অফ ডাইরেক্টরের সভা। তিনটির ম্যানেজিং ডাইরেক্টার। এ ছাড়া অন্যে ও যেখানে অনেকগুলি কারবারে তাঁর অর্থ বিনিয়োগ করা আছে। টাকার কুমীর!

: ধরতে পেরেছেন তাঁকে?

: আজ্ঞে না। নোধকরি ঐ আগরওয়ারের জাতের কাউকে দেখেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'আমারে বীধবি তোরা সেই বীধন কি তোদের আছে।'

হাসতে হাসতে বলি, বারে বারে রবীন্দ্রনাথকে পেড়ে ফেলছেন কেন?

: হ্যাঁ ঠিক কথা। রবীন্দ্রনাথ নয়, ময়ূরকেতনও নয়,—আমাদের আলোচ্য বিষয় কৌশল মিত্র। কবি কৌশল মিত্র!

: কবি? এই যে বললেন সে এজিনিয়ার?

: এরপর আমার প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হচ্ছে 'আপনি বতীন সেনগুপ্ত নামে এক ভদ্রলোকের কথা কখনও শুনেছেন?' কিন্তু সে প্রশ্ন করলেই আপনি তো বলবেন 'আবার কবি বতীন সেনগুপ্তকে পেড়ে ফেললেন কেন?'

: বুঝলাম। অর্থাৎ বহিচ ইট কাঠ মোহা লকড়ের কারবারী তবু কৌশল কবিতা লেখে—

: সেখে বয়, লিখত ! তা সেই কবি কৌশিককে গ্ৰেপ্তার করার পর তার বরটা আমরা মার্চ করি। বের হয় একখানা কবিতার খাতা, অথবা ডায়েরী। কৌশিক আমাকে অত্যাশ্চর্য করেছে খাতাখানা আপনাকে পৌছে দিতে। মাঝার এভিডেন্স হিসাবে সে খাতার কোন প্রয়োজন নেই। বিচারে ওর কি হবে জানি না। খাতাখানা আমার কাছে আছে। আপনি অত্মমতি করলে সেখানা আপনাকে পাঠিয়ে দিতে পারি। রসিদ দিয়ে খাতাখানা নিয়ে নেবেন।

আঁথকে উঠি আমি—আমিতে। কই কোন কৌশিক যিডকে চিনি না। আমি তার কবিতার খাতা নিয়ে কি করব ?

: আপনি তাকে চেনেন না। সে আপনাকে চেনে। বি. ই কলেজের রি-য়ুনিয়নে প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে কয়েক বছর আগে বুকি আপনি বক্তৃতা দিয়েছিলেন, সে তখন ছাত্র ছিল, দূর থেকে আপনাকে দেখেছে। তাছাড়া আপনার লেখা বইও সে কিছু পড়েছে বলছে।

: তা হঠাৎ আমাকে কেন ?

: সে কথা সেট বলতে পারে।

: কোন জেলে আছে সে ? দেখা করা যাবে ?

: তা যাবে। তবে সে কলকাতার নেই।

মকঃখল শহরটির নাম করতে বলি, ওটা তো আমার জুরিসডিকশনে। আমি ওখানে প্রায়ই টায়ে যাই।

: বেশ তাহলে বোগাবোণ করবেন। আমাকেও বেতে হয়।

এভাবেই কৌশিকের কেসটার সঙ্গে আমি জড়িয়ে পড়ি। পরের সপ্তাহেই ঐ শহরে আমার একটা কাজ ছিল। কয়েকটা থান্ জমির এককোচমেন্ট ব্যাপারে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে এবং এ. ডি. এম. ল্যাও রেকর্ডস্-এর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট ঘোষ সাহেবের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল, কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছিলাম হাকতি আসামী কৌশিক যিডের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই, তিনি ব্যবস্থা করতে পারেন কিনা। সহজেই ব্যবস্থা হয়ে গেল। কৌশিককে জামিন দেওয়া যায়নি। মাঝমা এখনও কোর্টে ওঠেনি। এসব ক্ষেত্রে আসামীর উকিল ছাড়া অন্য কাউকে সচরাচর আসামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দেওয়া হয় না ; কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেবের চেষ্টায় আমার কোন বাধা হয়নি। পরাতের দুপ্ৰাণে দুতনে লাড়িয়ে প্রথম আলাপ করেছিলাম কবি

কৌশিক যিজের সঙ্গে। সেই প্রথম সাক্ষাতেই কৌশিক আমাকে বলেছিল, আপনি যে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন তা ভাবিনি।

বললাম : এত লোক থাকতে তোমার কবিতার খাতাখানা আমাকে পাঠিয়ে দিতে বলে ছিলে কেন ?

সে কথার জবাব না দিয়ে বলে : কবিতাগুলো পড়েছেন ?

: না পড়িনি ! তোমার কী উদ্দেশ্য জেনে নিরে পড়ব বলে রেখে দিয়েছি।

কৌশিক হেসে বললে, প্রেমের গল্প তো অনেক লিখলেন, এবার আমাদের নিরে কিছু লিখুন না। প্রেম-ক্রেমের বলাই নেই, নিছক কাঠখোটা ব্যাপার। আমাকে বিরো করতে বলছি না, তবে আমাদের সমস্তাটা নিরে আপনি কিছু লিখলে আমি খুশী হতাম।

প্রশ্ন করি, বারে বারে ‘আমাদের’ বলছ। এই ‘আমরা’ কারা ?

: ‘ডিসপ্রেসড’ মানুষদের নিরে আপনি যা লিখেছেন তা পড়েছি, এবার ‘মিসপ্রেসড’ মানুষদের নিরে কিছু লিখুন। বারো বাস্তবচ্যুত নয়, বাস্তবচ্যুত। বারো ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে যাক দরিয়ার—কোন নিরাপদ বন্দরে নোঙর ফেলবার দার। সুযোগ পাচ্ছে না। উদ্ভাস নয়, তার। উদ্ভুত। সাধুগ্রাম ! আমি ভারতবর্ষের বাইশ হাজার বেকার ডিগ্রিধারী এজিনিয়ার আর ত্রিশ-চল্লিশ হাজার ডিপ্লোমাধারী টেকনিসিয়ানদের কথা বলছি।

স্বকুমার গুপ্ত সাহেবের কাছে মোটামুটি ব্যাপারটা শুনেছিলাম। কৌশিক বছর দুই আগে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছিল। কলেজে একজন প্রফেসর অফ-ট্রেনিং আছেন। পাশ করা ছেলেরা যাতে ট্রেনিং এর সুবিধা ঠিকমত পায় তাই দেখেন তিনি। এই কার্ট ক্লাস পাওয়া ছেলেটিকে কোন প্রতিষ্ঠানে ট্রেনিং দেবার আশ্রয় চেষ্টা করেছিলেন ডব্লিউলোক। সরকারী, আধাসরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে। সব জায়গা থেকেই জানানো হয়েছিল—ঠাই নাই, ঠাই নাই, ছোট সে তরী ! অথচ আজ থেকে ছয় সাত বৎসর আগে কৌশিক যখন হাজার লেকেয়ারী পাশ করে তখন এই অনার্সাল কলার ছেলেটির ভক্ত সর্বত্রই তার অব্যাহত ছিল। সে অনার্সালে ডাক্তারী পড়তে পারত। পদার্থ, রসায়ন এবং গণিত তিনটে বিষয়েই তার লেটার মার্ক ছিল। যে কোন এক-টাতে সে অনার্স পড়লে কার্ট ক্লাস পেতে পারত। কম্পিউটিং পরীক্ষা দিতে পারত। তাকে এর করেছিলাম, সে কেন করতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে এনে-ছিল আরো।

কৌশিক জবাবে হেসে বলেছিল, সে কথা তো আমি বলব না। সে কথা বলবেন আপনি, আপনার উপস্থানে। তবে জেনেছিলাম, দেশের যিনি কর্ণ-ধার, তিনি নাকি বলেছিলেন, বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে রূপ দিতে গেলে প্রাথমিক প্রয়োজন হাজার হাজার কারিগরী কাজ জানা যাব। টেকনি-সিয়ান্স আর এঞ্জিনিয়ার। কাগজের কাটিং আছে আমার কাছে। দেব আপনাকে পড়ে দেখবেন!

: তোমাদের ব্যাচে যত ছেলে পাশ করেছিল, তাদের আন্দাজ কতজন এখনও বেকার আছে?

কৌশিক হেসে বলে, শুধু আমাদের কলেজের স্টাটিসটিক্স নিলেই তো চলবে না; খণ্ডিত বাঙলার আজ ছয়টি গভর্নমেন্ট অহুমোদিত এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আছে। প্রাক স্বাধীনতা যুগে গোটা বাঙলা দেশের জন্য ছিল একটি মাত্র! সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং গ্র্যাজুয়েট তখন হত শুধু শিবপুর থেকেই। আজ দলে দলে পাশ করে ছেলের দল বেরিয়ে আসছে, আর তাদের বলা হচ্ছে তারা সারথাস! কোথাও তাদের ঠাই নেই! আমার একজন সতীর্থ, পাশ-করা এঞ্জিনিয়ার প্রাইমারী ইন্সুলে মাস্টারি করছে, একজন বাটার দোকানে জুতা বিক্রি করে, একজন স্টেনোকারি দোকান খুলে বসেছে। আমি তো খুনের মামলার বিচারাধীন আসামী! জানিনা সন্ত্রাসি অকুণ্ঠিত কলকাতার অসংখ্য ব্যাক ডাকাতি কেসে আমার অন্য কোন সহপাঠি ফেরার হয়ে আছে কিনা!

বেকার মাহুঘটা হস্তে হয়ে ধারে ধারে মাথা খুঁড়ে মরছে একটা কাজের সন্ধানে। পায়নি। ঠিকাদারী করতে চেয়েছে, দেওয়া হয়নি তাকে। কেরানির কাজ, ফুল-মাস্টারির কাজের জন্য দরখাস্ত করেছে। মঞ্জুর হয়নি। বেখানে সে ওভার-কোরালিকারেড। সব শেষে এসে আশ্রয় পেয়েছে জেল হাউসে। বললাম, জেনেছি তুমি কোন ডিফেন্স দিচ্ছ না। কেন? গিল্টিও তো প্রীত করনি তুমি।

: গিল্টি প্রীত করতে যাব কোন হুঁখে? গিল্টি আমি, না বারী কোন-ঠাসা করে আমাকে এখানে এনে কেলছে?

: না, আমি হোমিনাইড কেসটার কথা বলছি, খুনের মামলাটা!

: আমিও তো তাই বলছি। হুঁ-সবল শিকিত একটা মাহুঘকে ফুল বুঝিয়ে, ফুল নির্দেশ দিয়ে, শেষ পর্যন্ত বারী খুন করল, তাদেরই আমি

শিল্পটি যেনে করি। ধারা বলেছিলেন, দেশের প্রয়োজন হাজার হাজার এঞ্জিনিয়ারের।

বুঝতে পারি, কৌশিক ঠিক প্রকৃতিই নেই। ও এমন চাপা দিয়ে বলি, কিন্তু সে অন্তারের প্রতিবাদ করতে হলে তোমাকে তো জেল থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। সেজন্য এখন তোমার সবচেয়ে বড় প্রয়োজন একজন উকিলের। নয় কি?

কৌশিক হাত দুটি জোড় করে বলে : না! অন্তারের প্রতিবাদ করার সখ আর আমার নেই। অনেক কটে অসুচিন্তা দূর হয়েছে আমার। নিশ্চিন্ত বন্দরে নোঙর ফেলতে পেরেছি। ধর্মাবতার যদি ম্যানিলা যোণের সুবন্দোবস্ত করেন তবে তো জ্যাঠা চুকেই গেল, আর না চলেও দীর্ঘদিন সরকার আমার অসুচিন্তার আয়োজন করবেন। খেটে খেতেই চেয়েছিলাম। এখানেও সে ব্যবস্থা আছে।

একটু ধৈর্যে আবার বলে, তবে কি জানেন, এককালে কবিতা লিখতাম। আপনি লেখক মানুষ আর কেউ না বুঝলেও আপনি আমার বেদনাটা বুঝবেন। কবিতাগুলো কোথাও প্রকাশ করিনি, চেষ্টাও করিনি। সেগুলো জেলগানার দপ্তরে উইপোকার অত্যাচারে শেষ হয়ে যাচ্ছে যেন হলে জেলে বসেও স্বস্তি পাবনা আমি। আমার অনেক বিনীত রাজের লাকী ওরা। তাঁই আপনাকে পাঠিয়ে দিতে বলেছিলাম! আপনি ওগুলো পড়লেন কি ওজনদরে পুরানো কাগজওয়ালাকে বেচে দিলেন তা জানার আমার আর কোন প্রয়োজন নেই, স্বযোগও হবে না।

: কিন্তু এত লোক থাকতে আমাকে কেন?

: তার কারণ আমরা একই প্রফেসানের লোক। তার উপর আপনি লেখেন-টেখেন! চরতো আদ্যদের সমস্তা নিয়ে কিছু লিখতেও পারেন।

স্বপ্নমার গুলু মশায়ের সাহচর্যে ধানার আটকপড়া তার ডায়েরি বা কবিতার খাতাগুলোর নাগাল পেয়েছিলাম। বিভিন্ন সময়ে ডায়েরি লিখেছে কৌশিক। না, ঠিক কবিতার খাতা নয়। ডায়েরির কর্মে লিখতে লিখতে হঠাৎ কবিতা লিখতে শুরু করেছে। বিভিন্ন যুগের রচনা আছে মোটা বাঁধানো খাতাটার। পাঁচসাত বছরের ইতিকথা। প্রতিটি রচনার তারিখ আছে। এখন পাতাখানা দেখে বুঝছি খাতাটা বছর পাঁচেকের পুরাতন। ও তখন দ্বিতীয় বার্ষিক জেবীর ছাত্র। শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং

কলেজের আবাসিক। প্রথম যুগে ওর রচনা ছিল সাধুভাষা বেঁধা। ক্রিয়া-পদগুলি সাধু ভাষায়। কৌশিক মিত্র বি. ই. কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক ছাত্র হিসাবে ছিল পুরোপুরি রোমান্টিক কবি। একটু উদাহরণ দিই :

“অনেকদিন পরে আজ কবিতা লিখিতে ইচ্ছা জাগিতেছে। দীর্ঘ দিন কবিতা লেখা বন্ধ আছে। বস্তুতঃ এজিনিয়ারিং পড়িতে আসিবার পরেই কবিতা লেখা বন্ধ করিয়াছি। ইট কাঠ লোহা লকড়ের এ অরণ্যে কাব্যলক্ষী পথ হারাইয়াছিলেন। খাতার গত ছুই বৎসরের ভিতর কোন কবিতা যুক্ত হয় নাই। কিন্তু এভাবেই কি কৌশিক মিত্রের কবিসত্তা অন্তিম গতি লাভ করিবে? কংক্রিটের স্তূপে কাব্যলক্ষীর কবর রচিত হইবে? যে পরিবেশে আসিয়া পড়িয়াছি তাহারই ভিতর হইতে আমাকে রস আহরণ করিতে হইবে। সঞ্জীবচন্দ্র-বর্ণিত পালানোএর পাথরের ফাটলের সেই গাছটির কথা আজ মনে পড়িতেছে। আমাকেও তাই চিরাচরিত টাঙ্গ-ফুল পাখীদের বিদায় জানাইতে হইবে। ইট-কাঠ-বীম-বর্গাই আমার কাব্যের উপাদান! এই গ্রেট গার্ডার ব্রীজ, এই স্টীল-স্ট্যানসল, এই আর সি. সি. ডিমাইনের ভিতরেই বাহা কিছু স্নন্দর, বাহা কিছু সুকুমার তাহাকেই যেলিয়া ধরিব।

‘এ রাজ্যে স্নন্দর সুকুমার কিছু নাই? নাই থাকিল। শুধু সৌন্দর্য এবং সৌকুমার্যই যে কাব্যের উপাদান নহে তাহা উপলব্ধি করিবার মত বয়স সাহিত্যের হইয়াছে।

“আজ এই জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রে তাই কবিতা লিখিতে বসিয়াছি। সার্ভে ক্যাম্পের অপর তিনজন ককবন্ধু ক্লাস্ত ভাবে নিদ্রামগ্ন। সমস্ত দিন মাঠে মাঠে জরীপ করিয়াছি, তারপর সন্ধ্যা বেলায় ফুলপ্যাণ্ট হইতে চোর কাটা ছাড়াইতে ছাড়াইতে গল্প করিয়াছি। সন্ধ্যার পরে ক্যাম্প ফারারের হরোড়। তারপর সারমাশ সারিয়া বসিয়াছিলাম ফিল্ড-বুক লিখিতে। দশটা বাজিতেই যে বাহার তাঁবুতে ঘুাইয়া পড়িয়াছে। আমি মোমবাতি জালিয়া এই দিনপত্র লিখিতেছি।

“বাহিরে হুইহুটে জ্যোৎস্না। সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশ। ধরষোতা নদীর বামতীরে বাসিয়াড়ির উপর জকলের শেষ প্রান্তে আমাদের এই সার্ভে ক্যাম্প। তাঁবুর একটা কান্না তুলিয়া দিয়াছি। বাহিরে জোনাকী পোকার ইতস্ততঃ বিচরণ—অনংখ্য স্ককরমান আলোকবিন্দু। আর কিম্বকি দিয়া জ্যোৎস্নার আলোর রূপালী আভরণ। রাজিচর কি একটা পাখী অনেককণ

ধরিয়া একটানা তাকিতেছে—কুক-কুক-কুক-কুক। শীতকালে কত আতের
কত পাখীই না আসে এ অঞ্চলে। সহস্র সহস্র ঘাইল অভিক্রম করিয়া বরক-
জমা ছরত শীতের রাজ্য হইতে উহার। এখানে উড়িয়া আসে, সাময়িক
আশ্রয়ের আশার। আমরা যে বন্ধুধারী শিকারীর দল নহি এ সত্যটা
বুঝিতে উহারের প্রথম কিছুদিন সময় লাগিয়াছে। এখন আর খিওতোলাইট
অথবা মেডলিং বন্ধকে বন্ধু বলিয়া ভুল করেনা। এখন খুব কাছে ঘাইলেও
উড়িয়া যায় না। কিন্তু না, চাঁদ নয়, জোনাকী, পাখী নয়—আজ আমার
কাব্য চর্চার উপকরণ ঐ সার্ভে চেন। খাটিরার নিচে চেনটা গোটানো
অবস্থায় পড়িয়া আছে। সে বেচারিও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দিন
বনবাদাড় ভাঙিয়া দৌড়াইয়াছে। আমরা চারবন্ধু যেন সে সব কথা যেমানুষ
ভুলিয়া নিশ্চিন্তে নিদ্রা ঘাইতেছি, অভিমানস্রুকা উহার কথা আমাদের খেয়ালই
নেই। কান পাতিলে শুনিতে পাইতাম ও-ও যেন বলিতে চাহে ‘কেন কানি,
বুঝিতে পার না? তর্কেতে বুঝিবে তা কি? এই মুছিলাম আখি, এ শুধু
চোখের জল, নহে ভৎসনা! বস্তুবাদী আমার তিন প্রায়কটিকাল হবু-
একিনিয়ার বন্ধুর কাছে অভিমান স্রুকা ঐ সার্ভে চেনের কথা পৌছাইবেনা,
তাই আমি আজ রাতে উহার সহিতই কিছু গোপন কথা বলিতে চাই। আজ
রাতে সেই আমার কাব্য নারিক। :

আজকে আমার কাব্য চলে সার্ভে চেনের সঙ্গে রে
হাসিন্ না কেউ পাগলা কবির পাগলাঘির এই সঙ্গে রে।
ক্যাম্পে গোলাপ বকুল কোথায়? এ অঞ্চলে কই প্রিয়ে?
সার্ভে চেনেই দেখছি শুধু লিখব বা হয় ওই নিরে।

হাসিন্ নে কেউ, হাসিন্ নে।

না হয় তোরা ক্যাম্পে কবির খুঁততে কাব্য হাসিন্ নে।
“তীবুর মাঝে পারের কাছে গুটিয়ে আছে চেনটা ওই,
সার্ভে তীবুর নির্জনেতে রইবে কে আর ও চেন বই?
পথ-বিপথে আমার সাথে ওই তো একা সঙ্গীরে
ছুটছে দেখি ভিত্তিরে পাশাড়, ছুটছে গহন বন চিরে।
হৃপ্ত রোদে পাশেই আছে, আমার সাথেই এক ঘরে
খাটের নিচে গুটিয়ে তুচ্ছ রাজি কাটার রাগ করে।
কের সকালে রাগ রবেনা এমন বন্ধু কার আছে?

খাটিয়া তলে শুটিয়ে দেহ চূপ করে শোর পা'র কাছে ।

হাসিস্ নে কেউ হাসিস্ নে ।

ইচ্ছা না হয় মোর বঁধুরে না হয় ভাল বাসিস্ নে ॥

“সহপাঠি সুরেশ নাগের বোধকরি নিজার ব্যাখ্যাত হইতেছে’ । নিজাজড়িত
কণ্ঠে প্রশ্ন করে—তোর ফিল্ড-বুক লেখা এখনও হজনা রে ?

“বলিলাম : ফিল্ড-বুক নয়, কবিতা লিখছি !

: কবিতা ! হার খোদা ! এই ক্যাম্প এসেও তোর খোড়া রোগ
সারেনি । এখানেও কবিতা ? কাল সকালেই গ্রুপ বদলাতে হবে । এ
পাগল কবির সঙ্গে বেহুদা রাত জাগা আমার পোষাবে না । তা কি নিরে
লিখছিস্ ? কবিপ্রিয়টি কি কল্লনাকুমারী না বাস্তবিকা ?

: বাস্তব !

: মাইরি ! —খাটিয়ার উপর উঠিয়া বসে সুরেশ । রোমান্সের গন্ধে ঘুম
ছুটিয়া গিয়াছে । বলে : পড়তো একটু, শুনি । কে রে মেয়েটা ? আমি চিনি ?

বলিলাম : খুব চিনিস্ । কবিপ্রিয়া এখানেই আছে কিন্তু ।

: এখানে মানে ? এই ক্যাম্পে ?

: ই্যা শোন্ না ।

কিন্তু সুরেশ নাগ প্রাকটিক্যাল এঞ্জিনিয়ার ! প্রথম দুই স্তবকও ধৈর্য ধরিয়া
শুনিতে পারিল না । বলিল : মারো গুলি ! শেষ বেশ সার্ভে চেনের সঙ্গে
শ্রেয় করছিস্ ? তোর কপালে দুঃখ আছে ।

“পাশ ফিরিয়া আবার শুইয়া পড়ে । আমি শেষ স্তবকটি সমাপ্ত করি—

“লোহার গড়া শীর্ণ তবু সন্ন্যাসের মতন রে,

সার্ভেয়ারের সিংহাসনে সবার সেরা রতন রে ।

কণ্ঠে প্রিয়ার লকেট দোলে, কেউ জানেনা সেই ধবর

দুই হাতে দুই কাকন ছাড়া আর তো কিছুই নেইক ওর ।

বখন হাতে শেকল পড়ে তখন তো কই হাসিস্ নে ?

আমার প্রিয়া শান্ত বলে তাই কি ভালবাসিস্ নে ?

তবু প্রিয়া চায়না আমার বাঁধতে তুচ্ছ মাল্লব জন,

ইচ্ছা তাহার বাঁধবে ঘিরে মিথিল বিশ্ব তিন ভুবন ।

হাসিস্ নে কেউ হাসিস্ নে ।

ভিটের অধি অরূপ করে আমার প্রিয়ার আশ্রয় নে ।”

কবি কৌশিক যিজের অঙ্করোধ আমি রাখতে পারিনি। আমি হেসে কেসেছিলাম। সার্ভে চেন নিয়ে আমাকেও নাড়াচাড়া করতে হয়েছে ; কিন্তু তার মধ্যে অভিমানহুকা ক্ষুরিতাধরা কোন নারিকাকে দেখিনি কখনও। কৌশিক বলেছে বটে যে ঠান্ড-তার-কুল পাখী তার কাব্যের বিষয়বস্তু নয়, কিন্তু তাই বলে ঠান্ডকে তার কলসানো কটি বলে মনে হয়নি। মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী ঘরের ছেলে সে, প্রাচুর্যের মধ্যে না হক, অভাবগ্রস্ত হা-ঘরে ঘরের বাতাবরণে তার বালা ও কৈশোর কাটেনি। ঠান্ড-কুল-পাখীকে নিয়ে সে যদি বিলাসিতা করতে না চায়, তবে তার হেতু এ নয় যে কুধার তাড়নায়, অভাবের বহনায় সে বিকৃত হয়ে উঠেছিল। তার কাব্যের বিষয়-বস্তু অধিকাংশই এজিনিয়ারিং শিল্প থেকে বেছে নেওয়া—নাট-বল্ট, রেল, সেট-কোয়ার, করাত বাটালি, কিংবা ছুতার কামার-রাজমিস্ত্রিরাই তার কাব্যের নায়ক। কখনও কখনও তার ব্যতিক্রমও আছে। যেমন ধরা যাক সিগারেটের স্ট্যাম্পের উপর লেখা তার কবিতাটি। আদিযুগের ওর সব কবিতাই ছন্দবদ্ধ, স-মিল, অধিকাংশই যাদ্ধাত্ত ছন্দে রচিত। এবং সর্বত্রই একটা রোমাটিক আমেজ। ‘স্টাম্প’ কবিতাটি উদাহরণ হিসাবে তুলে দেওয়া যেতে পারে।

“অঙ্ককার পথপ্রান্তে কীরমান লয়ে ক্ষুদ্র আয়ু
পড়ে আছি ;—মুহুর্তই পুড়ে হব ছাই।
ধূমভস্ম শেষ খাসে লুপ্ত করি দিবে যবে বায়ু
এ ধরায় শেষ চিহ্ন আর কিছু নাই।
কোন কীর্তি রহিবেনা স্মরি নাম এ ধরায় বুকে,
অনন্ত জিজ্ঞাসা পিছে অঙ্ককার উদ্বেল সম্মুখে
জীবনের লেনা-দেনা বতকিছু সবই বাবে চুকে
পূর্ণচ্ছেদ টেনে দেব জীবন পাতায়।
বার্ষ, বার্ষ বৃথা অয় ! অবজার ফেনে দেছ ছুঁড়ে,
প্রয়োজন ফুরিয়েছে, ফুরিয়েছে কাজ ;
আপনার বহিতেজে স্বতি লয়ে মরি পুড়ে পুড়ে
এ্যান্টে বা পথপ্রান্তে ছাই হব আজ।
উপেক্ষিত এ প্রদাহ নিবিবেনা কারও অকপাতে,
হয়তো অলিব একা অতিকান্ত বৌবনের সাথে,

মরতো দাঁহন মোর শেষ হবে কারও পদাধাতে—

নিশ্চেষ্টে নিবে যাবে জীবনের দায় ।

তবু জানি হে স্মোকার ! আজও মোর কিছু আছে বাকি

সেই স্মৃতি বুকে লয়ে আজও দিন গোনা ;

মনে পড়ে একদিন এই হাতে বেঁধেছিলে রাখী

নিরেছিলে তুলি' মোরে তুমি আনুমনা ?

মনে আছে আলগোছে ধরেছিলে মোরে মমতনে ?

মনে আছে কী সোহাগ করেছিলে চুষনে চুষনে ?

বিদায় বেলায় আজ সেই স্মৃতি গোঁথে লব মনে ;

‘এ-সবু চোখের জল, নহে ভৎসনা ।’

এ কবিতাগুলি যখন সে লিখেছে তখন কতই বা বয়স হবে ওর ? উনিশ-কুড়ি । সমস্ত ছনিয়াকে সে তখন দেখছে রোমান্টিক দৃষ্টিতে । আগেই বলেছি, কবিতার বিষয়-বস্তু সে বেছে নিরেছিল তার জীবন থেকেই । ইট, কাঠ, সিমেন্ট, লোহা, বীম, বরগা । তবু ওর মধ্যেই সে লবঙ্গা মধুরকে, স্তম্ভরকে, আনন্দমন জীবনকে খুঁজতে চেয়েছে । কঠিন দুর্ভদ্র বাস্তবের প্রতি সে উদাসীন নয়—কিন্তু তার কবিতায় সেই কাঠিলের আবরণ ভেদ করে দেখতে চেয়েছে ভিতরে নরম শাঁস আছে কিনা । সে কুলি-মজুরদের নিয়ে কবিতা লিখেছে, রাজমিস্ত্রি ঢালাই-মিস্ত্রিদের নিয়ে কাব্য করেছে—কিন্তু মানুষের প্রতি সে তখনও বিশ্বাস হারাননি । কবি যতীন সেনগুপ্তের প্রভাব তখন তার উপর খুব বেশী পড়ায় । তার সৌন্দর্য-পিপাসু মন পাথরের ফাটল থেকেও জীবনরসের উৎস সন্ধানে অভিসারী, পালানো বণিত সেই গাছটির মতো । কলক থেকে তৃতীয় বাষিক ছেলেদের বুকি ডিহরী অন শোনের কাছে ডালমিয়া মগরে সিমেন্ট, চিনি আর কাগজের কারখানা দেখতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল । ওর সতীর্থ বন্ধুরা নিশ্চয়ই নানারকম নোট লিখে নিয়ে এসেছিল, পরীক্ষা সমূহে পাড়ি জমানোর উদ্দেশ্যে । হরতো কৌশিকও লিখেছিল, কিন্তু তাছাড়াও সে ভারেরিতে লিখেছে :

“একেশ্বর সেনগুপ্ত আমাদের সমস্ত কারখানাটা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখাইলেন । চিনির কারখানা । রেলওয়ে ওয়াগনে করিয়া লক্ষ লক্ষ ইঞ্চিও আনিতেছে, বিরাট বয়, বৈভ্য ক্রমাগত সেই ওয়াগন ভর্তি ইঞ্চিও একাও মুখ-চাঁদান করিয়া গলাবন্ধন করিতেছে । তারপর কত ক্রিয়া, প্রক্রিয়া,

কত বহু-বহুগার পথ বাহিয়া সেই ইকুন্তনি শেষ পর্বত তল্ল শরীরের বেশে
সহস্র সহস্র বস্তার রূপান্তরিত হইয়া আবার ওরাগনে চড়িতেছে। হুই
প্রান্তের মধ্যবর্তী অংশে কত রকমের বহু, কত কারকা, কত কারিগরী।
কোন দৈত্যের কত অশক্তি, কি বৈশিষ্ট্য, কোথায় কি রাসায়নিক পদার্থের
সংমিশ্রণে বর্ণবর্ণের শুভ কেমন করিয়া বর্ণায়মান ড্রামের লাহাব্যে তল্ল-
শরীরের নবরূপ পরিগ্রহ করে তাহার বিস্তারিত বিবরণ দিলেন। এমনই
তো হয়। লাল চেলিতে সর্বাঙ্গ মুড়িয়া উদ্ভিন্নবোধনা নববধু যখন তাহার
সোনালী ঝপের সবটুকু মধু বুকের মধুভাণ্ডে লুকাইয়া নৃত্য সংসারে প্রবেশ
করে তখন কি কেহ মনে রাখে তাহাকে এ সংসার ছাড়িয়া বেহিন বাইতে
হইবে সেদিন সে বিগত বোধনা ; বৈধব্যের তল্ল বেশে তখন তাহার সোনালী
মাধুর্যের কোন চিহ্নই থাকিবেনা ? তখন তাহার গহনার গোপন বাসটি
খুলিয়া দেখিও, হয়তো দেখিতে পাইবে প্রথম পর্বারের কিছু ধূলুর প্রেমপত্র,
হয়তো বা শূন্যগর্ভ একটি সেক্টের শিশি, কিবা প্রথম প্রণয়ের কিছু তুচ্ছ
উপকরণ। চিনির কারখানায় পাহাড়-প্রমাণ আখের ছিবড়ার অপেক্ষা তাহার
মূল্য বেশী নহে। কিন্তু হুই ইকু-শরীরের উপর আমি কবিতা লিখিব না।
কারখানার বাতায়ানের পাথে অপর একটি দৃশ্য আমার নজরে পড়িয়াছে।
দেখিকে কেহই আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে নাই। আপনিই নজরে পড়িল।
একটি কুলি বস্তী। বজহরদের পাশাপাশি করেকটি মাথা ভাঁজিবার আত্মনা।
ছোট ছোট খাপরা টালির ঘন বসতি। ধুলো আর কাদা, রাতার কুকুর
আর উলঙ্গ শিশু—দড়ির চারপায়ে বিস্তারিত বুদ্ধা, রাতার কলে পানীরজল
আহরণকাণীণীর দল—এ দৃশ্যই আমার মনে রেখাপাত করিয়াছে। তাহাদের
কথাই লিখিয়া ফেলিলাম আমার কবিতার খাতায়—“ওরা” :

“ভোরবেলা ছ’টা বাজে, বাজে তাই চিনি কল লিটি
চমকি’ জাগিয়া ওঠে ত্রুতে ব্যস্তে মিলের বতিটি।
কলতলে জমে ভীড়, পাশাপাশি, বচসা অস্লীল,
ভ্যান ভেনে মাছি ওড়ে, বহু হাওয়া, ভ্যানসা বাতাস,
ভ্যাটপচা গছতে আরও বেশ হয়েছে পড়িল।
নিঃস্ব কুলি হুনিহুতে বুকে চুপে চাপে বীর্ষশাল।
তবু প্রাতে উঠে ছোট্টে সর্বগ্রামী বহু দৈত্যপানে
বহু অঠরেতে মিলে তারহুয়া আত্ম বলিদানে।

হয়তো দাঁহন মোর শেষ হবে কারও পদাঘাতে—

নিশ্চয়ণে নিবে যাবে জীবনের দায় ।

তবু জানি হে স্মোকার ! আজও মোর কিছু আছে বাকি

সেই স্বতি বুকে লয়ে আজও দিন গোনা ;

মনে পড়ে একদিন এই হাতে বেঁধেছিলে রাখী

নিরেছিলে তুলি' মোরে তুমি আনুমনা ?

মনে আছে আলগোছে ধরেছিলে মোরে সবতনে ?

মনে আছে কী সোহাগ করেছিলে চুখনে চুখনে ?

বিদায় বেলায় আজ সেই স্বতি গোঁথে লব মনে ;

‘এ-সবু চোখের জল, নহে ভুল’না ।”

এ কবিতাগুলি যখন সে লিখেছে তখন কতই বা বয়স হবে ওর ? উনিশ-
কুড়ি । সমস্ত তুনিরাকে সে তখন দেখেছে রোমাটিক দৃষ্টিতে । আগেরই বলেছি,
কবিতার বিষয়-বস্তু সে বেছে নিরেছিল তার জীবন থেকেই । ইট, কাঠ,
সিমেন্ট, লোহা, বীম, বরগা । তবু ওর মধ্যেই সে লবঙ্গা মধুরকে, স্নন্দরকে,
আনন্দমন জীবনকে খুঁজতে চেয়েছে । কঠিন দুর্ভদ্র বাস্তবের প্রতি সে উদাসীন
নয়—কিন্তু তার কবিতায় সেই কাঠিলের আবরণ ভেদ করে দেখতে চেয়েছে
ভিতরে নরম শাঁস আছে কিনা । সে কুলি-মজুরদের নিয়ে কবিতা লিখেছে,
রাজমিস্ত্রি ঢালাই-মিস্ত্রিদের নিয়ে কাব্য করেছে—কিন্তু যাহ্নবের প্রতি সে
তখনও বিশ্বাস হারাননি । কবি বতীন সেনগুপ্তের প্রভাব তখন তার উপর
খুব বেশী রাজ্যায় । তার সৌন্দর্য-পিণাহ মন পাখরের ফাটল থেকেও জীবনরনের
উৎস লছানে অভিসারী, পালানো বণিত সেই গাছটির যতো । কলেজ
থেকে তৃতীয় বাবিক ছেলেদের বুকি ডিহরী অন শোনের কাছে ডালমিয়া
নগরে সিমেন্ট, চিনি আর কাগজের কারখানা দেখতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ।
ওর সতীর্থ বজুরা নিচ্চরই নানারকম নোট লিখে নিয়ে এসেছিল, পরীক্ষা
সমূহে পাড়ি অমানোর উদ্দেশ্যে । হয়তো কৌশিকও লিখেছিল, কিন্তু তাছাড়াও
সে ভারেরিতে লিখেছে :

“একেশ্বর সেনগুপ্ত আমাদের সমস্ত কারখানাটা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া
দেখাইলেন । চিনির কারখানা । রেলওয়ে ওয়াগনে করিয়া লক লক ইকুদও
আমিতেছে, বিরাট বহু, বৈভ্য ক্রমাগত সেই ওয়াগন ভর্তি ইকুদও একাও
মুখ-চ্যাবান করিয়া গলাধঃকরণ করিতেছে । তারপর কত ক্রিয়া, প্রক্রিয়া,

কত বহু-বহুবার পথ বাহিয়া সেই ইকুতলি শেষ পৰ্বত শুভ শৰ্করার বেশে
 সহস্র সহস্র বস্তার রূপান্তরিত হইয়া আবার ওরাগনে চড়িতেছে। হুই
 প্রান্তের মধ্যবর্তী অংশে কত রকমের বহু, কত কারুকা, কত কারিগরী।
 কোন বৈজ্ঞানিক কত অশক্তি, কি বৈশিষ্ট্য, কোথায় কি রাসায়নিক পদার্থের
 সংমিশ্রণে বর্ণবর্ণের শুভ কেমন করিয়া স্থায়ীমান ড্রামের সাহায্যে শুভ-
 শৰ্করার নবরূপ পরিগ্রহ করে তাহার বিস্তারিত বিবরণ ছিলেন। এমনিই
 হো হয়। লাল চেলিতে সর্বাঙ্গ মুড়িয়া উত্তিরবোবনা মববধু যখন তাহার
 সোনালী ঝপের সবটুকু মধু বুকের মধুভাঙে লুকাইয়া নৃতন সংসারে প্রবেশ
 করে তখন কি কেহ মনে রাখে তাহাকে এ সংসার ছাড়িয়া বেদিন বাইতে
 হইবে সেদিন সে বিগত বোবনা ; বৈধব্যের শুভ বেশে তখন তাহার সোনালী
 মাধুর্যের কোন চিহ্নই থাকিবেনা ? তখন তাহার গহনার গোপন বাসটি
 খুলিয়া দেখিও, হয়তো দেখিতে পাইবে প্রথম পর্বারের কিছু ধূসর প্রেমপত্র,
 হয়তো বা শূন্যগর্ভ একটি সেটের শিশি, কিবা প্রথম প্রণয়ের কিছু তুচ্ছ
 উপকরণ। চিনির কারখানার পাহাড়-প্রমাণ আখের ছিবড়ার অপেক্ষা তাহার
 মূল্য বেশী নহে। কিছু হুই, ইকু-শৰ্করার উপর আমি কবিতা লিখিব না।
 কারখানার বাতায়ানের পাথে অপর একটি দৃষ্ট আমার নজরে পড়িয়াছে।
 দেখিকে কেহই আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে নাই। আপনিই নজরে পড়িল।
 একটি কুলি বস্তী। বজহরদের পাশাপাশি করেকটি মাথা ভঁজিবার আত্মনা।
 ছোট ছোট খাপরা টালির ঘন বসতি। ধুলো আর কাদা, রাতার কুকুর
 আর উলঙ্গ শিশু—দড়ির চারপায়ে বিলম্বরত বুঝা, রাতার কলে পানীরজল
 আহরণকারীণীর দল—এ দৃষ্টই আমার মনে রেখাপাত করিয়াছে। তাহাদের
 কথাই লিখিয়া ফেলিলাম আমার কবিতার খাতার—“ওরা” :

“ভোরবেলা ছ’টা বাজে, বাজে তাই চিনি কল সিটি
 চমকি’ জাগিয়া ওঠে জেতে বাজে মিলের বস্তিটি।
 কলতলে জমে ভীড়, গালাগালি, বচসা অগ্নীল,
 ত্যানি ভেনে মাছি ওড়ে, বহু হাওয়া, জ্যাপনা বাতান,
 জ্যাটপটা গড়েতে আরও বেশ হয়েছে পড়িল।
 নিঃস্ব কুলি হুনিফতে বুকে চুপে চাপে দীর্ঘবাস।
 তবু প্রাতে উঠে ছোট্টে সর্বপ্রাণী বহু দৈত্যপানে
 বহু অঠরেতে মিলে তাম্রদূত আত্ম বলিদানে।

- কিরে আসে কর্মরাত্ত কর্মরাত গোখুলি বেলার
 প্রান্ততরু কুলিদল, খেনে বার চরণ-অলস,
 বুঝি সারা দিনমান বহু দৈত্য নিবিয়াছে হায়
 ইকুসাথে নরদেহ ! যিশে গেছে রক্ত-ইকুরস !
 তবু দেখি বাঁচিবারে চার ওরা—হাসে মিটে অতি
 গায় গান, কোঁকে বিড়ি, টানে মদ—ওরা হুটে মতি ॥”

এই সময়েও দেখছি কোশিক এই পঙ্খিল পরিবেশের ভিতর থেকে সুন্দরকে
 খুঁজে বেড়াচ্ছে। মানুষের প্রতি সে তখনও বিশ্বাস হারায়নি। সে তখনও
 জীবনরসের অভিসারী। ও বিলোম্বী হয়নি। কুলি ধাওড়ার অবক্ষয়ী চিত্র
 দর্শনে ওর মত কবির বেতাবে জলে ওঠা স্বাভাবিক ছিল, সেভাবে সে কিছু
 জলে ওঠেনি। পরিবেশটা তার পছন্দ হয়নি। কলতলার অশ্রু অচমায় সে
 বিকৃত বোধ করেছে, ভ্যাটপচা হুর্গকে নাকে কুমাল চাপা দিয়েছে, আখের স্বাদ
 বড় জোর তার কাছে নৈনতা লেগেছে। কিন্তু ঐ পর্বসুই ! সে প্রশ্ন তোলেনি,
 কেন এই অবক্ষয়, কেন এই নরক যন্ত্রণা ! নিঃসন্দেহে কবি কোশিক এখানে
 আমাকে হতাশ করেছে। তার চতুর্দশপদীতে সে ঐ স্পষ্টত সর্বহারী কুলিদলকে
 কোনও মুক্তির বাণী শোনাতে পারেনি—বাঁধন ছিঁড়ে তরিয়ে আসবার কোন
 ময় নেই তার বাণীতে ! ওর বাণী তখনও বিষের বাণী হয়ে ওঠেনি। নিঃস্ব কুলি
 হনিভূতে পাঁজরা-ওটা বুকে বেদনার পাহাড় বয়ে বেড়াচ্ছে এটাই যেন তার শেষ
 কথা। ও খুশী হয়েছে শুধু এইটুকু জেনে যে এ অবক্ষয়ের মধ্যেও তারা
 জীবনরসের রসিক। সপ্তাহান্তিক দিনমজুরীর টাকা কটা পচাইয়ের দোকানে
 ঢেলে দিয়ে ওরা নিঃস্বহাতে বস্তীতে ফিরে গিয়ে বৌ ঠ্যাঙার এটাও যেমন সত্য,
 তেমনি ওরা শীতের মধ্যরাত্র পর্বসুই আখের ছিবড়ের আগুন জ্বলে গোল হয়ে
 বসে খজুরী বাজিয়ে রামা হো করে এটাও তেমনি সত্য। ঐ অবক্ষয়ী
 পরিবেশেও ওরা জীবনকে অস্বীকার করতে চায় না—ওরা তবু বাঁচতে চায় !

কোশিক জানতে চায়নি, কেন এমন হল ! সে বলেনি, এমন হওয়ার
 কথা নয়। সে ওদের ভেঁকে বলতে পারেনি—এ জীবন নিয়ে তোমরা হুটেমতি
 হয়ে খেঁক না, এ তোমাদের স্বাভাবিক জীবন নয়—এ কৃত্রিমতা ধনতান্ত্রিক
 সমাজ ব্যবস্থার অবজ্ঞাবোধী অভিশাপ, তোমাদের স্বপ্নে জোর করে এটা চাপিয়ে
 দেওয়া হয়েছে। তোমরা হল বাঁধ, তোমরা বিদ্রোহ কর, তোমাদেরও আছে
 অমৃতের অধিকার।

না, এ সত্য তখনও অসুভব করেনি কৌশিক মিত্র ।

ধরা থাক রাজমিস্ত্রি নিয়ামৎ মিত্রার উপর লেখা তার কবিতাটা । সেটা আরও মাসছয়েক পরের রচনা । নিয়ামৎ-মিত্রার পূর্ণ পরিচয় সে জানায়নি । কোথায় কোন ওয়ার্ক-সাইটে সে নিয়ামৎ মিস্ত্রিকে দেখেছিল তার উল্লেখ নেই তার দিনপঞ্জিতে । শুধু ওর লেখা থেকে জানতে পারছি নিয়ামৎ মিস্ত্রির বাড়ি নদীয়ার মাঝদিয়া গ্রামে, ঘরে তার প্রাণিতভর্তক বিবিজ্ঞান আছে, এবং দেখছি নিয়ামৎ উঁচু দরের রাজমিস্ত্রি । কিন্তু এখানেও নিয়ামৎ মিস্ত্রির জীবনের ড্র্যাফ্‌টেডটাকে ও ঠিকমত দেখেনি বা দেখায়নি । আজকের দিনে এলুম-ওয়ার্কা রাজমিস্ত্রির একান্ত অভাব । ওজন আর পাটা মেলাতেই তারা গলদঘর্ম, গাণনির স্ট্রেট-জয়েন্ট এড়াতেই তাদের বিচ্ছেদ ত্বর । বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়ার মন্দির কিম্বা বাংলাদেশের দু-তিনশ বছর আগেকার যে কোন জমিদার বাড়ির কানিসে, খিজানে, স্তম্ভে যে ধরনের পোড়ামাটির কাজ, পথের কাজ, চুন-বালির কাজ দেখা যায় আজ তা আপনি তৈরী করতে পারবেন না তাজমহল তৈরীর খরচা স্বীকার করেও । কারণ সেই ধরনের এলুমদার মিস্ত্রিই পাবেন না । এই অবস্থার নিয়ামতের মত রাজমিস্ত্রি উপযুক্ত সম্মান কেন পাবে না এই প্রশ্ন কৌশিকের মনে জাগেনি ; এ প্রশ্নটা সে এড়িয়ে গেছে । রোমান্টিক কবি লিখেছে :

“রাজপুত্রেরা সব কোথা গেল এ দুগে ?
কলেঙ্কীয় যুবকেরা নেতে আছে হুজুগে ।
কোথা পাই কাব্যের নারকটি জুঁসই ?
নিয়ামৎ হবে কি এ কাব্যের উঁসই ?
নিয়ামৎ ? লুজিধারী, ছাঁটাদাড়ি, মুখ্য,
মেচেতার ভরা গাল, চুলগুলো কক্ক ।
ভরদিন খেটে এসে দম দিয়ে গাঁজাতে
বসে আছে উবু হয়ে ইটখোলা পাঁজাতে ।
নিয়ামৎ মিস্ত্রি, মেট সেই রাজদের,
বাড়ি তার নদীয়ার, কোন গাঁয় মাঝদে'র ।
হাজারির খাতাখানা জেব থেকে করে বের
মেলে দেয় ইতিহাস মজুরের ভাগ্যের ॥

নিয়ামৎ ! তোকে নিয়ে কি যে লিখি কাব্যের ছন্দে
 সূত ছাড়ে কাছে গেলে ঘর্ম ও রক্তনের গন্ধে ।
 গাঁজাগোর লম্পট কোন গুণ নাই যার
 তাকে নিয়ে শেষকালে কাব্যের কারবার ?
 কোথা কোন মজুরের গা-ফেলতি কাজেতে
 কোথা চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামিনে ও রাজেতে
 ঠিক ধরা পড়ে যাবে নিয়ামৎ নজরে
 উঠেই নিয়ামৎ চিহ্নিয়ে সজোরে ।
 হতভাগা নিয়ামৎ ! নোংরার সত্রাট !
 শেষকালে তোকে ধরে কাব্যের ফাইন-আর্ট ?
 তবু ঐ নিয়ামতে আজি মোর কাব্যতে করিয়াছি আশ্রয়,
 নিয়ামৎ ! তারা পরে উবু হয়ে প্রাণ ভরে আজ তুমি গাও গান ।
 শুই গান কাটফাটা রক্তুরে জিনেছে
 রক্ত ও ঘর্মের ইতিহাস চিনেছে,
 ও গানের রেশ ধরে ভেসে তোর মন যায়
 ছায়া ঘেরা সুশীতল মাঝদের কোন গায়,
 ও গানেতে স্বর নাই আছে স্বর মরমীর
 শ্রম-হীন প্রবাসেতে দিল আছে দরদীর ।
 তরদিন কুলিদের করে কাঁচা গিস্তি
 কলিক কোনা দিবে কী করিস্ স্রষ্টি !
 মন্দির খিলানেতে তোর পূজা অর্ঘ্য
 যুগ যুগে রচে দেখি শিল্পের স্বর্গ !
 সুরভাষা গান তোর প্রাণ পেয়ে ওঠে
 পঙ্কের মান্যখানে ফুল হয়ে ফোটে
 চেয়ে চেয়ে দেখে যারা কেউ তোরে জানেনা ।
 ছনিয়ার কেউ তোরে কবি বলে মানেনা ।
 চুকে যাবে তোর দাম মজুরিটি মিটিয়েই
 ফুলে যাবে তোর নাম ওরা প্রেম ছুঁতিনেই ।
 তবু তুই গাঁথনিতে গান তোর রেখে যাস
 পলতোলা পথেতে কাব্যটি এঁকে যাস ।

নিয়ামৎ ! শেলী তুই, লিয়োনার্দো, তুই আজ দাস্তে
শাহত বাণী তোর এঁকে যান কণিক প্রাস্তে ॥”

বেশ বোঝা যায় রোমাণ্টিসিজমের কুশাশায় দৃষ্টি তার তখনও আচ্ছন্ন।
নিয়ামতের প্রতি সমাজের যে উপেক্ষা, নিয়ামতের জীবনের যে ট্রাজেডি তার
জ্ঞপ্ত কবি কিন্তু বিফল নন। চিনিকলের কুলি ধাওড়ায় যে কথা ঘোষণা করা
হয়নি সে কথাটা তিনি নিয়ামতের কণ্ঠস্বরে নিবেদন করতে পারলেন না।
কৌশিক এখনও এস্কেপিষ্ট—রোমাণ্টিক চিন্তাধারায় সে মোহগ্রস্ত, বিভ্রান্ত,
দিশাহারা। নিয়ামৎ মিস্ট্রিকে সে শেলী-লিয়োনার্দো-দাস্তের পর্যায়ে তুলতে
চেয়েছে, দু-বেলা ভরপেট খেতে পাওয়া খাণ্ডাবিক পথায় নর। পাতাল থেকে
নিয়ামৎকে ওঠাতে ইচ্ছা ছিল তার কিন্তু বড় বেশী ইচ্ছা টান হয়ে গেল
যেন। নিয়ামৎ সে আকস্মিক একজন এলমদার কারিগরের বাঙালীর স্বচ্ছন্দ-
জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়নি, যেমন হতে পারত ঐ ধরনের একজন-শিল্পী রাশিয়ায়,
আমেরিকায়, জাপানে এমন কি চীনে—ইচ্ছা টানে সে একেবারে উঠে গেছে
কবি-কৌশিকের পরিকল্পিত ইউটোপিয়ান বর্গলোকে।

॥ পঁচ ॥

শহরের শেষ প্রান্তে রেললাইনের ধারে আগরওয়ালের কারখানাটা মাত্র
বিষে দশেক জমির উপর। চারিদিক উঁচু-পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। ইটের
পাঁচিল নয়—ছাই ছাই নীলচে রঙের সিঙার ব্রকের দেওয়াল। ছাই বা বেস
বালি আর সিমেন্ট জমিয়ে তৈরী হয় ঐ ফাঁপা-ইট,—হলো ব্রক অথবা সিঙার
ব্রক। আগরওয়ালের এটা কারখানা নয়, আসলে এটা ছিল সিমেন্ট আর
লোহার গুদাম। পাশাপাশি অনেকগুলো গুদাম ঘর—টিনের ছাউনি। তাতে
থাক দেওয়া সিমেন্টের বোরা। এখানকার ফাঁকা জায়গাটার সম্প্রতি নতুন
ধরনের হলো-ব্রক তৈরী করার আয়োজন করেছেন আগরওয়াল। এর
নাম নাকি চ্যাটার্জী-ব্রক। হলো ব্রক তো অনেকেই তৈরী করে, কিন্তু আগর-
ওয়াল সাহেব এমন একটি রাসায়নিক পদার্থ এমন প্রক্রিয়ার যোগ করেন যে
প্রয়োজনীয় সিমেন্টের অর্ধেক বাদ দেওয়া সত্ত্বেও ব্রকের তাগদ সমানই রয়ে
যায়। এটাই তাঁর আবিষ্কার, এইটাই তাঁর বিন্মেন সিক্রেট। না,

ঠিক তাঁর আবিষ্কার নয়, তাহলে তিনি স্বনামে এটার পেটেন্ট নিতেন। এর নাম 'চ্যাটার্জী-ব্লক' না হয়ে হত 'আগরওয়াল ব্লক'। এর আবিষ্কারকর্তা যিনি তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে পরিস্থিতিটা কিছু জটিল হয়ে পড়েছে। এখনও তাই পেটেন্ট নেওয়া হয়নি। এই ক্ষুণ্ণই এ-ব্যবসার গোপনীয়তা সম্বন্ধে আগরওয়াল দ্বিগুণ সাবধান। প্রণালীটা আবিষ্কার করেছিলেন একজন পাগল এতিনিয়ার—ডক্টর সদাশিব চট্টোপাধ্যায়। স্বজাতার স্বর্গগত পিতৃদেব। সর্বস্ব খুঁটয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত সিদ্ধিলাভ করেছিলেন তাঁর সাধনায়। সাধারণ ছাইয়ের সঙ্গে, কারখানার পোড়াছাই বা স্রাগের সঙ্গে কোন বিশেষ রাসায়নিক পদার্থ বিশেষভাবে মিশিয়ে তিনি ঐ ছাইয়ের মধ্যে আমদানি করেছিলেন জোড়া-লাগানোর গুণ, যাকে বলে সিমেন্টেশন ফ্যাকটর! ল্যাবরেটরীতে এমন জাতের সিগার-ব্লক তৈরী করলেন ডক্টর চ্যাটার্জি যাতে সিমেন্টের ভাগ দেওয়া হল শতকরা পঞ্চাশভাগ কম, অথচ যার ক্রাশিং-স্ট্রেন্থ, স্ট্রাকচার-স্ট্রেন্থ, সাদা বাঙলায় যার ভারবাহী ক্ষমতা হল সাধারণ টুটের চেয়ে বেশি। যুগান্তকারী আবিষ্কার বলা যেতে পারে একে, কারণ বটের বিকল্প হিসাবে গৃহনির্মাণ-ক্ষেত্রে এ আবিষ্কার বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারে। তারপর সমস্তা চাড়ালা ফিন্যান্সিয়ার জোগাড় করা। ইচ্ছে করলে এই অবস্থায় তিনি স্বনামে এটার পেটেন্ট নিতে পারতেন, কিন্তু তা তিনি নেন নি, হয়ে ওঠেনি। ল্যাবরেটরীতে যা সস্তা হয়েছে ব্যাপকভাবে সেটা আরও কত ফলপ্রসূ হবে তাই প্রথমে দেখতে চাইলেন তিনি। কিছু নগদ টাকা চাড়া আর আগর হতে পারছিলেন না। দ্বারে দ্বারে সেদিন তাঁকে ফিরতে হয়েছিল পাগলের মত। কেউ বিশ্বাস করেনি, কেউ হাত বাড়িয়ে নিতে চায়নি এই গুণবানের ভাড়াবের চাবি। এই অবস্থায় তিনি ময়ূরকেতনের সঙ্গে পরিচিত হলেন। দুজনেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন, একেবারে মণিহাফন যোগ। কিন্তু বিধাতা বাম। পেটেন্ট নেওয়ার আগেই একেবারে হঠাৎ হাটফেল করে মারা গেলেন বৈজ্ঞানিক। একমাত্র সান্তনা, তাঁর আবিষ্কারের মূলমন্ত্রটা তিনি মুখে মুখে জানিয়ে গিয়েছিলেন আগরওয়ালকে। সবটা নয়, আংশিক তথ্য। তা সেইটুর সাহায্যেই অবৈজ্ঞানিক আগরওয়াল তৈরী করতে পেরেছে জিনিসটা। কি করে কি হয় তা সে জানেনা, তবে হাতে-কলমে জিনিসটা তৈরী করেই সে ছোটখাট একটা কারখানা খুলে বসেছে এই শুধারের চৌহদ্দির মধ্যেই। আগরওয়ালের ইচ্ছা পেটেন্ট নেওয়া হচ্ছে

গেলে ব্যাপকভাবে সে চ্যাটার্জি-ব্লক তৈরীর কারখানা বানাবে। এখানে নয়, কলকাতার কাছেপিঠে। বাজার তো কলকাতার। এখানে অত্যন্ত ছোট ব্যবস্থাপনায় ওটা পরীক্ষা করে দেখছেন মাত্র। তবু এ থেকে যা লাভ হচ্ছে তার শতকরা উনপঞ্চাশভাগ স্বজাতার নামে জমা রাখছেন তিনি, যদিও কোন লিখিত চুক্তিনামা হয়নি। এটুকু মন্থকেতনের নিছক বদাম্বিতা। হাজার হোক স্বজাতাই এ আবিষ্কারের উত্তরাধিকারী।

উঁচু-পাঁচিল দিয়ে ঘেরা কম্পাউণ্ড। দুটি গেট, প্রবেশ ও প্রস্থানের। গেটদুটিকে যুক্ত করেছে অর্ধবৃত্তের আকারে লাল কঁকরের একটা রাস্তা, যার কেন্দ্রস্থলে দারোয়ানের গুমটি। গেট দিয়ে ঢুকেই প্রধান অফিস। এটা পাকাবাড়ি। বাইরের লোক এই অফিস পর্যন্তই আসতে পারে। হলো-ব্লকের অভ্যন্তর যদি দিতে চান কিম্বা যদি করোগেট টিন বা সিমেন্টের হোলসেল কেনা-বেচার সম্বন্ধে কিছু কথাবার্তা বলতে চান তাহলে ঐ অফিসে গিয়ে আপনাকে কারবার করতে হবে। হলো-ব্লক কারখানা খোলার আগে থেকেই এই অফিস ঘরটা ছিল; হোলসেল ডীলার-শিপের কারবারের প্রয়োজনে। বিশ বছর ধরে এ জেলার সিমেন্ট, করোগেটেড টিন ও লোহার হোলসেল ডীলার হচ্ছেন মন্থকেতন। ফ্যাকটরী থেকে বাণ্ডিল বাণ্ডিল টিন আসে, হাজার হাজার বস্তা সিমেন্ট আসে। জেলার বিভিন্ন পাইকারী ব্যবসায়ীরা নিয়ে যায়। অফিস পর্যন্ত যেতেই বাইরের লোকের আনাগোনা ঠেকানো যাবেনা, তাই অফিসের পিছনে আবার একটা কাঁটাতারের বেড়া। সেখানেও বসে থাকে বন্ধুধারী দারোয়ান। কাঁটাতারের ভিতরের অংশে বড় বড় এ্যাসবেস্টসের শেড। সিমেন্ট ও লোহার গুদাম। তার পিছনে হলো-ব্লক তৈরীকারীর আয়োজন। ক্রমাগত লরী আসছে আর যাচ্ছে। দারোয়ান তার খাতায় টুক রাখছে লরির নম্বর, চালানের বিবরণ। সিমেন্ট আসছে, লোহা আসছে, টিন আসছে—যাচ্ছেও বেরিয়ে ক্রমাগত। আবার অন্য লরিতে আসছে সিঙার বা খেঁদ, আর বালি। চ্যাটার্জি-ব্লক তৈরীর প্রয়োজনে আগে মাটিও আসত, আজকাল আর আসেনা। কারখানার ভিতরেই একটি বড় পুকুর খোঁড়া হচ্ছে। এতে জল-সরবরাহের সমস্যাটাও আংশিক মিটেবে এবং পুকুরকাটা উদ্ভূত মাটিটাও ফেলা যাচ্ছে না। একদল লোক বড় বড় ঢেলাগুলি ভাঙছে, গুঁড়ো করছে, চালুনিতে ছাঁকছে; চ্যাটার্জি-ব্লক তৈরীর কাজে মাটিরও প্রয়োজন।

সিগেট ৬ লোহার স্টিকিট হিসাবে যেসব কর্মচারী এখানে কাজ করে তাদের সঙ্গে চ্যাটার্জি-ব্লক তৈরীর কারবারের সম্পর্ক নেই। তারা বস্তুত ঐ কাটাতারের ঘেরা অংশটার ঘেতেই পারেনা। পাছে এই নতুন ধরণের হলে-ব্লক তৈরীর কোশলটা জানাজানি হয়ে যায় তাই আগরওয়াল এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান। ঐ হলে-ব্লক দ্বারা তৈরী করে তারা আবাসিক। পারত-পক্ষে তারা কারখানার বাইরেই যায় না, যেতে দেওয়া হয় না। তারা মাস্তাখীকুলি। এ দেশের ভাষাই বোঝে না তারা। সব বাইরে থেকে আনদানী করেছেন ময়ুরকেতন। ওদের দলপতি ইন্দির সর্দার শুধু ভাড়া ভাড়া হিন্দি বলে পয়সা। দীর্ঘদিন সে আছে আগরওয়ালের সঙ্গে। অত্যন্ত বিখ্যাত। লোকটার আরও দুটি গুণ আছে, কথা বলে অত্যন্ত কম এবং আমিষ ভাষায় সে শিকহুত। লোকটা গোগানীক্ষ। পুকুরের পশ্চিমপাড়ে সারি সারি কতকগুলো খাপরার ছাউনি। দাক্ষিণাত্যের কুলিরা ওখানেই সপরিবারে বাস করে। বেশী নয়, সংখ্যায় ওরা আট-দশঘর। ইন্দির সর্দারের অবস্থা পরিবার নেই; বিপন্নীত সে। একটি দশবারো বছরের ছেলেকে নিয়ে থাকে। এই চ্যাটার্জি ব্লক খিনি তৈরী করেছিলেন সেই চ্যাটার্জি সাংগব তো দুনিয়ার মায়া কাটিয়েছেন—এ কুট-কোশলটা আগরওয়াল ছাড়া যদি কেউ কিছু জানে ত ঐ ইন্দির সর্দার। ঐ নিরক্ষর লোকটার সাহায্যে ময়ুরকেতন টিকিষে বেখেছেন কারবারটা। বেশী নয়, দৈনিক হাজার-বাবশো' হলো-ব্লক তৈরী হচ্ছে এখন। যা কিছু হিসাব রাখে ঐ ইন্দির-সর্দার। অদ্বুত স্বতিশক্তি লোকটার। পাই পরসার হিসাব মুখস্থ রাখে। দিনান্তে এসে মুখে মুখে বলে যায় নকুল মানে আরকে। নকুল কথামত হিসাবটা টুকে রাখে। দু-তিন সপ্তাহ পরে পরে ময়ুরকেতন যখন আসেন, সেই হিসাবের উপর চোখ বুলিয়ে যান। এমন প্রচণ্ড-ব্যস্ত মানুষটা এই সামান্ত কয়েক হাজার টাকার লেন-দেনের জন্য অন্য কোন করণিক নিয়োগ করেন নি।

কাটাতারের বেড়া দেওয়া অংশটার একটা বিকল বাড়ি। পুরনো বাড়ি, উনি এই বাড়ি সমেত জমিটা কিনেছিলেন, তারপর বাড়িটা ইচ্ছামত মেরামত করে নিয়েছেন। গ্যারেজ ও মেজানাইন বানিয়ে নিয়েছেন। একতলার হলো-ব্লকের জন্য ছোট্ট দু-কামরার অফিস। ঐ ছোট ঘরের প্রথমটি আবার পাটিসান দিয়ে ভাগ করা। একটা অংশ ভালাবদ্ধ থাকে। আগরওয়াল মাসান্তে যখন আসেন তখন বসেন সেটার। এয়ার-কন্ডিশান করা অংশের

অন্তর্ভুক্ত ; সেটা স্বজাতার জন্ত নির্দিষ্ট । দ্বিতীয় ঘরে খানকুই টেবিল পাতা । একটার কেউ বসেনা, দ্বিতীয় টেবিলে বসেন নকুল গুঁই, ম্যানেজার । দ্বিতল ও দুখানি ঘর, বাথরুম । এখানেই থাকে স্বজাতা, একটি তার বসার ঘর অপরটি শয়নকক্ষ । স্বজাতার এই অফিসে খিদমত করার জন্ত আছে বনোয়ারিলাল ; পিয়ন কাম আদালী ।

বিজ্ঞান ডাইভারকে যেদিন নিয়োগ করা হল সেদিন অভিমানস্বরা স্বজাতা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার পরেই কফির ট্রে নিয়ে ঘরে এল বনোয়ারিলাল । আগরওয়াল সাহেব এখানে থাকলে এ-সময় এককাপ কফি পান করে থাকেন । প্রথমত দুটি কাপই ট্রে-তে সাজিয়ে নিয়ে এসেছিল বনোয়ারিলাল । সে জানে মেয়সাহেবও এসময় এঘরে এসে এককাপ কফি পান করে থাকেন । কিন্তু আজ আর তা হ'লনা । পাইপে টোবাকো ভরতে ভরতে আগরওয়াল বলেন, আমার জন্ত এককাপ রেখে ট্রেটা ও ঘরে নিয়ে যা বরং, আর ইন্দিয়নে একবার ডেকে দে ।

বনোয়ারিলাল ট্রে নিয়ে চলে যেতেই আগরওয়াল এনগেজমেন্ট প্যাডটার উপর একনজর চোখ বুলিয়ে নেন । দশটার সময় জীমূতবাহন মহাপাত্রের সঙ্গে দেখা করার কথা । বেলা দুটোর সময় ডিক্টো মিল-অনার্স অ্যাসোসিয়েশানের কার্য নির্বাহক সমিতির জরুরী মিটিং । বেলা তিনটায় জেলা স্পোর্টস-কমিটির মিটিং আছে জেলা-বোর্ড অফিসে । সন্ধ্যা-সাতটার ঘরে লেখা আছে শুধু একটি অক্ষর 'এস' । সেটা কেটে দিলেন । স্বজাতার সঙ্গে আজকের সন্ধ্যা-আসরে কোন বৈত-সঙ্গীত গাওয়া সম্ভবপর হবেনা, স্থর কেটে গেছে । তাছাড়া স্বতোয় একটু টিস দিয়ে দেখতে চান এবার, কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায় । অনেক করেছেন তিনি স্বজাতার জন্ত, অনেক করতে প্রস্তুতও ছিলেন—কিন্তু স্বজাতা বোধকরি গুর সঙ্গে টেকা দিতে চাইছে । ডক্টর চ্যাটার্জির রিসার্চ-রিপোর্টটা সে দেখতে দেয়নি ময়ূরকেশবকে, অবশ্য সরাসরি দেখতে তিনি চানও নি । প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ভয়েই । শুধু তাই নয়, সম্প্রতি গুর সন্দেহ জেগেছে স্বজাতা ভলে ভলে জীমূতবাহনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার চেষ্টা করছে । কী ভাবে ঐ ঘরেটা ? আগরওয়ালের চোখে ধুলো দেবার কষতা সে রাখে ? ময়ূরকেশব আগরওয়ালকে ও চেনেনি এখনও ।

বাক ও কথা । রাত দশটার ট্রেনে তিনি কলকাতা যাচ্ছেন, এনগেজমেন্ট

প্যাডের তাই নির্দেশ। কাল সমস্ত দিন ক'লকাতার কর্মব্যস্ত প্রোগ্রাম। তার মধ্যে বেলা এগারোটায় একটা গুরুত্বপূর্ণ গোপন আলোচনা আছে। মোটামুটি এনগেজমেন্ট প্যাডের উপর চোখ বুলিয়ে সেটা বন্ধ করে রাখেন; টেনে নেন কফির কাপটা। বাঁ হাতে টেলিফোনটা তুলে নিয়ে একটা নাখার ভায়াল করতে থাকেন।

ও গ্রান্ড থেক ডেসে এলো : আলি বলছি।

: আগরওয়াল। কালকের এ্যাপয়েন্টমেন্টটা মনে আছে তো ডক্টর আলি?

: আলবাৎ! দুশ এগারো নম্বর স্ট্রিট, বেলা এগারোটায়।

. একলা আসবেন কিন্তু—

: বলা বাহুল্য। কিন্তু আজ একবার সময় করে এখানেই দেখা করতে পারেন না?

: কী দরকার? এক রাতের তো মামলা। কালকেই দেখা হবে!

: এক রাত্রে একটা রাজ্য হাত বদল হয়ে যায় আগরওয়াল সাহেব!

আগরওয়াল বলেন : স্থান কাল আর পাত্র। তা পাত্র গররাজি নয়, সময়ও করা যায়—কিন্তু স্থানটা যে অনুমোদন যোগ্য নয়। দেওয়ালেরও কান আছে, জানেন নিশ্চয়। স্ততরাং—

: ও আচ্ছা, আচ্ছা। বেশ, কালই কথা হবে।

টেলিফোনটা নামিয়ে রাখেন আগরওয়াল। ঘড়িটা দেখে নেন একবার। সওয়া নয়টা। এখনও সময় আছে হাতে। ডেকে পাঠালেন ইন্দির সর্দারকে। আহ্বানমাত্র লোকটা এসে দাঁড়ায় সেলাম করে।

: সব ঠিক আছে? টাকা চাই?

: জী হাঁ। নেহি, রূপেরা আভি হয়!

: আচ্ছা যাও তুমি।

লোকটা তবু ইতস্তত করছে দেখে বলেন, আর কিছু বলবে?

লোকটা এখন তার বিচিত্র ভাড়া হিন্দিতে যা নিবেদন করে তার অর্থ, আপনি আজ একজন ড্রাইভারকে চাকরি দিয়েছেন স্যার, তা ড্রাইভারের জরুরং আছে আমাকে কেন বললেন না, আমার ভাইপো বসে আছে, বিখালী লোক—

আগরওয়াল হেসে বলেন, তোমার ভাইপোর মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে? কই বলনি তো তুমি?

: আজ্ঞে না, এ সে নয়, এ আমার আর এক ভাইপো। এ আমাদের সঙ্গে ওসব কারবারে কোন দিন ছিল না। পাঁচ বছরের লাইসেন্স।

: বেশ, তোমার ভাইপোকে আসতে লিখে দাও। তাকেও চাকরি দেব আমি। সে আমার গাড়িটা চালাবে। এ চালাবে ফিরাটখানা। বাই হোক, লোকটা বেগানা আনুজান আদমি, একটু নজরে রেখ।

ইন্দির সর্দার হাসলে। কালো মাগুঘটার মুখে ঝকঝকে একসার দাঁত কিন্তু সুন্দর দেখালো না, কেমন যেন দীভংস মনে হল। সেলাম করে বেরিয়ে গেল লোকটা।

আগরওয়ালও বেরিয়ে পড়েন। না, বিত্ত ড্রাইভারকে ডাকেন না। নিজেই ড্রাইভ করে বেরিয়ে যান। দারওয়ান হাট করে খুলে দেয় গেটটা। বাকের মুখে নজরে পড়ে দ্বিতলের ক্যান্টিলিন্ডার বারান্দায় চূপ করে দাঁড়িয়ে আছে সুজাতা। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে এদিকেই।

জীমুতবাহনের কর্নফেল্ড কলকাতায়; কিন্তু দেশের বাড়িতে তাঁর নিজস্ব একটা অফিস আছে। নিজের কম্পিউটারে এলে এখানে বসেই পাঁচঘন্টার সঙ্গে দেখাশোনা কথাবার্তা বলেন। একজন অতি বিশ্বস্ত স্টেনো-কাম শ্রবণ সচিব আছে তাঁর, সেই শুধু 'শ্রাব' বলে। বাদবাকি সবাইই তিনি 'জীমুতদা'। প্রাক-স্বাধীনতা-যুগ থেকেই এই দাদা ভাইয়ের সম্পর্কটা চলে আসছে। ঠুঁর এই দেশ জোড়া ভাইয়েরা চারবছর ধরে ঠুঁকে দোহন করবার চেষ্টা করে এবং বিনিময়ে পঞ্চম বছর উনি তাদের নির্দিষ্ট ছাপমারা একখানি ভোট পত্র প্রার্থনা করেন। তাঁরা ঠুঁর নির্বাচন-যুদ্ধের হাতিয়ার। ছাত্রনেতা, যুগ্ম-নেতা, পঞ্চায়েতের মোড়ল থেকে রকবাজ বেকার, মায় নামকরা গুণ্ডা-দলের সর্দার পর্যন্ত সে হিসাবে ঠুঁর ছোটভাই; উনি সবাইই জীমুতদা!

এই বিরাট বাহ ভেদ করে খাসকামরার পৌছাতে আগরওয়ালকে কিন্তু কোন বেগ পেতে হলনা। তিনি হাজির হতেই অস্বস্তি সবাইকে নানা অজুহাতে জীমুতবাহন বিদায় করে দিলেন। তারপর সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে বলেন: বলুন এবার, আপনার কি খবর?

: খবর তো শ্রাব আমার দিকে ঠিকই আছে। কী হকুম আছে বলুন?

জীমুতবাহন সিগারকেসটি বাড়িয়ে ধরে বলেন, হকুম চালাবার জন্য অন্য লোক আছে। আপনাকে তো আমি কোন নির্দেশ দেবনা, বরক আপনার

নির্দেশ মানব। আপনাদের স্বার্থে ই কাজ করি, বলুন আমরা কি করতে হবে ?

: আমার এলাকা সম্বন্ধে আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না।

: আপনাদের মিল ওনার্স এ্যাসোসিয়েসানের মিটিং তো আজকেই, নয় ?

: হ্যাঁ, তবে তা নিয়ে আপনার চিন্তা নেই। ময়ূরকেতন আগরওয়াল এখনও ও এ্যাসোসিয়েসানের ডিক্টেটর। সে যেদিকে খুঁকবে গোটা কয়ানিটি সেট দিকেই খুঁকবে। মিল-মালিকদের সলিড সাপোর্ট সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

: থ্যাঙ্ক ! আচ্ছা শুনছি আলিসা হেব শনিবার বিকালে কাছারী ময়দানে মিটিং করছে ? কলকাতা থেকে ওদের টাইরা নাকি সব আসছেন ?

: তা আসুন ! মিটিংয়ে লোক হবে না। কারণ ঐ শনিবারেই বিকালে আমি কলেজ মাঠে ফাইনাল খেলাটা ফেলেছি। ওদের মিটিং-এর টাইম বিকাল চারটের, আমার খেলাও শুরু হচ্ছে বিকাল চারটের। মিটিং ভেঙ্গে সব লোক খেলা দেখতে দৌড়াবে। কাছারীমাঠ আর কলেজমাঠ তো পাশাপাশি।

উৎসাহিত হয়ে কঠেন জীমূতবাহন : তাই নাকি ? শনিবার ঐ সময়েই ফাইনাল খেলা ফেলেছেন ? তা আপনিই তো ডিক্টেটর এ্যাসোসিয়েসানের প্রেসিডেন্ট ! এ বুদ্ধিটা কিন্তু জবর খাটিয়েছেন। কোন কাউন্টার প্রোপাগান্ডার ব্যবস্থা নেই। বিনা-টিকিটের ফাইনাল খেলা ছেড়ে কে আর 'নইলে গদি ছাড়তে হবে'-র প্রোগান শুনতে আসবে ? কফি বলি একটু ?

: কফি ? তার চেয়ে বীয়ার কিছু ক্ষমত ভাল।

: কেন আর লজ্জা দেন মিঃ আগরওয়াল ? অপিসে ওসব বন্দোবস্ত যে থাকেনা সে তো আপনি জানেনই। বীয়ার কেন, ভাল মার্টিনী আনিয়েছি কিছু। খানদানী করেন মাল। আসুন না সজ্জা বেলায়—

: কোথায় ? আপনার বাড়িতে ?

: আরে না, না, বাড়িতে নয়। কৌশল্যাদেবীর ওখানে—

আগরওয়াল হেসে বলেন, ধন্যবাদ, না আজ আর সে সম্মুখে ভাগ বসানো চলবেনা। রাতের গাড়িতেই কলকাতা যেতে হবে। কিন্তু অধ্যমকে তলব করেছিলেন কেন, সে কথাটা তো বললেন না ?

: না না, তলব নয়—এই একটু খবরা খবর নিতে। আপনার ভ্রাতার কোর ঠিকমত যাবলাইকত হচ্ছে তো ? টাকা পরসার ব্যবস্থা থাকলে—

রাধা দ্বিগ্নে ময়ূরকেতন বলেন, এটা কি রকম কথা হল স্তার ? আপনি কি এয়ার প্রথম ইলেকসানে দাঁড়াচ্ছেন ? টাকার জন্তু কবে আপনার কাজ থেকে থেকেছে ।

জীমূতবাহন হেঁ-হেঁ হাসি হাসেন : আপনার কাছে অবশ্য আমার কোন সঙ্কোচ নেই—

: সঙ্কোচ ! বিলক্ষণ ; আমি কি বিনা স্বার্থে কাজ করছি ? আমি কি জানিনা যে আপনারা গদিতে বসে থাকলেই আমরা শাস্তিতে ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারব । আর আলিসাহেবের দল গদিতে চড়ে বসলে সব তছনছ হয়ে যাবে ।

: ভালকথা আপনার ড্রাইভার কাজে লেগেছে তো ?

আগরওয়াল তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন বদলে বলেন, হ্যাঁ, তাকে আজই বহাল করেছি । ফিরাট গাড়িটা চালাচ্ছে । তা গাড়িসমেত ওকে ক’দিনের জন্তু আপনার কাছেই পাঠিয়ে দেব । এখানেই থাটুক, যানে ইলেকসান পার্পাসে—

: সের্কি ! ও আপনার গাড়ি চালাচ্ছে না ?

: আপনাকে আগে বলিনি । বস্তুতপক্ষে আপনার লোক আমার আগেই আমি আমার গাড়ির জন্তু অন্য একজনকে চাকরিতে নিরেছি ! যানে আরকি উপরোধে পড়ে ।

জীমূতবাহন অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে আগরওয়ালকে একবার বাচাই করে নেন । তারপর বলেন, না, না, গাড়ির আমার প্রয়োজন নেই । ও স্ত্রীজাতার গাড়িটাই চালাক বরং । বাপ মারা যাবার পর মেয়েটা বড় মনমরা হয়ে পড়েছে—

হুজনেই কিছুটা চূপচাপ । তারপর জীমূতবাহন বেন হঠাৎ মনে পড়ে যাবার ভিত্তিতে বলে ওঠেন, ভাল কথা, সুনাম রেলওয়ের অর্ডারটা আপনি প্রত্যাখ্যান করেছেন ? সত্যি নাকি ?

আগরওয়াল সিগারটাকে নিপুণভাবে কাটার দ্বিগ্নে কাটতে কাটতে বলেন, হ্যাঁ, অতবড় অর্ডার এখন আমি নেব কেমন করে ? এখন বা প্রডাকশান হচ্ছে তাতে অতবড় অর্ডার ধরবার মত আমাদের সামর্থ্য নেই ।

জীমূতবাহন বিশ্বপ্রকাশ করে বলেন, কী বলছেন মশাই ! লোক বাড়ালেই তো প্রডাকশান বেড়ে যাবে । আপনি মাত্র আট-দশ জন লোক লাগিয়ে ছেলে খেলা করছেন । বেড়াল দ্বিগ্নে লালচ চাব হয় ?

অনেকটা ধোঁয়া ছেড়ে আগরওয়াল বলেন, সুজাতা টেলিফোন করেছিল
বুঝি ?

চম্কে ওঠেন জীমুতবাহন, আরে না না, সুজাতা কেন বলবে ? আমি
নিজে চোখেই তো সেদিন আপনার কারখানা দেখে এলাম। মনে নেই ?

আগরওয়াল সোজা হয়ে বলেন, দেখুন স্যার, লোক বাড়ালেই
যে প্রডাকশন বাড়বে এই সামান্য কথাটা আমার মত ব্যবসায়ীকে যুক্তি দিয়ে
বোঝাবার দরকার নেই। কিন্তু আজ্ঞে বাজ্ঞে লোক দিয়ে তো আমার
কাজ হবে না। পেটেন্টটা যতদিন না নিতে পারছি ততদিন কারবারে
কোন বিভীষণ ঢোকাতে চাই না। আপনি তো সবই জানেন—

: না, আগরওয়াল সাহেব, সবটা জানিনা আমি ! পেটেন্ট নিতেই
বা দেয়া করছেন কেন ? সুজাতা তো এখন আপনার কথায় ওঠে বসে।
আপনি বিচক্ষণ ব্যবসায়ী, আমার পরামর্শ দিতে যাওয়া বাহ্যিক মাত্র, কিন্তু
মাপ করবেন মিঃ আগরওয়াল, আপনার পলিসিটা আমার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে
চুকছে না। সোনার খনি আবিষ্কার করেছেন আপনি, আর গনিগর্তে
এক্সকাভেটর নামাতে ভয় পাচ্ছেন ?

মগ্নরূপে প্রত্যুত্তর করেন না। মিটিমিটি হাসতে থাকেন।

কিন্তু তবু জীমুতবাহন এ প্রশ্নে ছেদ টানতে রাজি হন না, বলেন,
না, না মিষ্টার আগরওয়াল, এভাবে হেসে এড়িয়ে যেতে দেবনা আপনাকে।
এত বড় আবিষ্কারটাকে ঠিকমত কাজে লাগাচ্ছেন না কেন, তা আপনাকে
বলতে হবে। উৎপাদন তো ইচ্ছা করলেই দু-চার-দশগুণ বাড়াতে পারেন
আপনি। আপনার ঐ চ্যাটার্জি রকের যা প্রডাকশন কন্সট আসছে তাতে
তো এতদিনে এগিনিয়ারিং শিল্পে একটা বিপ্লব হয়ে যাওয়ার কথা। টাকার
অভাব আপনার নেই, জমিও রয়েছে, কাঁচা-মালের ঘাটতি নেই, অথচ—

আগরওয়াল ঠেকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, আপনাকে খুঁজেই বলি। দু-
পাঁচ দশ লাখ টাকা এল কি এল না সেটা বড় কথা নয়; কিন্তু আকাশের
দিকে তাকিয়ে দেখেছেন স্যার ? কী প্রচণ্ড ঝড় আসছে ? আমার মত
ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের কি এখন এসব দিকে নজর দেবার সময় ? দেশের
অবস্থাটা বুঝতে পারছেন না ? ঐ আলি-সাহেবকে সমস্ত বিক্রয় দলগুলি
একযোগে সাপোর্ট করছে। গতবার আপনারদের ত্রিকোণ বন্ধ হয়েছিল—
ওদের অনেক ভোট ভাগাভাগি হয়ে গিয়েছিল। এবার আপনারদের স্টেট

ফাইট। আপনি যদি রিটার্নড না হন, স্টেব্ল্ গভর্নমেন্ট যদি আপনারা ফর্ম করতে না পারেন, তাহলে আমাদের কি দশা হবে সেটা ভাবতে পারেন! এমনিতেই তো ধর্মঘট, দাবী আর ঘেরাও এর শুভায় দেশের অর্ধেক কলকারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। ছোটখাট কারবারিরা যন্ত্রপাতি বেচে দিয়ে কারবারে লালবাতি জ্বালছে। বড় ব্যবসায়ীরা যন্ত্রপাতি উঠিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে পশ্চিম বাঙলা থেকে। মজহুর যুনিয়নগুলো ৩২ পেতে বসে আছে ইলেকসানের মুখ চেয়ে। এই সময়ে কি আমার মত ব্যবসায়ীর ব্যক্তিগত ব্যবসার কথা ভাবা উচিত?

আগরওয়াল একবার আড় চোখে দেখে নেন পুরস্কার রাজনীতিবিদ মহাপাত্রের দিকে। ‘বিসনেস ম্যাগনেটের’ বক্তৃতার ফল ‘কিং-মেকারে’র উপর কতটা ফলপ্রসূ হচ্ছে। শুধু ধরছে, তাই আবার চেয়ারে হেলান দিয়ে বলেন, ‘যদি আপনি যদি বলেন আশঙ্কার কিছু নেই—তাহলে না হয় এটিকে টিল দিয়ে গুঁদে ফেলা দেখি।’ পেট্টেট নেওয়া, প্রডাকশান বাড়ানো ইত্যাদিতে আবার মন দিই।

এবার সোজা হয়ে ওঠেন জীমুতবাহন মহাপাত্র, না না, থাকনা তাহলে এখন। সত্যিই তো! একসঙ্গে কতদিক দেখবেন আপনি? বেশ, ইলেকসান যিটে গেলেই বয়ঃ শুদিকে মন দেবেন। তখনই না হয় থাইভেট লিমিটেড কোম্পানী ফ্লোট করে পুরোদমে কাজে হাত দেওয়া যাবে।

: সে কথা তো হয়েছেই আছে। শুধু লেখা-পড়াটা বাকি। আমি ভূমিনি স্থার যে, এ আলাদীনের প্রদীপ, ঘটনাচক্রে আমার হাতে এসেছে; এটা আপনার হাতেও পড়তে পারত। আপনি আমি আর সূজাতা। আমরা তিনজনেই হব অংশদার। আমি যোগান দেব অর্থ, আমি করব প্রডাকশান, আপনি করবেন মার্কেটিঙের ব্যবস্থা, আর সূজাতা—ওটা সেক্টিমেন্টাল কারণে।

: না না, শুধু সেক্টিমেন্টাল কারণ হবে কেন? তার বাবাই এটার আবিষ্কারক, তাকে আমরা বঞ্চিত করব না, মানে মরালি করতে পারিনা—

: আর তাহলে উঠি?

: উঠবেন? তা আপনি ব্যস্ত যাহূব, আপনাকে বেশীকণ ধরে রাখা ঠিক নয়। ও, আর একটা কথা। হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

: উঠেই পড়েছিলেন আগরওয়াল। এ কথার আবার বলে পড়েন।

বেশ একটু ইতস্তত করে জীমূতবাহন বলেন, কিছু মনে করবেন না আগরওয়াল সাহেব, নেহাৎ বন্ধুলোক বলেই কথাটা বলছি। সূজাতাকে আপনি অন্ত কোন বাড়িতে রাখুন। আপনি এ শহরে এলে ঐখানেই থাকেন, যান, আমি অবশ্য লোকের কথায় কান দিই না; কিন্তু শত্রুর তো অভাব নেই আপনার; তাদেরই বা দুটো বাঁকা কথা বলার সুযোগ আপনি দেবেন কেন?

একটা আড়মোড়া ভেঙ্গে ধীরে স্তম্ভে আবার উঠে দাঁড়ান আগরওয়াল। বিচিত্র হেসে বলেন: আমি থকুর পরিণা স্তার, টেরিলিন পরি; অফিসের ভিতরেই মদ খাই, খাওয়াই; এবং সারাজীবন মেয়ে মানুষ পুবেছি! এ কথা এ কন্টিটুয়েন্সির সবাই জানে। আমি তাদের পরোয়া করিনা! তার দুটো কারণ, এক নম্বর আমার ছ-কান কাটা; ছ-নম্বর আমি তাদের ভোটের প্রত্যাশী নই।

জীমূতবাহন দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন—এটা কি একটা জবাব হল?

: হ'লনা বুঝি? বেশ, তাহলে আরও খোলাখুলি বলি। আমি কনফার্মড ব্যাচিলার, ফলে জৈবিক প্রয়োজনে আমাকে কিছু বিকল্প ব্যবস্থা রাখতে হয়। এজন্য আপনাদের ভাষায় আমি কনডেমড ডিভচ! তা হোক, আমার কোন ঢাক ঢাক গুড় গুড় নেই। কিন্তু আপনাদের তো তা নয় স্তার? আপনাদের সকলেরই ঘরে শুনতে পাই ধর্মপত্নী আছেন। জৈবিক প্রয়োজনে আপনাদের বিকল্প ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই। তবু মিসেস কৌশল্যার সাক্ষ্য মধুচক্রে আপনাদের তো যোগ দিতে বাধেনা! না কি আপনারা সবাই অজ্ঞাতশত্রু? আপনাদের বিরুদ্ধবাদীরা বুঝি বাঁকা কথা বলতে জানে না?

আগরওয়াল আড়চোখে দেখে নেন শ্রোতৃ জীমূতবাহনের মুখটা লাল হয়ে উঠেছে। তাই হঠাৎ হেসে হালকা করে দেন, কাঁচের ঘরে আমরা সবাই বাস করি স্তার। ইতর লোকের ও সব ছেঁদো কথায় আপনার মত দেশবরেণ্য লোকের কান দেওয়া কি উচিত? আচ্ছা আজ চলি!

হাত দুটি জোড় করে একটা নমস্কার করেন। তারপর ধীর পদে বেরিয়ে যান ঘর থেকে।

করেক সেকেণ্ড নিশ্চল বসে থাকেন মহাশয়। এমন স্পষ্ট ভাষায় কেউ যে তাঁকে সরাসরি অপমান করতে পারে এ ছিল তাঁর ধারণার অতীত।

কিন্তু প্রতিবাদ করার উপায় নেই। জীমুতবাহন এখন বেকারদার পড়েছেন ; সামনে তরঙ্গ সংকুল নির্বাচন সমুদ্র। আগরওয়াল একজন দক্ষ এবং অভিজ্ঞ কাওরী—তিন তিনবার সে তাঁকে পার করে দিয়েছে এই বিকৃত সমুদ্র, এবং এবারও তা দেবার প্রাতিশ্রুতি দিয়েছে। দীর্ঘদিনের লেন দেন। তাছাড়া ঐ কালোবাজারি ধনকুবের তাঁর অনেক দুর্বলতার সঠিক সন্ধান রাখে, কে জানে হয়তো প্রমাণও সংগ্রহ করে রেখেছে ; অথচ ঐ অন্ধকারের ব্যাপারীর বিরুদ্ধে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ আজও তিনি সংগ্রহ করে উঠতে পারেন নি। সুযোগ তিনি হেলার হারিয়েছেন। ডাঃ চ্যাটার্জির মৃত্যুটাকে সন্দেহজনক লেগেছিল তাঁর, কিন্তু তা নিয়ে কোন উচ্চবাচ্য করেন নি। উপায় ছিল না। জীমুতবাহনকে আইটেম লিমিটেড কোম্পানির অংশীদার করে নিতে লোকটা এককথার রাজি হয়ে গেল যে। তাছাড়া তখন ইনেকসানও এসে গেছে নাকের ডগার।

এখন বুঝতে পারেন, ভুল করেছেন। এসব লোকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে হয়। না চললে উপায় নেই—এ হচ্ছে রাজনীতির খেলা। কিন্তু এদের মৃত্যুবান তাঁর আগে সংগ্রহ করে রাখতে হয়। সম্প্রতি এ মত্যাটা অনুধাবন করেছেন। উদ্যোগী পুরুষ সিংহ তিনি। আগরওয়ালের ছিদ্ৰ অনুসন্ধান করেছেন। লোক নিয়োগ করেছেন। লোকটার মৃত্যুবান সংগ্রহ করে রাখা চাই। অ্যাটর্নি বোমা কাটাবার দরবার হয় না, শুধু ফনিয়াকে জানিয়ে রাখতে হয়, ওটা আমার ডাঁড়ারেও আছে। ময়ূরকেতন যে বীকা কথামতো বেপরোয়া ভাবে নির্বিচারে বলে গেল তা শুনে মনে হচ্ছে এ বিষয়ে আরও আগে অবহিত হওয়া উচিত ছিল তাঁর।

মনে পড়ে গেল পুরাতন ইতিহাসটা। বেদনাদায়ক ইতিকথা। সুযোগ তিনি হেলার হারিয়েছেন।

সুজাতা তার পাগল বাবাকে নিয়ে সর্বপ্রথমে জীমূতবাহনের দ্বারস্থ হয়েছিল। তখনও তারা আগরওয়ালকে চিনত না। জীমূতবাহন এ জেলার একজন স্বনামধন্য লোক, আত্মীবন দেশের সেবা করে গেছেন। সুজাতা আশা করেছিল তাঁর মাধ্যমেই সরকারী সহায়তা পাওয়া যাবে। জীমূতবাহন সেই দুর্লভ সুযোগটা ঠিকমত হাত বাড়িয়ে ধরতে পারেননি। ঠিকমত খেলিয়ে মাছটা গাঁথতে পারেননি; সুতো ছিঁড়ে মাছটা চলে গেল। ডাঃ চ্যাটার্জির কাডের বিলাতী অক্ষরগুলি নজরে না পড়লে বাস্তব মানুষ মহাপাত্র হয় তো দেখাওঁ করতেেন না। কিন্তু তাঁর সঙ্গে কথা বলেই তিনি বুঝতে পারেন কী প্রচণ্ড সম্ভাবনাময় প্রস্তাব এসেছে তাঁর সামনে।

মাকুষের নামের সঙ্গে তার চরিত্রের মিল একটা কাকতালীয় ঘটনা। কারণ চরিত্র রূপ পরিগ্রহ করবার অনেক আগেই নামের সম্ভার প্রতিটি মানবক স্ফুটিত হয়ে যায়। তবু দুর্লভ কোন কোন ক্ষেত্রে, বোধহয় ব্যতিক্রমটাই যে নিয়মের পরিচায়ক এটা প্রমাণ করতেই, দেখা যায় অল্প-প্রাশনে আদির করে দেওয়া নামের ষাণ্মার্থ্য প্রমাণিত করেছেন কেউ কেউ উত্তরজীবনে। ডাক্তার সদাশিব চট্টোপাধ্যায় তেমনি এক ব্যতিক্রম। দীর্ঘদিন বিদেশে ছিলেন। সেখানেই রিসার্চ করেছেন। বিবাহ করেননি। সুজাতা তাঁর পালিতা কন্যা যাত্র। কোন এক অনাথ-আশ্রম থেকে তাকে নিয়ে এসে মানুষ করেছিলেন খেয়ালো বৈজ্ঞানিক। তা সেই সুজাতাই ছিল তাঁর সহায় সচীব। ডাঃ চ্যাটার্জির তরফে সেই শুঁড়িয়ে বলেছিল ব্যাপারটা। তাঁর আবিষ্কারের কথা, তার প্রচণ্ড সম্ভাবনার কথা এবং অবশেষে তাঁর প্রস্তাব—সরকারী অর্থানুকূল্যে বৈজ্ঞানিক তাঁর আবিষ্কারকাৰ্য সম্পূর্ণ করতে চান। ইটের বিকল্প হিসাবে তিনি যে হলো-রক তৈরী করেছেন তাতে বাস্তবনির্মাণ-নিম্নে যুগান্তর আসবে। কস্তার কথা শুনে শুনে পিতার চোখ দুটি উজ্জল হয়ে উঠেছিল, তিনি নিজেই অতঃপর সংখ্যাতত্ত্বের হিসাব বোঝাতে শুরু করেছিলেন—এই হলো-রকের ইটের দেওয়াল গাঁথার

খরচ শতকরা পঞ্চাশভাগ কমে যাবে; এবং ইটের পিছনে বেহেতু সাধারণ পাকা বাড়িতে শতকরা বিশ-পঁচিশভাগ টাকা খরচ হয়, ফলে গোটা বাড়ির নির্মাণব্যয় টাকার দু-আনা কমে যাওয়া উচিত। অর্থাৎ যদি ধরা যায় পশ্চিমবঙ্গে বছরে পাঁচ কোটি টাকার এ জাতীয় ইটের বাড়ি তৈরী হয়, তাহলে বছরে জাতীয় সঞ্চয়ের পরিমাণ দাঁড়াবে আধ কোটি টাকার মত। ডাঃ চ্যাটার্জি সামান্য রয়্যালটির বিনিময়ে এ সুযোগ রাষ্ট্রকে দিতে ইচ্ছুক। তাঁর মতে এ সুপাঙ্ককারী আবিষ্কারের একমাত্র বাহনীয় পরিণতি হল পাবলিক সেকুটারের মাধ্যমে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা। জীযুতবাহন সমস্তটা জেনে অভ্যস্ত উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। এ পরিকল্পনার সাকল্য বিষয়ে তাঁর নিজেরও কোন সন্দেহ ছিল না, কারণ ক্ষুদ্র পরিসরে ডাঃ চ্যাটার্জির মত বৈজ্ঞানিক হাতে-কলমে এ জাতীয় ইট তাঁর আগেই নির্মাণ করেছেন, তাঁর নির্মাণব্যয় কবে বার করেছেন, সে রকের ক্রাশিং স্ট্রেন্থ নির্ধারণ করে সন্দেহাতীত প্রমাণ রেখেছেন যে সাধারণ ইটের চেয়ে সেগুলি বেশী ভারসহ। কাগজ পত্রগুলি জীযুতবাহন মোটামুটি পরীক্ষা করে দেখেও নিলেন।

কিন্তু একটি বিষয়ে বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে জীযুতবাহন একমত হতে পারেন নি। তিনি বিকল্প প্রস্তাব রাখতে চেয়েছিলেন আবিষ্কারকের সামনে। বলেছিলেন, আশাকরি আপনি বুঝবেন, এসব বিষয়ে সরকারী অর্থায়ন লাভ করা কত কঠিন। নতুন কোন পরীক্ষা করে দেখতে চান না কেউ। সরকারী এজিনিয়াররা স্বভাবতই রক্ষণশীল। আপনার পরীক্ষা যদি সাকল্যলাভ না করে তবে পাবলিক মানির অপব্যয় হবে। আমাদের দায়িত্বটা তো বোঝেন; নিজের টাকা তো নয় যে বখেচ্ছ রিঙ্ক নিতে পারি। আপনি যদি নিজের নামে পেটেন্ট নিয়ে নিজস্বায়ে ছোট একটি কারখানা গড়ে তুলতে পারেন, ব্যালুফ্যাকচারিং কেলেও ওটা তৈরী করা যাচ্ছে তা প্রমাণ করতে পারেন, তখন না হয় ফিন্যান্সকে রাজি করাবার চেষ্টা হতে পারে,—কারখানাটা সম্প্রসারণের জন্ত।

বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক অবাব দেন নি। চোখ থেকে চশমাটা খুলে দেন, পকেট হাতড়ে কয়াল খুঁজে না পেরে কড়ার খাঁচাটা তুলে দিয়ে নীরবে কাচ জুটো মুছতে থাকেন। কড়া হুজাতাই বলে, কিন্তু কুটিরশিল্প গড়ে তুলবার মত দারিদ্র্য থাকলে বাপি আপনার কাছে আদৌ আসবেন কেন বলুন ?

এ পরীক্ষার পিছনেই যে তিনি লব্ধ ব্যয় করেছেন। আপনার কাছে গোপন করে লাভ নেই, আমাদের এ মাসের খরচ চলাই এখন মুশ্কিল। হাসান্বে বাড়িওয়ালাকে কি ভাবে ভাড়া দেওয়া যাবে এটাই এখন তাঁর প্রধান চিন্তা।

জীমূতবাহন পিতা থেকে কল্যাণ এবং কল্যাণ থেকে পিতার উপর দৃষ্টি বুলিয়ে শেষ পর্যন্ত কল্যাণকেই বলেছিলেন, তোমার বাবা রাজি থাকলে সে দায়িত্ব আমি নিতে পারি।

: আপনি? কি ভাবে?—কোতুহলী হয়ে ওঠেন বুদ্ধ বৈজ্ঞানিক।

: সরকারী ইণ্ডাসট্রিয়াল এস্টেটে আপনাকে খান দুই সেড এ্যালট করিয়ে দিচ্ছি। হাজার দশেক টাকা ক্যাপিটালও না হয় দেব।

উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন বৈজ্ঞানিক—সে তো খুবই ভাল প্রস্তাব! আমি এখনই তাতে রাজি—

বাধা দিয়ে স্বজ্ঞাতা বলেছিল, ঠিক বুঝলাম না; আপনি যে এই মাত্র বললেন বর্তমান পরিস্থিতিতে কিনাঙ্গ টাকা শ্রাংসান করবেনা, দশ হাজার টাকা তাহলে—

বাধা দিয়ে জীমূতবাহন বলে ওঠেন, তুমি ভুল করছ, আমি সরকারী অর্থ সাহায্যের কথা বলছি না। দেশের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে আমারও তো কিছু কর্তব্য আছে? তোমার বাবার মত আবিষ্কার হয়তো আমি করতে পারিনা, কিন্তু তাঁর মত দেশের একটি সম্পদকে নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য তো করতে পারি।

হু-চোখে আশার আলো জলে উঠেছিল সদাশিবের। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, আপনি মহান!

স্বজ্ঞাতা কিন্তু অতটা উচ্ছ্বসিত হতে পারেনি। বাপিকে কোটের আত্মন ধরে আবার চেয়ারে বসিয়ে দিয়েছিল। সে বিজ্ঞানের ছাত্রী নয়, ইকনমিক্স পড়া মেয়ে। ধীরে ধীরে কণ্ঠে প্রশ্ন করেছিল, আপনি দেবেন টাকাটা? কী মর্মে? কী স্বয়ং দিতে হবে আপনাকে?

: স্বয়ং আবার কিসের? হেসে উঠেছিলেন জীমূতবাহন,—আমি মহাজনী কারবার করিনা। টাকাটা আমি বিনা স্বয়ংই দার দেব। তাঁর চ্যাটার্জি একটা হাণ্ডনোটে টাকাটা দেবেন, বখন সুবিধা হবে শোধ দেবেন।

উচ্ছ্বসিত বৈজ্ঞানিক আবার চোখ থেকে চশমাটা খুলে কেমনে। বোধ

করি চোখে জল এসে গিয়েছিল তাঁর। জীমূতবাহনের মহাহুতবতায়।
কমালের অভাবে হাতের উন্টোপিঠ দিয়েই চোখটা মুছে নেন।

হুজাতার সন্দেহ কিন্তু তাতেও ঘোচেনি, বলে—বিনিময়ে কিছুই দিতে
হবেনা আপনাকে, একেবারে নিঃস্বার্থ দান ?

: বেশ তো তোমাদের বিবেকে যদি এতই বাধে, তবে পেটেন্ট নেবার
সময় না। হয় আমাদের দুজনের নামে নেওয়া হবে। এ আবিষ্কার থেকে
যে রয়্যালটি পাওয়া যাবে, তার অর্ধেক আমার, অর্ধেক ডঃ চ্যাটার্জির।

ডঃ চ্যাটার্জি খুশী হয়ে বলেন, বেশ, বেশ, এ আর শঙ্ক কি ?

তাঁকে এক ধমকে থামিয়ে দিয়েছিল হুজাতা, তুমি চূপ কর বাপি।
তারপর জীমূতবাহনের দিকে ফিরে দৃঢ় কণ্ঠে বলেছিল, কী বলছেন
আপনি ? বাপির এ আবিষ্কার থেকে ভবিষ্যতে লক্ষ লক্ষ টাকা রয়্যালটি
পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তার অর্ধেক আপনি লিখে নিতে চান মাত্র
দশহাজার টাকার জন্ত ? তাছাড়া পেটেন্টে আপনার নাম থাকা মানে
আবিষ্কারের সম্মানের আধখানাও আপনি ঐ অর্থমূল্যে কিনে নিতে চাইছেন।

জীমূতবাহন বলেছিলেন, কিন্তু আমার দিকটাও ভেবে দেখ একবার।
তোমার বাবা দশ-বিশখানা হলো-রক তৈরী করেছেন মাত্র। বৃহৎ পরিমাণে
ম্যাক্যাকচারিং স্কেলে তৈরী করতে গেলে অত কম খরচে সেটা নাও হতে
পারে। ম্যাক্যাকচারিং স্কেলে তৈরী করবার সময় অনেক ওড়ার-হেড খরচ
পড়বে। জমির দাম, ক্যাকটারির দাম, লোকজনের মাইনে ইত্যাদি ইত্যাদি,
বা তোমার ল্যাবরেটোরিতে দাম-কষবার সময় ধরা হয়নি। ব্যাপক স্কেলে
হয়তো দামটা এত কম হবেনা যাতে এটা ইটের বিকল্প হিসাবে বাজারে
আমরা চালাতে পারি। তোমার বাবার কোন সম্পত্তি নেই যে মর্টগেজ দেবেন,
কলে আমার টাকাটা আমি বন্ধকী-রূপে দিতে পারছি না। সুতরাং তোমার
বাবা সাকল্যাভ না করলে আমার দশহাজার টাকা জমে যাবে।

ডক্টর চ্যাটার্জি বলেন, যুক্তিপূর্ণ কথা !

হুজাতা হেসে বলেছিল, তা হবে। আমার বুদ্ধি কম, আমার সাধার
সেটা চুকছে না। প্রথমতঃ ল্যাবরেটোরিতে দু-দশটা স্পেসিমেন তৈরী করতে
যে খরচ পড়ে ম্যাক্যাকচারিং স্কেলে তৈরী করতে খরচ তার চেয়ে বেশী
হতে পারে এমন আজব কথা আমি কখনও শুনিনি। তবে তুমি বিলাতী বিশ্ব-
বিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী আর উনি নানান ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন, কলে আমার

এ বিষয়ে কথা বলা ঠিক নয়। দ্বিতীয়তঃ আপনি হাওনোটো টাকা ধার দিচ্ছেন। একথা ঠিক যে বাপি আজ নিঃস্ব। কোন সম্পত্তি বন্ধক রাখার ক্ষমতা নেই তাঁর। তবু একটা জিনিস তাঁর আছে, যেটা আপনি ভাল করেই জানেন। সেটা হচ্ছে তাঁর বাপিন বুনিতানিটির ডক্টরেট অফ এডিনিয়ারিং ডিগ্রিটা। এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও তিনি যে কোন ফার্মে জয়েন করে মাসে বেড় হু-হাজার টাকা রোজগার করতে পারবেন। আপনি ব্যবসায়ী, বেশ ভাল ভাবেই জানেন, হাওনোটোর জোরে তাঁর মাইনে এ্যাটাচ করিয়ে অনায়াসে টাকাটা আপনি উত্তল করতে পারবেন।

ঐ একফোটা মেয়েটার ফোপরালালিতে মর্যাদিক চটে উঠেছিলেন পোড় খাওয়া ব্যবসায়ী জীমুতবাহন। তবু সংবত উত্তরই দিয়েছিলেন তিনি,—তুমি শুধু খারাপ দিকটাই দেখছ।

ডাঃ চ্যাটার্জি দেখা গেল তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। টেবিলে একটা চাপড় মেরে তিনি বলে ওঠেন, একজ্যাঙ্কলি। শুধু ডার্ক সাইডটাই দেখছিস তুই হু, বি অপটিমিস্টিক! আমরা নিশ্চয়ই সাকল্যাভ করব।

স্বজাতা সেকথার কর্ণপাত করেনি, বলেছিল মাণ করবেন স্যার, আমরা ব্যবসায়ী মিস্টার রে. বি. মহাপাত্রের সঙ্গে দেখা করতে আসিনি। আমরা এসেছিলাম দেশসেবক জীমুতবাহন-মহাশয়ের কাছে, যার নাকি সরকারের উপর মহলে অখণ্ড প্রভাব। বাপির ধারণা এ অধিকার থেকে লক্ষ লক্ষ কেন, ভবিষ্যতে কোটি কোটি টাকা লাভ হতে পারবে। তিনি সে অধিকার রাষ্ট্রকে দিতে চেয়েছিলেন, আপনার মাধ্যমে। প্রাইভেট সেকটারের সাহায্যই যদি নিতে হয় তবে আপনার কাছে আসবেন কেন? অনেক ভাল সত্তে বাপি অর্থসাহায্য পাবেন। অন্ততঃ আপনার কল্যাণে, বতদিন বাড়লা বেশে কারুজিওরাল আছে।

মুখ চোখ লাল হয়ে উঠেছিল জীমুতবাহনের; কিন্তু খাপখোলা তলোয়ারের মত মেয়েটা উঠে দাঁড়িয়েছিল, হাত দুটি বুকের কাছে জড়ো করে বলেছিল, আপনার মূল্যবান সময়ের অনেকটা নষ্ট করে দিয়ে গেলাম। নমস্কার! এস বাপি।

ঘর ছেড়ে চলে দিয়েছিলেন তাঁরা।

জীমুতবাহন কিন্তু হাল ছাড়েন নি। আবার ডেকে পাঠিয়েছিলেন সেই

পাগল এজিনিয়ারকে। বাপকে নয়, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন মেয়ের হাতেই কলকাঠি। নিজে যাননি, পাঠিয়েছিলেন উপযুক্ত পুত্রকে। পুত্র অরুণের তন ওকালতি পাশ করেছে সন্তুষ্টি। কথাবার্তার চৌখণ, তত্পরি দেখতে হৃদয় এবং বরসটা অস্বকুল। স্বজাতাকে তো আর তিনি পুত্রবধূ করতে বাঞ্ছন না, তাই দৌতকারে পাঠিয়েছিলেন অরুণকে। লাভ হয়নি। ঘোষ অরুণের রুণের নয়, তার আগেই ময়ূরকেতন আগরওয়ালের টোপ গিলে বসে আছে বাপ-বেটি। অতি ধূরন্ধর ব্যক্তি ঐ ময়ূরকেতন, ওদের ছজনকে নিয়ে গিয়ে তুলেছে কাঁটা তারে ঘেরা তার কারখানার ভিতরে দ্বিতল বাড়িটার। ছোট ফিরাট গাড়িটা দিয়েছে তাঁকে। কারখানার ম্যানেজার নকুল হইকে অর্ডার দিয়ে রেখেছে চাটাজি-সাহেব বা কাঁচা মাল চাইবেন তাই বেন তাঁকে সরবরাহ করা হয়। একটি গোরানিজ পাচককে পাঠিয়ে দিয়েছে রান্না করার জন্ত, আর বনোয়ারীলাল তো আছেই অন্যান্য কাজের জন্ত। আসলে এভাবে এক দুর্ভেদ্য বাহ রচনা করে ফেলেছিল আগরওয়াল, বাহ ভেদ করে জীমূতবাহন সদাশিবের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন নি।

একটা জিনিষ আজও বুঝে উঠতে পারেন না জীমূতবাহন। অমন বুদ্ধিমত্তী মেয়েটা কেমন করে ময়ূরকেতনের খপ্পরে গিয়ে পড়ল। ময়ূরকেতন মাল্লখটাকে এ জেলার মানুষের চিনতে বাকি নেই, এ শহরের মানুষ তো বিশেষ করে চেনে। বছর তিনেক আগে ওর বাগানবাড়ির সংলগ্ন জমিতে একটি দ্বীলোকের মৃতদেহ মাটি খুঁড়ে বার করা হয়েছিল, এ কথা কে না জানে। সে কেসে ময়ূরকেতনের নামও জড়িয়ে গিয়েছিল, যদিও সাক্ষী প্রমাণের অভাবে তার গায়ে আঁচড় লাগেনি। এ হেন ময়ূরকেতন আগরওয়ালের বিবরে ওরা নিশ্চিন্ত মনে গিয়ে মাথা গলালো কোন সাহসে? বাপটা অপদার্থ, কিন্তু মেয়েটাকে দেখে তো তা মনে হয়নি! আর সবচেয়ে অবাক করা খবর হচ্ছে এই যে ঐ আবিষ্কারের গোপনস্বত্বটা যুর্থ বৈজ্ঞানিক গোপন রাখতে পারেন নি! লেখা পড়া হবার আগেই তার আবিষ্কারের খুল তথ্যটা হতভাগা জানিয়ে দিয়েছিল আগরওয়ালকে। এটা যে কেমন করে সম্ভবপর হল তা আজও আশ্রয় করতে পারেন না জীমূতবাহন। তবু এ কথা সত্য। মেরেকে পর্যন্ত যে কথা বলেনি ঐ যুর্থ বৈজ্ঞানিক কথার কথার সে-কথা বলে ফেলেছিল আগরওয়ালকে। না হ'লে সদাশিব হঠাৎ হার্টকেল করে মারা বাবার পর আগরওয়াল ঐ দামে ঐ হলো-রক তৈরী করতে পারত

না। অথচ স্ফূটনা এ গোপন আবিষ্কারের মূলস্ফূটনা আজও জানে না। যতদূর সংবাদ পেয়েছেন, ডাঃ চ্যাটার্জির রিসার্চের কাগজগুলো এত দুঃখেও হাতছাড়া করেনি তাঁর মেয়ে। কিছুতেই সেগুলো কাউকে দেখতে দেয়নি, না আগরওয়ালকেও নয়। এ কথা স্ফূটনা খরং খীকার করেছে জীমুতবাহনের কাছে, পিতার মৃত্যুর পর। স্ফূটনা তাঁকে ফোন করে জানিয়েছে। বস্তুতঃ মনে হয় অরুণরতনের কাছে সে সাহায্যও চেয়েছে। অরুণ ছেলেটা চাপা, কথা বলে কম। তার মনোগত ভাবটা উনি বুঝে উঠতে পারেন নি। স্ফূটনাকে সে কী ভাবে দেখছে তা সেই জানে। স্ফূটনার এজিয়ারে যে একটা গুপ্তধনের চাবিকাঠি লুকানো আছে এ খবরটাকে বোধকরি অরুণরতন গুরুত্ব দিচ্ছেনা, স্ফূটনা যে সন্দেহী, সে যে নারী, সে অসহায় এইগুলোই হয়তো তাঁর ব্যাচিলার রোমান্টিক চেলের কাছে বড় কথা! বাপে ছেলেতে এ নিয়ে খোলা কথা কোনদিন হয়নি। অরুণ যে খাতুতে গড়া তাতে তার সঙ্গে এ সব বিষয়ে খোলা কথা বলতে সাহস হয়না তাঁর। বাধ্য হয়েই তাকে এড়িয়ে সরাসরি স্ফূটনার সঙ্গে যোগস্বাপন করতে হয়েছে তাঁকে। টেলিফোনে। স্ফূটনাকে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন, সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছেন কাগজগুলো গোপনে রাখতে। আগরওয়াল অবশ্য কিছুটা জানতে পেরেছে, সন্ধানিবকে পটিয়ে, কিন্তু পেটেন্ট নিতে গেলে যতটা জানা দরকার ততটা নিশ্চয়ই সে জানেনা। সেটুকুও জানা থাকলে সে নিজের নামে এতদিনে পেটেন্ট নিয়ে ফেলত। জীমুতবাহন ইলেকসানে নেমেছেন, তাই ময়ূরকেতন লম্বা করে উঠতে পারছেন না, এমন হাস্যকর কথাটা আর বেই হ'ক তিনি বিশ্বাস করেন না। তা হ'ক, ময়ূরকেতন লোকটা অতি ধূর্ত। বেচ্ছার অধিক লভ্যাংশ সে দিবে বাচ্ছে আবিষ্কারকের একমাত্র কস্তাকে, যদিও আসল কাগজগুলো স্ফূটনা হস্তান্তর করেনি, এমন কি দেখতে পর্যন্ত দেয়নি। বস্তুর শেষ নেই তার। স্ফূটনার জীবনযাত্রার কোন অভাব সে রাখতে দিচ্ছে না। কী ভাবে ঐ অজগরের বিবর থেকে মেয়েটিকে উদ্ধার করে আনা তার ভেবে তার কোন কুল কিনারা করতে পারছেন না। ঐ গোয়ানিজ রাঁধুনিটা একটা দাগী লোক। ওর ইতিহাসটা ঠিক জানেন না, কিন্তু দীর্ঘদিন ও আছে ঐ আগরওয়ালের কারবারে। হয়তো ঐ লোকটাও আধারের কারবারী। নকুল হই অত্যন্ত ভালমাহুষের মতো হাত দুটি জোড় করে থাকে বটে কিন্তু সেও সুবিধার নয়। সেও অত্যন্ত ধূর্ত। স্ফূটনা:

আগরওয়ালের অস্থগহিতকালেও বিশেষ কিছু করা যাচ্ছে না। আর শুধুমাত্র মেয়েটিকে উদ্ধার করে আনলেই তো চলবে না, ঐ সঙ্গে কাগজগুলোও উদ্ধার করতে হবে। মুশকিল এই যে স্বভাতা তাঁর সাহায্য চাইছে বটে, কিন্তু মানবচরিত্রে অভিজ্ঞ জীমূতবাহন বেশ বুঝতে পারেন, মেয়েটি এখনও তাঁকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছে না। এ বিশ্বাস উৎপাদন করতে পারত অরুণরতন, কিন্তু ছেলের মনোগত ইচ্ছাটাই তিনি আজও বুঝে উঠতে পারেন নি। অপরপক্ষে আগরওয়াল নির্বাচনের রণাঙ্গনে তাঁকে অকুণ্ঠ সাহায্য করছে। আগরওয়ালকেও এ সময় চটালে চলে না—ব্যবসারী মহলের সলিড সাপোর্ট লোকটা দিতেও পারে, কেড়ে নিতেও পারে।

ভৃত্য এসে একখানা দায়ী ভিজিটিং কার্ড রাখে টেবিলের উপর। জীমূতবাহন কার্ডটা তুলে নিয়ে দেখলেন—এস. পি. সিং। সেই বাসকট পারমিটের প্রার্থী। লক্ষপতি মাহুঘটা সকাল-সন্ধ্যা ধর্ম দিতে শুরু করেছে আজকাল। বোধহয় ও বেটা ভয় পেয়েছে নির্বাচন শেষ হলে সব ওলট পালট হয়ে যাবে। তাই রাতারাতি পারমিটটা বার করে নিতে লোকটা আদাজল খেয়ে লেগেছে। এই লোকগুলো বোঝেনা কেন যে জীমূতবাহন ভগবান নন। এই সব ঝামেলা এড়াবার জন্য মস্ত্রীক পর্বস্ত গ্রহণ করেন নি তিনি, অথচ লোকগুলো নাছোড় বান্দা। পার্টিকাণ্ডে চাঁদা আর প্রাইভেট ফাণ্ডে চাঁদির যোগান দিয়েই দিনকে রাত করা যায় এই ওদের ধারণা। বোঝেনা, জীমূতবাহনকেও পার্টির নির্দেশ মেনে চলতে হয়, তাঁকেও কৈফিয়ৎ দাখিল করতে হয়।

: বৈঠনে বোলো, কুছ দেয় হোগা।

বসে থাকুক বেটা আপাতত।

। সাত ।

কোনিকের তারেরিতে আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করবার মত। কলেন জীবনের শেষ পর্যায়েও সে ছন্দোবদ্ধ সুমিল কবিতা লিখেছে। কিন্তু গত রচনা আর শেষদিকে সাধু ভাবার নয়। অর্থাৎ ভাবার দিক থেকে তার কিছুটা বিবর্তন হচ্ছে বটে, কিন্তু তার কবিত্যমানসের বিশেষ কোন পরিবর্তন

আমার নজরে পড়েনি। কুলি বস্তীর জীবনযাত্রার সে হৃৎকষ বোধ করেছে, নিরামতের প্রতি সমাজের উপেক্ষার সে বেদনাহত—কিন্তু আগেই বলেছি, এসব ক্ষেত্রে সে বিজোহী নয়। তার রোমান্টিক কবিতার আত্ম-প্রত্যারণার পথে তির্যক লাঞ্ছনা খুঁজে পাবার চেষ্টা করেছে। এই পর্বারের আরও একটি কবিতা উদাহরণ স্বরূপ তুলে ধরতে পারি। এটাও ওর কবিতার বিবর্তনের একটা পর্বার। সার্ভে চেনের প্রসঙ্গে যে কবি ছিল সম্পূর্ণ রোমান্টিক, আত্মরতিতে বিভোর, চিনিকলের কুলি বস্তীতে তাকে দেখলাম বেদনাহত ব্যাখ্যাতর। তবু সে জীবন জিজ্ঞাসার সহজ নেতিমূলক সমাধান করতে চেয়েছিল। নিরামত মিস্ত্রির বঞ্চিত মানবাত্মা তাকে বতটা বিচুড়ক করেছিল, তার চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে করে তুলেছিল রোমান্টিক। এবার যে উদাহরণটি রাখছি তাতে লক্ষণীয় কবি নিজ অভিজ্ঞতার কথাই বলেছেন; এখানে তিনি দর্শক মন, নিজেরই অশুভুতির কথাই লিখেছেন। হয়তো এতক্ষণে আঁতে যা লেগেছে বলেই এঞ্জিনিয়ার কবি এবারে প্রণিধান করেছেন যে প্রতিপক্ষও একজন আছে। চিনিকলের কুলিদের হৃৎকষাধার ধনতান্ত্রিক মিল মালিকের ভূমিকা সম্বন্ধে কবি ছিলেন উদাসীন, নিস্পৃহ, নীরব; নিরামত মিস্ত্রির বঞ্চনার ইতিহাসের সঙ্গে মুনাকা শিকারী ঠিকাদারের ভূমিকাটা তাঁর নজরে পড়েনি; কিন্তু এবার এই আত্মনেপদী কবিতাটিতে দেখছি ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার মেহনতি মানুষদের, কারীগরী কাজ জানা মানুষের বঞ্চনার মূল কারণটার দিকে তাঁর নজর পড়েছে। কবি লিখেছেন,

গৃহপ্রবেশের নিমন্ত্রণে আমিও আমন্ত্রিত
 গৃহকর্তার সাহর বিনয়ে হলাম আপ্যায়িত।
 ব্রজলক্ষট আত্ম পত্র থেকে
 কিছু বার নাই—বাড়িটি দিচ্ছে ঢেকে।
 লালনীল আর সবুজ কাগজ জুড়ে
 আপ্যায়নীর্ষ বাড়িটা দিচ্ছে মুড়ে।
 স্ত্রীম লাইনের মডার্ন বাঙালোথানি
 তারি গহনার বেনারসী পরে সেজেছে পটের রাশী।
 গৃহকর্তার ইয়ার বন্ধ এসে
 সমাজদারের বিচিত্র হাসি হেসে

ভাবিক করেন আমার কচিকে সবে ।
লাল হরে উঠি আপনার পরাভবে ।

* * *
গৃহকর্তাই এ বাড়ির আজ প্রভু
সেই সাথে ফের জানিয়ে রাখছি তবু
এ বাড়ি উঠেছে অধেষেরই ডিঙাইনে
গৃহকর্তাই অর্থযুলো নিয়েছেন তারে কিনে ॥

* * *
অজ্ঞাতশিশুর অজানা হাসিটি যখন গোপন থাকে
আসন্নমাতা আপন স্বপ্নে তাকে
আপনার করে জানে ।

তেমনি যখনই চেয়েছি প্রাণের পানে
হিজিবিজি সেই চিহ্নের মাঝে খুঁজে
এ বাড়ির এই আজকের রূপ তখনই নিয়েছি বুঝে ।
এর শৈশব ভিত্তির মূলে আমারই প্রশ্ন আছে
বনিয়াদ তলে বাল্যজীবন কেটেছে আমারই কাছে ।
কুটফুটে সেই ছোট্ট মেয়েটি আজ
রাঙা চেলি পরে সেজেছে পটের সাজ ।
হাল-আমলের ছিমছাম কচি মেয়ে
গহনার ভারে সজল চক্রে আছে যোর পানে চেয়ে ।
পোটিকোর পরে ক্যান্টিলিতার বারান্দাটার থেকে
দেবদারু পাতা আগাগোড়া দেছে ঢেকে ।
ক্রীম-কালারের নী-সেম রঙের পাশে
লাল শালুখানা রক্তচক্রে উঠিয়ে যারতে আসে ॥

* * *
ভোজন পর্ব শেষে
পথের প্রান্তে দাঁড়ানোর ফের এসে ।
গৃহ-প্রবেশের নয় এ নিয়ন্ত্রণ,
ধনিক-দুর্ধ জামাতার করে আমার বিছবী কত্তা সমর্পণ !
শিফুরেহের শেষ হল অধিকার
বিদায় বা আমার ॥

বেশ বুঝতে পারি, কবি এখানে শুধু রোমাটিক নন, তিনি শল্যরোগ, এনকেপসিট। এই ট্র্যাঙ্কেডির যুলে কী আছে তার সন্ধান যে তিনি জানেন না তা মনে হয়না; কিন্তু উটপাখীর মত তিনি বালিতে মুখ ঝুঁজে সমস্তটা এড়াতে চাইছেন। অস্ত্রায়ের বিকল্পে কুখে দাঁড়াবার মত ভাবা কবির কলম তখনও খুঁজে পারনি।

এই কবিতাটি কিন্তু কবি কোশক মিত্র তার কলেজ জীবনে লেখেনি। ইতিমধ্যে ফার্স্ট ক্লাস বি. ই ডিগ্রি নিয়ে সে কলেজ থেকে বেরিয়ে এসেছে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে। চাকরির সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে। তার ভাষাতেই বলি : “প্রায় ছয় মাস হতে চলল পাশ করে বেকার বসে আছি। বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছি। আশ্রয় নিতে হয়েছে বন্ধুর মেসে, তারই দ্বাক্ষিণ্যে। আশৈশব আমার খরচ টেনে এসেছিলেন যে বৃদ্ধ কালীবাসী ব্রাহ্মণ ভ্রলোক তাঁর স্বর্গে গিয়ে ডর করতে সঙ্কোচ হল। সংসার বিষয়ে বাবা এখন বেশ নিলিপ্ত। পাশ করেছি শুনে খুশী হলেন, চাকরি পাচ্ছি না বলে দুঃখিত হলেন; কিন্তু বেশ বুঝতে পারি তাঁর মনে এসব কথার আর দাগ পড়ে না।

কিন্তু কোথাও একটা চাকরি যোগাড় না করতে পারলে আর চলছে না। বাপির কাছ থেকে সঙ্কোচে পালিয়ে এসেছি, তাঁর পেনসনে ভাগ বলাবো না বলে; কিন্তু বন্ধুর ঘাড়েই বা কদিন বসে থাওয়া যায়? একের পর এক ইন্টারভিউ দিয়ে চলেছি। কোন ব্যাটাই ডাকছে না, অথচ প্রতিটি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হচ্ছে পাঁচটার পোস্টাল অর্ডারসহ দরখাস্ত করতে। বাধ্য হয়ে লাইড কলটা সেকেন্ডহ্যান্ড দামে বেচে দিতে হল। একটা গরম কোর্টও বেচে ফেলেছি! পরশুদিন ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে একটা নতুন প্রশ্ন শুনে চমুকে উঠেছিলাম,—এই ছয়মাস শ্রেক বসে আছেন? কিছুই করছেন না?

“যেন অপরাধটা আমারই। ঠিকাদারী করতে গিয়েছি, শুনেছি এখন নতুন ঠিকাদারের এনলিস্টমেন্ট হচ্ছেনা। কারণ? কাজের অপ্রতুলতা, ঠিকাদারের আধিক্য। বিনা এনলিস্টমেন্টেও কাজ করা যায়। ওপন টেওয়ার। কিন্তু সে কাজের পরিমাণ দু-লক্ষ টাকার উপর। সে কাজ তুলবার মত বিভাবৃদ্ধি আছে, কিন্তু ক্যাপিটল কই? চাকরি ধরতে গিয়েছি, শুনেছি কাজ কোথাও খালি নেই। হেঁতু? কাজের অপ্রতুলতা, এবং এভিনিউয়ারেড সংখ্যাধিক্য।

“অথচ কেন এমনটা হল?”

“প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার আয়ত্তে সারা ভারতবর্ষে যাত্র পরিত্রিণটি এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ছিল। যারা পরিকল্পনা করলেন, তাঁরা বললেন,—অভাব অর্ধের নয়, অভাব কাঁচা মালের নয়, অভাব শুধু এঞ্জিনিয়ারের। অভাব কারিগরী কাজ জানা মানুষের। আমাদের যত সহস্র সহস্র ছেলে খবরের কাগজে বড় বড় বক্তৃতার অংশ পড়ল, প্রত্যহ বেতারে কর্তাদের বক্তব্য শুনল, তারা উৎসাহিত হল। দলে দলে সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ল এঞ্জিনিয়ার হবে বলে। হাজার মেকেওয়ারী পরীক্ষার হল থেকে তারা বাড়ি ফেরে না, ছোট্ট এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের এ্যাডমিশন্ টেস্টের পুরানো প্রশ্নপত্রের খোঁজে। কাকে ধরলে ঢোকা যাবে ঐ স্বর্গলোকে? যারা প্রথম বিভাগে পাশ করবার ভরসা রাখেন না, তারাও বলে নেই—কোনও এল. সি. কলেজে ভর্তি হওয়া যায় কিনা সেই চেষ্টা করতে থাকে। নিদেন ওভারসিয়ার হতে হবে। তারপর নিজের চেষ্টায় যদি এ. এম. আই. ই পাশ করা যায় তাহলে তো পুরাদস্তুর এঞ্জিনিয়ার! দশবছরের মধ্যে পরিত্রিণ থেকে কলেজের সংখ্যা বাড়িয়ে ফেলা হল একেবারে একশ এগারোতে। তিনগুণেরও বেশী। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শুরুতে প্ল্যানিং কমিশন আর একবার ভাল করে দেখতে চাইলেন কারিগরী কাজ জানা মানুষের অভাব কতটা পূরণ হল। সরকার নিয়োজিত একটি বিশেষ কমিটি একত্র তথ্য সংগ্রহ করল। বিভিন্ন চেম্বার-অফ কমার্স, সরকারী আধা-সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁরা শেষ পর্যন্ত তাঁদের রিপোর্ট পেশ করলেন। তাতে বলা হল এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও ডিপ্লোমা হোল্ডারদের জন্ত নূতন নূতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার কারিগরী কাজ জানা মানুষের একান্ত অভাবটা কিছু পরিমাণে কমেছে; তবু তাঁদের হিসাবে ১৯৬০-৬১ সাল নাগাদ ডিগ্রি ধারীদের অভাবটা দাঁড়াবে আন্দাজ আঠারো লাখ, এবং ডিপ্লোমাধারীদের অপ্রতুলতা হবে আন্দাজ আট হাজার! সুতরাং ঐ বিশেষজ্ঞ কমিটি আরও নূতন আঠারোটি ডিগ্রি কলেজ এবং বাথটিটি নূতন পলিটেকনিক খোলার পরামর্শ দিলেন। বলে অচিরেই.....”

এসব নেহাৎ সংখ্যাভেদের ব্যাপার। এ কাহিনীর পক্ষে অপ্রয়োজন। তিনটে পরিকল্পনার দেশে এঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার কী ক্ষুদ্র উন্নতি হয়েছে তার হিসাব জানবার জন্য কোণিকের ডায়েরি খাটার প্রয়োজন নেই। প্রচার দপ্তরে খোঁজ করলেই তা পাওয়া যাবে। শেষ দিকে কোণিক লিখেছে

“নারী ভারতে আজ বেকার এঞ্জিনিয়ারদের সংখ্যাটা ঠিক কত তাই কেউ হিসাব করে বলতে পারছেন না। কেউ বলেন বিশ হাজার, কেউ বলেন, ত্রিশ।

“পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি ইট-তৈরীর কারখানা খুলেছেন ফলতায়। যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইট তৈরীর কারখানা। চাকরির লক্ষ্যে একবার দু’ মাসতে গিয়েছিলাম সেখানে। বিদেশ থেকে হরেক রকম যন্ত্রপাতি আনিয়ে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইট তৈরি করছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার। কলকাতা শহরকে পরিষ্কৃত জল সরবরাহ করতে গঙ্গানদী থেকে জল ঢুকিয়ে দেওয়া হয় বিরাট বিরাট কৃত্রিম জলাশয়ে—ওরা বলেন সেটলিং ট্যাংক। গঙ্গার বোলা জলের পলিমাটি তলায় থিতুয়ে পড়ে। উপর থেকে জলটা টেনে নিয়ে সেটাকে পরিষ্কৃত করে সরবরাহ করা হয় টালা ট্যাংকে। কিন্তু তলার থিতুয়ে পড়া পলি মাটির গতি কি হবে? গতি হয় না। ফলে এই বিরাটাকার কৃত্রিম জলাশয়গুলি একে একে ভরে উঠছিল। এতদিন এ সমস্যার সমাধানের একমাত্র উপায় ছিল নতুন নতুন জলাশয় খনন করা। একটি জলাশয় পলিমাটিতে ভরে উঠলে নতুন একটি খুঁড়ে অভাব পূরন করা হত ; কিন্তু বৃহত্তর কলকাতার সম্প্রদায়ের পর আর নতুন জলাশয় খননের উপযুক্ত জমিও পাওয়া যায় না আদ্যকাল। তাই এই নতুন প্রকল্পটিতে হাত দিয়েছেন সরকার। পলিমাটি থেকে তৈরী করছেন যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পোড়া ইট। অনেক টাকার বিদেশী যন্ত্রার বিনিময়ে এসেছে এক্সকাভেটর, কেরিয়ার, মিস্সার, হপার, ফীডার এবং যান্ত্রিক চুল্লি। কলকাতা শহরের ইটের চাহিদাও ভো বড় কম নয়।

“ভেবেছিলাম এখানে হয়তো কোন কাজে আমার মত লোকের অঙ্গসংহানের একটা ব্যবহা হবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ তা হলনা। ফলত ইটের কারখানার ভারপ্রাপ্ত সরকারী এঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে আলাপ হল। আমাদেরই কলেজ থেকে পাশ হয়েন রায়। মুখচেনা ছিল। ওর বাবা ছিলেন সরকারী কলেজের ফিসিক্সের অধ্যাপক। আমার বাবার সঙ্গে তাঁর আলাপ ছিল। সেই পরিচয়ে তিনি আমাকে চিনতে পারলেন। চা এবং বিস্কুট খাওয়ালেন। দুঃখ প্রকাশ করলেন, আমাকে মিতে পারছেন না বলে। বললেন, আপনাদের ব্যাচের একটি ছেলে আমাদের এখানে আছে, সুরেশ নাথ, চেনেন ?

“—খুব ভাল ভাবেই চিনি। আমাদেরই হস্টেলে ছিল। সুরেশ এখানে চাকরি পেয়েছে ?

“পেয়েছে, তবে এতিনিয়ার হিসাবে নয়। দাঁড়ান ওকে ডাফি।

“বেল বাজিয়ে পিওনকে ডাকলেন। বললেন, সুরেশবাবুকে ডাক।

“সুরেশের আসতে যেটুকু সময় গেল, তারই মধ্যে আমি বিশ্বর প্রকাশ করে বললাম, এতিনিয়ার হিসাবে নয়, মানে ?

“উনি বুঝিয়ে দিলেন ব্যাপারটা : আমাদের প্রয়োজন ছিল একজন কেরানীর। কিন্তু কেরানীর পোষ্টের স্ত্রাংসন পাওয়া গেল না। ক্যাকটারী বর্তমানে যথেষ্ট লাভ দেখাতে পারছে না, ফলে নতুন ক্লার্ক স্ত্রাংসন হচ্ছে না। বাধা হয়ে আমরা একটা তির্যক পন্থায় অভাব পূরণ করেছি। ডেলি-লিবার লাগাবার জন্য আমাদের কর্তৃপক্ষের মুখাপেক্ষী হতে হয় না। দৈনিক মজুর লাগাবার অধিকার আমার আছে। আপনার বন্ধুকে দৈনিক আড়াইটাকা মজুরির হারে চাকরি দিয়েছি আমি। খাতা কলমে সে মাটি-কাটা কুলি, যদিও আসলে তাকে দিয়ে কেরানীর কাজ করাচ্ছি।

“এবাক হয়ে বলি—সুরেশ দৈনিক আড়াই টাকা হারে দিন মজুরী করছে ? বলেন কি ?

“সুরেশ এলে তাকেই জিজ্ঞাসা করে দেখুন বরং। এখান থেকে সস্তর পঁচাত্তর পার, সন্ধ্যা বেলা দুটি ছেলেকে পড়ায়। সপ্তাহে তিনদিন একে, তিনদিন ওকে। দু'জারগার থেকে মিলিয়ে পার শ' দেড়েক। অর্থাৎ সব-সাকুল্যে শ'ওরা দুশ' মতন রোজগার করছে। উপায় কি বলুন ?

“: আপনি আমাকে তুমিই বলবেন। আমাদের কলেজের বা রেওয়ার্ড।”

“: বেশ তো, তাই না হয় বলব। ঐ তোমার বন্ধু এসে গেছে, সুরেশ, একে ক্যাকটারীটা দেখিয়ে আনো। তোমার বন্ধু, পরিচয় দেবার প্রয়োজন নেই আশা করি।

সুরেশ আমাকে ইট-তৈরীর প্রণালী ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালো। সেটলিং ট্যাংকের মাটি-কাটা থেকে শুরু করে ইটের খাক দেওয়ার বিভিন্ন ব্যবস্থা। একটা তিনিশ লক্ষ্য করলাম, সুরেশ মাগ যদিও আড়াই টাকা হারে মাটি কাটা কুলি, কিন্তু সে কথা বিভিন্ন বিভাগের কর্মীরা মনে রাখেনি। যেখানেই সে আমাকে নিরে গেল, সেখানেই নিয়ন্ত্রণের কর্মীরা ওকে হাত তুলে নমস্কার করল, কেউ কেউ মুখে বললও—নমস্কার স্যার।

অন্যভাবে সুরেশকে বলি, তোকে এরা স্যার বলছে কেন ? ওদের অনেকের রোজগার তো তোর চেয়ে বেশী ?

রান হেসে সুরেশ বলে, অনেকে আসল খবরটা জানে না। অনেকে জানে, তবু আমাকে নমস্কার করে দেখি। বোধ করি ও নমস্কারটা আমার প্রাণ্য নয়, আমার ডিগ্রিটার প্রাণ্য।

সুরেশের কাছে কয়েকজন সতীর্থের সংবাদ পেলাম। ভাগ্যবান কেউ কেউ চাকরি পেয়েছে। দু'একজন জব-ভাউচার যোগাড় করে বিলেত গেছে। সুরেশ, রবি আর সুবিসল একটা বোধ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান খুলেছে। কাজ যোগাড় করতে পারেনি, টেওয়ার দিয়ে চলেছে ক্রমাগত। শিবু তার বাবার ডিসপেন্সারীতে বসছে। কম্পাউণ্ডিং পরীক্ষা দেবে এবার। গোরা, বনি আর ছোটন স্কুল-মাষ্টারী করছে। তার মধ্যে গোরা হচ্ছে প্রাইমারি স্কুলের টিচার। নতু বাটার জুতোর দোকানে সেলস-ম্যানের চাকরি পেয়েছে। অধিকাংশই অবশ্য এখনও ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে।

সমস্ত কারখানাটা ঘুরে ঘুরে দেখিয়ে সুরেশ বলে, চল, তোকে এককাপ চা খাওয়াই। হাজার হোক আমার চাকরি হয়েছে, তুই এখনও বেকার।

হেমে বললুম, না ভাই সুরেশ, তোর এ চাকরি পাওয়ায় আমি খুশী হতে পারিনি। মাটি-কাটা কুলির আড়াই টাকা রেটের চাকরির জন্য তুই পাঁচবছর এঞ্জিনিয়ারিং পড়িস নি! তারচেয়ে চল গঙ্গার ধারে গিয়ে বসি। সুখ-দুঃখের গল্প করি বরং কিছুক্ষণ।

গঙ্গার ধারে বসে অনেক গল্প হল। কলেজ জীবনে আমরা কত স্বপ্নই না দেখতুম। বাস্তব দুনিয়ায় দেখছি সে সব স্বপ্নের কোন ঠাঁই নেই। সুরেশ বলে, আচ্ছা। কোণিক, তুই তো জেনারেল স্কলার ছিলি, তুই মরতে এঞ্জিনিয়ারিং পড়তে এলি কেন?

“হেমে বলি, সুরেশ, তুইও কিছু খার্ড-ডিভিসনে ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে হারান্ন সেকেন্ডারি পান করিস নি, এই মাটিকাটা কুলি হবার জন্যে তুইই বা মিডিল এঞ্জিনিয়ারিং পড়তে এসেছিলি কেন?”

“সুরেশ হানে। একটা চারমিনার সিগারেট ধরান্ন, বলে, চার্জ অব দ্য লাইট বিগ্রেট কবিতাটা মনে আছে? কোন শালা সেনাপতি মেরে বোঁকে কি হকুম দিয়ে বসল, আর ছ’শ সৈনিক কামানের মুখে ছাতু হয়ে গেল! মারো গুলি!

এসবটা বেদনাদায়ক, তার মোড় কেরাবার জন্য বলি, ও কথা বাক, আচ্ছা এই ক্যাকটারীর কোনও এক্সটেনসন হবে? আজ না হ’ক ডব্লিউতে কিছু হবার আশা আছে?

: খোল এবং নলচে ছুটি বদল না হলে নয়।

: তার মানে ?

এ এক বিচিত্র ব্যাপার রে কৌশিক। এমন অদ্ভুত ব্যবস্থা কি করে চলে ভাবতে গেলে অবাক হতে হয়। এই ফলতা ত্রিক ফ্যাক্টোরিতে সরকারের একটি বিভাগ যে ইট তৈরী করছেন, তা বাজারের সাধারণ ইটের তুলনার সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ। এর ভারবাহী ক্ষমতা বেশী, এতে মশলা লাগে কম, এতে লোনা ধরার সম্ভাবনা কম, এর ব্রেকজ নেই বললেই চলে। এ সত্য সবাই মেনে নিয়েছেন, সরকারের সমস্ত এজিনিয়ারিং সংস্থা থেকে বড়কর্তারা এসে দেখে গেছেন ফ্যাক্টরী, এবং সবাই তা স্বীকার করেছেন। অথচ আমাদের এ কারবারে লোকসান হচ্ছে, তার কারণ কেউ এ ইট কিনছে না। সবচেয়ে মজার কথা সরকারী কাজেই এ ইট ব্যবহৃত হচ্ছে না। তার কারণ যেসব সরকারী বিভাগ ইট ক্রয় করেন, তাঁদের কারও গরজ নেই এই প্রকল্পটি সার্থক করে-তুলতে। বিভিন্ন বিভাগের বিভিন্ন কর্তা। তাই সরকারের একটি বিভাগ পাহাড় প্রমাণ উৎকৃষ্ট ইটের স্থূণ বিক্রি করতে না পেরে লোকসান গুনছেন, এবং অপর সব কয়টি বিভাগ বাজার থেকে নিকৃষ্টতর ইট খরিদ করে প্রাইভেট সেক্টরকে মদৎ বোগাচ্ছেন! সাধ করে কি আর সেকেন্দার শাহ' বলেছিল : সত্য সেলুকাস, কী বিচিত্র এই দেশ! মারো গুলি!

ফলতা ইট-ভাঁটার চাকরি আমার হয়নি। ডবু একটা নতুন জিনিস দেখে এলাম। সুরেশ নাগ, বি. ই. সি-ই দৈনিক আড়াই টাকা হারে মাটি-কাটা-কুলির লেজারে নাম লিখিয়েছে! এ দিনের অভিজ্ঞতার আর একটি নগদ লাভ কবিতার খাতায় একটি নূতন সংবোজন। কবিতাটির নাম :
 $২৩ \times ৫৩ \times ২৩$!

“চেন কি আমারে? বন্ধু যে আমি তোমাদেরই কবরে
ওদের সোধ ভিত্তির মূলে আপন অস্থি দিছি ডেট,
দলে দলে মোরা শারিত হয়েছি, নেমেছি সোপানে সোপানে,
সে সোপান বাহি, ওরা সারি সারি উঠেছে উধা' উজানে।
পথের তলার ধূলা বালি মাথা আমাদের শব শারিত
ওরা পীচ ঢেলে গড়েছে কবর, রেখেছে লুকায়িত।
লব্ধ চরণ বন্ধে-নিত্য আঁকিছে পুরকার,
প্রিয় কবরেত! পারনা চিনিতে হুংবের গাথা কার?”

তুমিও তো ভাই মোদেরই মতন মরেছ,
অদল কেটে আজাদীর পথ গড়েছ,
সে পথে আজ কি পারছ মোটর চালাতে ?
মরেছ তো পড়ে পথের সোলিঃ তলাতে ।
মোদেরই মতন পড়ে আছ ভাই নিচুতে,
তবুও আমার পারনা চিনিতে কিছুতে ?

ছেলেবেলা পাতেয়ায় কি যে ছাপ এঁকে যায়
সেই ছাপ নিয়ে ডালে কাটে নিশিদিন,
পোড়া কপালের গুনে পুড়িয়াছি কী আগুনে
জলে পুড়ে মাটি-মন হয়েছে কঠিন !
এই ধরণীর বুকে শুয়েছিলাম মোরা স্নেহে
এক হয়ে ছিলাম সব, নাই ভেদাভেদ,
ওরা কোদালের ঘাস কেড়ে নিয়ে চলে যায়
কাঠের খাঁচার ফেলে, হানে বিচ্ছেদ ।
ওদের খেরালমত যরি মোরা শত শত
ভাঁটার আগুনে দেহ জলে পুড়ে যায়,
কখনও খেরাল হ'লে মাথার উপরে তোলে
কখনও চুবায়ে রাখে চৌবাচ্ছায় ।
তারপরে আমাদের ঝামা আর আমা-দের
তফাতে সরিয়ে দেখি স্ট্যাকে নিয়ে যায়
খুশিমত পড়ে তবু খেরাল হইলে প্রভু
হেঁটে ছুটে নেয় ফের বাঙলির ঘাস ।
ভিত ছাদ যে যেখানে ঠাই পেলে মানে মানে
পড়ে থাক সেইখানে সারাটি জীবন,
আজীবন কারাবাস, নাই মুক্তির আশ,
নাই ভিলেকের ঠাই পরিবর্তন ।

তুমিও তো ভাই মোদেরই মতন বন্দী
অত্যাচারিত লম্বা ব্যবহার ;

এঁটেছ-কি কতু পালাবার কোন কবি
 কারাগার ভেদে মুক্ত আবহাওয়ার ?
 হুংখের গাথা শুনে তো আমাদের
 শোন চুপি চুপি মুক্তির কথাটাও
 দেখ কমরেড ! এতে যদি তোমাদের
 মুক্তি পথের সন্ধান কিছু পাও ।

মা জননী আজও ভাই সন্ডানে ভোলে নাই
 ভোলে নাই মাহুকের নীচ অত্যাচার
 হুনিভূতে কন্দনে গুমুরিয়ে মরে মনে
 মনে পড়ে কেড়ে নেওয়া সন্ডানে তার ।
 জানি মোরা একদিন বন্ধন হবে কীণ
 আকাশে উঠিবে মা'র আর্ত নিনাদ ;
 জননী হু-কম্পনে টেনে নেবে জনে জনে
 টুটে যাবে অচলায়তন এই বীধ !
 সব বাধা হবে গত ছুটে যাব শত শত
 ধরণী মায়ের কোলে আমরা আবার
 ধ্বংসের পানে চেয়ে বোকা হবে সবচেয়ে
 নক্সাটি হাতে লয়ে যুঁচ বাস্তকার ॥”

নিঃসন্দেহে বেকার এগ্রিনিয়ার কবি কৌশিক মিত্রের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন
 হচ্ছে । তার কবিমানসের বিবর্তন লক্ষণীয় । কুলি-খাণ্ডার আখের রসের
 সঙ্গে নররক্তের সংমিশ্রণ দেখে যে কবির রোমান্সের মোহ ভাঙেনি, মিরামং-
 বিজার শিল্পী-সস্তার অবমাননার যে তাকে শেলী-দাস্তের ইউটোপিয়ান স্বর্ণ-
 লোকে ঠেলে তুলে দিয়ে কর্তব্য সম্পাদন করেছিল, ধর্মিক-গৃহস্থায়ীর কাছে
 কস্তাধরপা বর্ডান-বাংলোটিকে উৎসর্গ করে গ্রামযুগে বাড়ি করে এসেছিল, সে
 আজ ইটের স্ট্যাকগুলোকে কখে দাঁড়াতে বলছে । রোমান্টিক-কবি এতদিনে
 ২৩" × ৪৩" × ২৩" আকারের একখানি কবিতা খানইটের বত হুঁকে মারতে
 চেষ্টাচ্ছে এই সমাজ-ব্যবহার মাথা লক্ষ্য করে । তার রোমান্সের স্বপ্ন
 ছুটে গেছে । তা সত্ত্বেও একটা জিনিস আরি লক্ষ্য না করে পারিনি ।
 তবু একটা কিছু রয়ে গেল । কথাটা এই যে কবি কৌশিক এখনও ঠিকমত

পথের লঙ্ঘান পারিনি। সমস্তা সবচেয়ে সে সচেতন, শব্দর ঠিকমত পরিচরও সে পেয়েছে, এমন কি তার এই কবিতার সে 'কবরেড' শব্দটা একাধিকবার ব্যবহার করেছে, তবু আমার মনে হয়েছে—নিজের শক্তির প্রকৃত উৎসটার লঙ্ঘান সে পারিনি। একতার মধ্যে, সংহতির মধ্যে সে যুক্তি যন্ত্রের লঙ্ঘান করেনি—এখনও সে দৈব নির্ভর। সে আশা করে আছে বাইরে থেকে আসবে তার সাহায্য। কবে কুমিকম্পে যা জননী এ অচলারতম ভেঙ্গে কেমনে সেই আশাতেই দিন গুনছে তার বন্দী দল। আত্মসচেতনার মধ্যে নর, আত্মবিশ্বাসে নর; তার যুক্তিময় বেন বিদেশ থেকে পাকা ফলটির মত তার হাতে এসে পৌছাবে। রাশিয়া থেকে? না কি চীন থেকে?

॥ আট ॥

যমুরকেতনের গাড়িটা বেরিয়ে বাবার পর স্নাত্তা ধীরে ধীরে বারান্দা থেকে ফিরে আসে। বসে গিয়ে নিজের ঘরে। অভ্যস্ত ক্লান্ত লাগছে তার। কিছুই ভাল লাগছে না। কী দ্রুত বদলে যাচ্ছে তার ভাগ্যটা, কী অভূত পরিবর্তন। বাল্য আর কৈশোর তার কেটেছে একটি অনাথআশ্রমে। সেখান থেকে নেহাৎ খেরাল বশে তাকে তুলে এনেছিলেন ডাক্তার চট্টোপাধ্যায়। কল্যাণে বরণ করেছিলেন তাকে। কল্যায় যর্ষাদাও দিয়েছিলেন, ভালবাসাও। সেও প্রাণভরে ভালবেসেছিল ঐ আধা-পাগল বৈজ্ঞানিককে। প্রথম প্রথম তার অভূত লাগত, পরে বুঝেছিল এটাই স্বাভাবিক। জিনিয়াস যাত্রাই পাগল। তগবান এক হাতে দিলে অস্ত্র হাতে কেড়ে নেন? যুগান্তকারী আবিষ্কার যে করে সে তোমার-আমার মতো স্বাভাবিক নর। অগাধ বিশ্বাস ছিল তাঁর স্নাত্তার উপর। আমা-কাপড় টাকা-পয়সা কমা-খরচ সবই স্নাত্তা করত। উপার্জন বা করতেন, না শুনেই ঘরের হাতে তুলে দিতেন, আবার বখশ প্রয়োজন হত তার কাছেই এসে হাত পাড়তেন। শুধু একটি বিষয়ে তিনি মেয়েকেও বিশ্বাস করেন নি। না, কথাটা বোধহয় ঠিক হলো। এ ঠিক বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা নয়। তোমার অতি আপদজনক বহি তার অপের বীজময় তোমাকে না আমার তবে কি তুমি বলবে যে সে তোমাকে

বিশ্বাস করেন? তা তো নয়। বাপিও যে তাঁর আবিষ্কারের হুকুমখাটা
 তার কাছ থেকে গোপন রেখেছিলেন তার পিছনে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের
 প্রশ্ন নেই। এ মনস্তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকদের কাছে অনিখিত আইন,
 অসম্মান্য নির্দেশ। তাই তো আরও অবাক হয়ে বার হুজাতা। এমন
 মানুষের কাছ থেকে কেমন করে সেটা আদায় করল ময়ুরকেতন? অথচ
 আদায় যে করেছে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণও আগরওয়ারাল দিয়েছে। হাতে
 নাতে সেই হলো-রক্ত ভৈরী করিয়েছে ময়ুরকেতন, অত সত্যার না হলোও
 প্রায় ঐ দামে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে তার ভারবাহী কবচাও যথেষ্ট
 এবং তাতে প্রয়োজনীয় সিমেন্টের মাত্র অর্ধেক দেওয়া হচ্ছে। আগরওয়ারাল
 দাবী করেছেন যুতার পূর্বেই ডাক্তার চ্যাটার্জি তাঁকে যৌথিক জানিয়ে
 ছিলেন রাসায়নিক পদার্থটার নাম, তার পরিমাণ। আগরওয়ারাল বৈজ্ঞানিক
 নন, তাই সবটা বুঝতে পারেন নি, তা পারলে তিনি এখনই গিয়ে এটার
 পেটেন্ট নিতেন। বতটুকু তিনি জানেন ততটুকু তিনি হুজাতাকে জানাতেও
 রাজি আছেন, একটি মাত্র সর্তে। বিনিময়ে হুজাতা যদি ডাঃ চ্যাটার্জির
 রিসার্চের কাগজগুলো তাঁর হাতে তুলে দেয়। এ আবিষ্কারকে বন্ধ কাইলের
 অঙ্কগুহার কেনে রাখলে কারও কোন লাভ নেই। হুজাতার পক্ষে ও
 রিপোর্ট পড়ে তার পাঠোদ্ধার করা অসম্ভব, বস্তুত সেটা আগরওয়ারালের
 পক্ষেও সম্ভবপর নয়। এর একমাত্র সমাধান যদি হুকুমে যৌথভাবে চেষ্টা
 করে দেখে। আগরওয়ারাল ব্যবসার দিকটা দেখবে, হুজাতা দেখবে
 এ্যাডমিনিস্ট্রেশান, এবং হুকুমের অঙ্গুমোদিত কোন বিশেষজ্ঞকে দিয়ে ঐ হুকুমখা
 রিসার্চ কাগজগুলোর পাঠোদ্ধার করতে হবে। সেই বিশেষজ্ঞকেও দিতে
 হবে মোটা অর্থ। তা আগরওয়ারাল দিতে রাজি আছে। আর তারপর
 যে কারবার খোলা হবে তাতে হুজাতার থাকবে লাভের অর্ধাংশের অধিকার।
 বস্তুত লেখাপড়া না হওয়া সত্ত্বেও আগরওয়ারাল বর্তমানে তাই দিয়ে চলেছেন
 তাকে।

হুজাতাই বরং এ ব্যবহার রাজি হতে পারেনি। পররাজিও হয়নি।
 সে ভেবে দেখার সময় চেয়েছে শুধু। সত্যি কথাটা এই যে সে আজও
 আগরওয়ারালকে বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না। সাধারণ বুদ্ধিতে তার
 মনে হয়েছে এগ্রিমেন্টখানা আগে রেজিষ্ট্রি হওয়া উচিত, তারপর কাগজগুলো
 সে তুলে দিতে পারে আগরওয়ারালের হাতে। এ খেলার তার হাতে আছে

একটি বাড়ি রঙের টেকা। ঐ একটা পিঠই তুলতে পারে সে, বিপদ
যতই শক্তিমানে হকনা কেন। সেই একারি-বাণ সে অবধি ব্যর্থ হতে দিতে
পারেনা। রঙের টেকা আগেই যদি পেড়ে খেলে আর পিঠ তোলার আশা
নেই তার! আর সে এটি পাবেনা।

বনোয়ারিলাল এসে দাঁড়ায়, বলে, ম্যানেজারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন
নতুন ড্রাইভারকে কোথায় থাকতে দেওয়া হবে।

: ম্যানেজারবাবু কোথায়?

: নীচে অফিস ঘরে।

: বল, আমি আসছি।

নীচে অফিস ঘরে নেমে এসে দেখে নকুলবাবু তাঁর নির্দিষ্ট চেয়ারে
বসে কাজ করছেন। বছর পঞ্চাশ বরষ ভদ্রলোকের। কীণজীবী চেহারা,
মাথার সামনের দিকে টাক। সেই টাক ঢাকবার একটা ব্যর্থ প্রচেষ্টা
তিনি করেন পিছনের লম্বা চুলগুলোকে চিরুনির উজান টানে সামনের
দিকে টেনে এনে। চোখে নিকেলের চশমা। ক্ষুদ্রকার মালুখটি তাঁর পৌরুষ
রক্ষা করতেই বোধকরি একজোড়া বোখাই গোঁফ রেখেছেন। সর্বদা গলাবন্ধ
কোট পরে থাকেন, তছপরি গলায় একটি রঙ-বেরঙের বিচিত্র উল্লের
কম্পটর। স্বজাতাকে দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। হাত তুলে নমস্কার
করেন। এই অতি বিনয় একেবারে সহ্য হয়না স্বজাতার; কিন্তু ম্যানেজার
নকুল হই সর্বদাই বিনয়াবনত। প্রতিদিনই সকালবেলা একবার এভাবে হাত
তুলে নমস্কার করবেন তিনি।

নকুলবাবুর সামনে দাঁড়িয়ে আছে সেই ড্রাইভারটা। এও দেখি এক
বিনয়ের অবতার। গুরুত্বপূর্ণ মত হাত দুটি জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে।
এবার আর স্বজাতা চোখ তুলে তাকায় না তার দিকে। নিজের ঘরের
দিকে পা বাড়ায়। বাবার সময় নকুলবাবুকে বলে বার, ওকে আমার
ঘরে পাঠিয়ে দিন।

নিজের চেয়ারে গিয়ে বসেছে কি বসেনি লোকটা এসে দাঁড়ায়।

তার দিকে তাকিয়েই স্বজাতা একটা ধমক লাগায়, অমন হাত জোড়
করে আছি কেন? তুমি কি কোন অপরাধ করেছ?

লোকটা খতমত খেয়ে যায়। কোনক্রমে বাড়টা চুলকে বলে, আজ
না, তা নয়, হাজার হোক আপনারা অসহ্যাতা!

কেমন বেশ বিজি আগে স্বজাতার।

: বাড়ি কোথায় তোমার ?

: আজ্ঞে হাবড়া, গুমা হাবড়া, আমরা রিকু:

: রিকু ? ও রিকুজি ! ও কথা ভুলে যাও। বিশ বছর আগে রিকুজি ছিলে হয়তো, এখন আর ও পরিচয় দিওনা।

: আজ্ঞে না ! অভ্যস্ত কুণ্ঠিত হয়ে লোকটা সার দেয়।

স্বজাতা একবার আপাদমস্তক লোকটাকে দেখে নেয়। বেশ সপ্রতিভ হৃদয় চেহারা। বয়সে ওর চেয়ে বছর চার পাঁচের বড়ই হ'বে, অথচ দারিদ্ৰ্যের তাড়নার মেরুদণ্ড বলে লোকটার আর কিছু নেই।

: কে কে আছেন দেশের বাড়িতে ?

: আজ্ঞে, বাবা আছেন শুধু।

: সব কথার 'আজ্ঞে' বলছ কেন ?

: আজ্ঞে, আর বলব না !

স্বজাতা হেসে ফেলে। বুঝতে পারে এ রোগ ওর শোধরাবার নয়। একে লেখাপড়া শেখেনি, তার নিরবিস্তার ঘরে মাহুয হয়েছে, ইনফির্মিটি কমপ্লেক্স ওর মজার মজার।

মাইনে পত্র কি পাবে তা কথা হয়েছে আগরওয়ালার সঙ্গে ?

আজ্ঞে ইয়া। আপাতত পকাশ করে দেবেন, তবে কাজে খুশি করতে পারলে নিশ্চই বাড়িয়ে দেবেন। আর বলেছেন খাওয়া থাকা ফ্রি। তাই বনোয়ারিটাকে শুধাচ্ছিলাম, কোথায় থাকব আমি, তা তিনি—

বাধা দিয়ে স্বজাতা বলে, বনোয়ারিলাল তোমার দাদা হ'ল কোন সুবাদে ?

: আজ্ঞে কী যে বলেন ! উনি আমার চেয়ে বয়সে বড়, চাকরিভেঙে সিনিয়র।

: সিনিয়র ? তুমি ইংরাজি জান ? লেখাপড়া কতদূর শিখেছ ?

বিশ ছাইভার মজা পার। আবার বাড়টা চুমকায়। বাড় চুমকাযোটা বোধহয় ওর সুবাদে। বলে, কী যে বলেন তার ! পড়াশুনা আবার করলাম কবে, তবে শুনে শুনে হু'একটা মব্ব আমে ফেনেছি।

স্বজাতা এবার আর হাসেনা। লেখাপড়া কতদূর করেছে লোকটা

ডুইতার খোলাখুলি জানার নি, কিন্তু তার বেওয়ার জানই প্রমাণ করে আগরওয়ার ঠিকই বলেছেন, ডি-এইচ মরেল ওর কাছে গ্রীক ! আগরওয়ারের অলীক রসিকতাটার মর্যোদ্ধার করার কয়তা কোনকালেই হবেনা বিশ্বনাথ দাসের !

কয়েক সেকেন্ডে সূজাতা জবাব দেয় না। সে একটু অকৃতমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। ছেলেটাকে দেখলে মনে হয় ভদ্রবরের, সুন্দর স্বাস্থ্য, সুগঠিত শরীর—চেহারাও বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জল ; কিন্তু ওর সব গুণ ঢাকা পড়ে গেছে একটিমাত্র দোষে—দারিদ্র্য। অর্থাভাবেই সে লেখাপড়া শিখতে পারেনি, এবং তারই ফলে চিরদিনের মত ওর যেকোনওটা বঁকা হ'য়ে রইল। বনোয়ারিলালের সঙ্গে দাদা-ভাই সম্পর্ক পাতিয়ে হতভাগা চাকরিটা টিকিয়ে রাখার চেষ্টার আছে।

বনোয়ারিলালকে ডেকে সূজাতা বলে গ্যারেজের উপর যে যেজানাইন ঘরটা আছে সেটা বিক্রি দেখিয়ে দিতে। ওখানেই সে থাকবে। আরও বলে ইন্দির সর্দারকে জানিয়ে দিতে যে বিত্ত ডুইতার এখানেই ছু-বেলা থাকবে।

বনোয়ারিলাল বিস্মকে ডেকে নিরে বেরিয়ে যায়। ঘর দেখাতে নিরে যায়।

সূজাতা কাগজপত্র নাড়াচাড়া করতে থাকে। অফিসে বসাই সার। বসন্ত কোন কাজ নেই তার। দশবারোজন কর্মী এখন ঐ হলো-রক তৈরী করে। তার হিসাবপত্র সূজাতাকে রাখতে দেন না আগরওয়ার। এ বিষয়ে সূজাতারও কোন অহুযোগ নেই। সে জানে রিসার্চ কাগজগুলো বতদিন সে গোপন রাখবে ততদিন আগরওয়ারও তাকে জানতে দেবেন না, কি ভাবে তিনি ওগুলো তৈরী করছেন। সেটাই তো স্বাভাবিক !

বহবার বেকথা চিন্তা করে কোন কুলকিনারা পারনি আজও তাই বসে বসে ভাবতে থাকে। সে দিনের পরিস্থিতিটা আর একবার তলিয়ে দেখে। জীমুতবাহনের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ওয়া এসে আশ্রয়ের সন্ধান করেছিল ময়ূরকেতব আগরওয়ারের কাছে।

লহানিষ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য আগরওয়ার ভনেছিল বিরূতাপ উদাসীন-তার। বলেছিল, আপনি বা বলছেন তার ভিতর আমি সুগাভকারী সন্ধাননা দেখতে পাচ্ছি। আমি আপনাকে সাহায্য করতে রাজি ; কিন্তু আপনার স্বার্থেই বলব নবার আগে আপনার উচিত হবে আধিকারটা আপনার নিজের মাঝে

পেটেন্ট নেওয়া। তার পরেই আইনত সেটার উপর আপনার অধিকার জন্মাবে, এবং তখনই আমি আপনার সঙ্গে ব্যবসায়িক চুক্তির কথা চিন্তা করতে পারি।

হুজাতা একটু অবাক হয়েছিল। লোকটার কণ্ঠস্বরেই শুধু নয়, তার আন্তরিকতার কিছুটা যুগ্ম হয়েছিল। কিন্তু সে কিছু বলবার আগেই মহাশিব বলেছিলেন, কিন্তু মিস্টার আগরওয়াল, গিটার-ব্লক যেভাবে আমি জমিয়েছি তাতে বুঝতে পারছি ইটের বিকল্প নয়, এ পরীক্ষা চালিয়ে গেলে আমি নিশ্চেষ্টের বিকল্পও আবিষ্কার করতে পারব। আমার পরীক্ষা শেষ না হলে তো আমি পেটেন্ট নেব না।

আগরওয়াল গভীরভাবে বলেছিলেন, আমি আপনার সঙ্গে একমত হতে পারছি না ডক্টর চ্যাটার্জি। যেটুকু আপনার অধিকারে এসেছে সেটুকুই আপনি পেটেন্ট নিন। হাতের পাখিটাই বনের পাখি জোড়ার চেয়ে বেশী মূল্যবান।

হুজাতা বলে, কিন্তু যেটুকু ভেবেছেন সেটুকু যে উনি এখন গোপন রাখতে চান। বাপির ইচ্ছা আরও কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে যাওয়া। কিন্তু উনি টাকার ঠেকে যাচ্ছেন।

: বেশ, তবে তাই হোক। টাকার অভাব যাতে না হয় সেটা আমি দেখব। আমি কিছু অগ্রিম দেব।

: কী মর্মে? প্রশ্ন করেছিল হুজাতা।

: বিনা মর্মে। ডাক্তার সাহেবকে আমি জায়গা দিচ্ছি, বাসস্থান দিচ্ছি, মালমশলা কিনে দিচ্ছি, আগাবও দেব। আপনি নিজ অতিক্রমিত অঙ্গুলারে পরীক্ষা চালিয়ে যান, সকল হলে নিজ নামে পেটেন্ট নেবেন। তারপর আমার সঙ্গে ব্যবসায়িক চুক্তি করবেন।

হুজাতা বলে, হ্যাঁ নোটো ধার দেবেন?

আগরওয়াল দৃঢ়স্বরে বলেন, না! কোন লেখাপড়া হবে না। আপনার গবেষণা যেখানে হবে সেখানে আমি নিজেও বাবনা, আমার কোন লোকও তার ত্রিসীমানার বাবে না। আপনি সাক্ষ্যসাক্ষ্য করার পর আমাকে খবর পাঠাবেন। তখন আসব আমি।

তবুও সন্দেহ ঘোচে না হুজাতার। বলে, এভাবে নিঃস্বার্থ সাহায্য করার অর্থ।

: নিঃস্বার্থ কে বলল ? ব্যবসায় খানিকটা রিস্ক নিতেই হয় । আগরওয়াল ইতোমধ্যেই পকে বিশ পঁচিশ হাজার টাকা পরীক্ষার ব্যয় করাটা কিছু নয় । আমি নিশ্চয়ই মনে মনে আশা করছি সাকল্যালাভ করলে ডক্টর চ্যাটার্জি আমার সঙ্গেই সর্বপ্রথম চুক্তিবদ্ধ হতে চাইবেন । আমার সঙ্গে টার্মেনা বনলে তিনি স্বচ্ছন্দে অন্তত কথাবার্তা বলতে পারবেন ।

এর পরেও সূজাতা বলেছিল একেবারে বিনা গ্যারান্টিতে এমনভাবে স্বার্থ বিনিয়োগ করতে কোনও ব্যবসায়ী রাজি হতে পারেন, তা ভাবিনি ।

আগরওয়াল হেসে বলেছিল, ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আপনার ধারণাটা খুব উচু নয় দেখছি ।

তধু সদাশিব নয়, সূজাতাও এরপর নিশ্চিত মনে খুশি হয়ে উঠতে পেরেছিল ।

আগরওয়াল ওদের চুজনকে এনে তুলেছিল এই কারখানায় । নিজের গাড়ি করে । সদাশিব পরদিন থেকেই কাজে নেমে গিয়েছিলেন । তাঁর আদেশ মত এল ঘেঁস বা সিগার, বালি আরও কত কি রাসায়নিক পদার্থ । আগরওয়ালের নির্দেশে এল ইন্দির সর্দার তার মাস্তাজীকুলির দল বসিয়ে, তাঁরই নির্দেশে কারখানার ঐ অংশটা কাটা তারের বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলা হল । সিমেন্ট আর লোহার কারবারে যারা কাজ করত তাদের সরিয়ে আনা হল এগারে ।

একেবারে নিশ্চিত কাজ করবার সুযোগ পেয়েছিলেন বুদ্ধ বৈজ্ঞানিক । আগরওয়াল তাঁর অন্ত একটা ছোট ফিরাট গাড়িও পাঠিয়ে দিয়েছিলেন । সদাশিব নিজেই ড্রাইভ করতেন সেটা । এখানে ওখানে যেতেন, কখনও ঘেরেকে নিয়ে বৈকালিক ভ্রমণেও । সূজাতা সংসারের দিকটা দেখত । রান্না করার তার পড়ল ইন্দিরের উপর, লোকটা পাকা রাঁধুনি । ঘরের কাজ কর্ম করত বনোয়ারি । বস্তুত সদাশিবকে স্বচ্ছন্দভাবে পরীক্ষা চালিয়ে বাবার পূর্ণ সুযোগ দিয়েছিলেন মন্থরকেতন ।

এবং সে সুযোগের পূর্ণ সদ্যবহার করতে পেরেছিলেন সদাশিব । দিন যশেকের ভিতরেই তিনি আগরওয়ালকে খবর পাঠিয়েছিলেন যে তাঁর সিগার-ব্রকের পরীক্ষা সম্পূর্ণ সাকল্যালাভ করেছে । শতকরা পঞ্চাশভাগ সিমেন্ট ব্যবহার করেছে তাঁর সেই ‘চ্যাটার্জি-ব্রক’ ইটের চেয়ে বেশী ভারসহ, লতা অঞ্চল হাক্কা হয়েছে ! সেহিসকার কথা সূজাতা কোনদিন ভুলতে পারবে না ।

বুঝ বৈজ্ঞানিক সেদিন বেন শিল্পের মত খুশীমান হয়ে উঠেছিলেন। এত খুশী হতে সে কখনও দেখেনি বাপিকে।

সংবাদপ্রাপ্তি মাত্র আগরওয়াল এসে হাজির হলেন। একা নয়, সঙ্গে এসেন তাঁর একজন নিকট আত্মীয়, দীপচাঁদ আগরওয়াল—ময়ূরকেতনের ভাইপো। আগরওয়াল ইণ্ডাস্ট্রিসের বোম্বাইয়ের চীফ কেমিস্ট। এ্যাম্বার্সেড কেমিস্ট্রিতে এম. এন্সি পাশ করেছে সে।

ময়ূরকেতন খুব খুশী হয়েছেন, এ কথা নিঃসন্দেহ; কিন্তু বাস্তব তিনি সেরকম কোন উচ্ছ্বাস দেখালেন না। প্রাথমিক অভিনন্দন জানিয়ে ডাঃ চ্যাটার্জিকে বলেন, আমি নিশ্চিত জানতাম আপনি সাকল্যলাভ করবেনই, তাই আমার ভাইপোকেও নিয়ে এসেছি, দীপচাঁদ আগরওয়াল, আর ইনিই সেই বিখ্যাত আবিষ্কারক ডাঃ মহাশিব চ্যাটার্জি। ইনি যিস্ হুজাতা!

দীপচাঁদ করমর্দন করেন না, যুক্তকর কপালে ছুঁইয়ে নমস্কার করে।

কথা হচ্ছিল নিচের অফিস ঘরে। হুজাতা বলে ওঠে, এবার কি ভাবে এটাকে বাস্তবরূপ দেওয়া যায় বলুন।

আগরওয়াল একটা চুকটে অগ্নি সংযোগ করছিলেন, বলেন, সেইজন্যই দীপুকে নিয়ে এসেছি। আমরা তো ওসব বুঝব না, ও এ্যাম্বার্সেড কেমিস্ট্রির লোক, ইতিপূর্বে আমাদের বোম্বে ফ্যাক্টোরিটা ইন্সটল করেছে। ও ওসব জানে। কিন্তু ম্যাগফ্যাকচারিং ফেলে এটা তৈরী করার আগে একটা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি ফ্লোট করতে হয়—

হুজাতাই আবার বলে—আপনি তার একটা খসড়া করুন।

বাধা দিতে ময়ূরকেতন বলে ওঠে—না হুজাতা দেবী! এখনও তার সময় হয়নি। আমাদের আর একটি প্রধান কর্তব্য বাকি রয়েছে। আমি সেকথা আগেও বলেছি, আপনারা ভুলে গেছেন। বর্তমান নাভট্টর চ্যাটার্জি এ আবিষ্কারের পেটেন্ট নিজের নামে নিচ্ছেন ততক্ষণ আমি তাঁর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে চাই না। হুতরাং সেটাই আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য। পেটেন্ট নিতে হলে বেনব কাগজপত্র, প্রোফর্ম্যা ভর্তি করতে হবে সে সব কাগজও আমি নিয়ে এসেছি। আপনি আগে সেগুলো ফিল-আপ করুন। আমার টাইপিষ্টকে পাঠিয়ে দিচ্ছি—

মহাশিব বলেন, টাইপিষ্ট লাগবে না, একটা মেশিন পেলেই হবে। আমি নিজেই টাইপ করে নেব।

—সে তো আরও ভাল কথা।

দীপটায় বলে ওঠে—ডক্টর চ্যাটার্জি আপনার আবিষ্কারের মূল সিক্রেটটুকু বাব দিবে ঘোঁটাঘুটি ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে যদি কিছু বুঝিয়ে বলেন—

এর চেয়ে আনন্দদায়ক কাজ মহাশিবের কাছে আর কিছু নেই। উনি তখনই সবিস্তারে বলতে থাকেন তাঁর আবিষ্কারের কথা—

এদেশে বাড়ি তৈরীর কাজে ইট একটা অনিবার্য উপাদান। ইটের বিকল্প হিসাবে সিগার-ব্রক বহুদিন অব্যক্ত বাজারে চলছে। কিন্তু সিগার ব্রকের খরচ ইটের সমান সমান হওয়ার ইটের বিকল্প হিসাবে সে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে না। এই সিগার-ব্রকগুলির ভিতরটা ফাঁপা। ফলে এর ওজন ইটের চেয়ে কম। এগুলি সিগার বা ঘেঁসের সঙ্গে সিমেন্ট মিশিয়ে তৈরী করা হয়। হাঁচে ঢালাই করে ছ'খানি অর্ধেক ফাঁপা ব্রক আবার ঐ সিমেন্টের সাহায্যেই জোড়া লাগানো হয়। গোটা ব্রকটার ভিতরটা থাকে ফাঁপা, তাই এর অপর নাম হলো-ব্রক। প্রকৃতপক্ষে সিগার-ব্রক তৈরীর কাজে সিমেন্টই একমাত্র মূল্যবান উপাদান। যেখানে বালি সস্তা এবং সিগার বা ঘেঁষ কোন কারখানার অপ্রয়োজনীয় বাই এড়াই হিসাবে বস্ত্রত বিনামূল্যে পাওয়া যাচ্ছে সেখানে এই ধরনের সিগারকে তৈরীর অর্ধেকের উপর খরচ পড়ে সিমেন্ট ব্যবদ। মহাশিব এমন একটি ক্যাটার্জিস্ট আবিষ্কার করেছেন যার উপস্থিতিতে অল্প একটি অত্যন্ত সহজলভ্য রশ্মির মাধ্যমে সিমেন্ট ব্যতিরেকেই ঐ দুটি আধখানা ব্রককে জমিয়ে দিতে পারছেন। মনে করুন এই বিত্তীয় উপাদানটা স্বেচ্ছা-গন্ডামাটি। এখন মহাশিব এমন একটি ক্যাটার্জিস্টিক-এজেন্টের সন্ধান পেয়েছেন যার উপস্থিতিতে বিশেষ প্রতিক্রিয়ার ঐ গন্ডামাটিই সিমেন্টের মত জোড় লাগাতে সক্ষম হচ্ছে। ফলে সিগার-ব্রকের নির্মাণব্যয় বহুভাংশে কমে যাচ্ছে। মহাশিবের হিসাবমত এতে গৃহনির্মাণের খরচ প্রায় টাকার ছ'খানা কমে যাবে।

দীপটায় বলে, টাকার মাত্র ছ'খানা ?

মহাশিব বেশ বেহনাহত হয়ে পড়েন, বলেন, এটা কি বলছেন আপনি ? টাকার ছ'খানা কম হল ? তার মানে সাড়ে বারো পারসেন্ট। যদি ধরা যায় পশ্চিম বাঙলার সারা বছরে বস্ত ইটের গাঁথনির কাজ হচ্ছে তার মূল্যমান আট কোটি টাকা, তাহলে, একমাত্র বাঙলা দেশেই এ অল্প এক কোটি টাকার আতীর লক্ষ্য হতে পারে। সারা ভারতবর্ষের স্ট্যান্ডার্ডের ধরনে—

দীপটান্ন বাধা দিবে বলে, নান্না ভারতবর্ষে যেখানে বড় ইটের গাঁথনি হচ্ছে তার সবই তো আমরা আমাদের এই চ্যাটার্জি-ব্লক দিয়ে রিয়েল করতে পারব না—

: করেই! তেরি করেই! খুব ভাষা কথা! সেজন্য অতটা আমরা হিসাবে ধরব না। বস্তুত প্রথমাবস্থায় গোটা বাড়ি দেশের কথাও আমরা বাহ দেব। আমি বরং বলব যদি বৃহত্তর কোলকাতায়—

আগরওয়াল ঠিক খামিরে দিয়ে বলে, ওদের কথার আপনি কান দেবেন না ডঃ চ্যাটার্জি। ওরা কী জানে? কী বোঝে? কেয়িট্রি জানে, তা নিয়ে কথা বলুক, ব্যবসায়ের ওরা কী বুঝবে? আপনি আমার কথার জবাব দিন। আপনি বলছিলেন, আপনার হলো-ব্লক ইটের চেয়ে হালকা হবে। অথচ তারবাহী কমতা হবে বেশী। লেন্ডেড্রো ডেড ওয়েট করে বাওয়ার আপনার চ্যাটার্জি-ব্লক ব্যবহার করলে প্রতিটি বাড়ির বনিয়াদ কম লাগবে, বীল, কলম স্ন্যাব সবেরই সাপ কম যাবে। প্রচুর পরিমাণে সিমেন্ট ও লোহা বাঁচবে। নয় কি?

: নিশ্চয়ই!

: আপনার টাকার দু'আনা হিসাবে কি সেটাও ধরেছেন?

একেবারে লাকিরে ওঠেন বৈজ্ঞানিক, আপনি ঠিকই ধরেছেন! সেই কথাই বলতে চাইছিলাম আমি। সে সব এখনও আমি হিসাবে ধরিনি। ইটের দাম ইস্ টু ব্লকের দাম ধরেই লাঞ্চে বারো পালেন্ট বলেছি আমি। সেসব ধরলে, জাস্ট এ মিনিট, এখনই একটা স্ট্যাণ্ডার্ড তিনতলা বাড়ি ধরে এটিমেট করে দেখি। কিন্তু তিনতলাই বা কেন ক্রেয়ড স্ট্রাকচার বাল্টি স্টোরিড বাড়িতে বোধহয় আরও—

সদাশিব উঠে পড়েছিলেন চেয়ার ছেড়ে। ময়ুরকেশনই তাঁকে আবার হাত ধরে বসিয়ে দেন। বলেন, সে হিসাব করতে যথেষ্ট সময় লাগবে আপনার। তাছাড়া ওকাজ আপনার নয়। আমরা বাইনে করা এডমিনিস্ট্রার দিয়ে যেসব হিসাব করা। আপনার প্রধান এবং একমাত্র কাজ হচ্ছে হির মস্তিকে আপনার আবিষ্কারটা লিখে দেয়া। সেটা কি শুধু আপনার মগজের মধ্যেই আছে; না কাগজ পড়ে কিছু কিছু লিখে রেখেছেন?

সদাশিব হেসে বলেন, কিছু কিছু অবশ্য অইডাউন করা আছে। তবে আমি ছাড়া আর কেউ তার পার্টোকার করতে পারবেনা। না, আপনি

ঠিকই বলেছেন। সর্বপ্রথমে একটা রিপোর্ট লিখে ফেলতে হবে। বিস্তারিত রিপোর্ট।

: শুধু রিপোর্ট নয়, ঐ সঙ্গে আপনার ফর্মুলাটা। কি কি উপাদান দিচ্ছেন, কি প্রপোর্শন, কি ক্যাটালিস্ট, কত টেম্পারেচারে—

: জানি, জানি মশাই! সারেনটিকিক রিপোর্ট কিভাবে লিখতে হয় তা আমাকে শেখাতে আসবেন না। আমি জার্মানিতে রিসার্চ প্রফেসর ছিলাম। আপনি এখনই একটা টাইপরাইটার পাঠিয়ে দিন, কিছু কার্বন আর কয়েক দ্বিগুণ কাগজ। আর ইয়া, খানকতক গ্রাফ পেপার।

: কত সময় লাগবে আপনার ?

: আজ রাত্রেই মধ্যেই তৈরী হয়ে যাবে। কাল সকালেই আপনার গাড়িতে আমরা কলকাতা যাব। পেটেন্টটা সবার আগে নিতে হবে, তারপর গজানান করে ফিরে আসব এখানে, কি বলিস স্ত ?

গজানান! ইয়া হঠাৎ গজানানের কথাই বলেছিলেন বিলেত ফেরত বিলাতী-কেতার যাহুবটি! তা সেই গজানান তার পরের দিন ঠিকই করেছিলেন সদাশিব চট্টোপাধ্যায়। পেটেন্টটা অবশ্য নেওয়া হয়নি।

আশ্চর্য ঘটনা পরম্পরা!

সমস্ত রাত্রি ধরে আলো জেলে কাজ করে ছিলেন সদাশিব। পরদিনই অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়েন তিনি। সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস বলেই অনুমান করেছিলেন হানীর ডাক্তার সান্তাল। ছাব্বিশ ঘণ্টা বেঁচে ছিলেন তারপর। আগরওয়াল চেষ্টার ফ্রুটি করেনি; কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না।

গজাতীরের অশানে শেষ হয়ে গেল সদাশিব চট্টোপাধ্যায়ের আবিষ্কারের স্বপ্ন!

কাঁটার কাঁটার এগারোটার সময় জাহাজীর হোটেলের ছশ' এগারো নম্বর হাইটে টেলিফোনটা বেজে উঠল। আগরওয়াল এতদ হয়েই ছিল, রিসিভারটা তুলে নিতেই তনতে গেল রিসেপ্শনিস্টের যিহি কণ্ঠ : আপনার সঙ্গে একজন ডক্টর লোক দেখা করতে চাইছেন ; নাম বলছেন না—বলছেন, এ্যাপয়েন্টমেন্ট করাই আছে !

—ক্রেককাট দাড়িআলা ডক্টর লোক ?

—ইয়েস, উইথ এ্যান এ্যাবিসাস্ পেয়ার অব্ মোস্টাসেস্ ইনটু দি বারগেন।

—সেও হিম আপ্ ডার্লিং !

এ হোটেলের ঐ সুন্দরী এ্যাংলো রিসেপ্শনিস্টের সঙ্গে আগরওয়ালের একটি হৃদয়ঙ্গম সম্পর্ক আছে। হয়তো সেই কারণেই কলকাতার আর পাঁচটা খানদানি হোটেলের ভিতর এইখানেই তার হারী আস্তানা। জাহাজীর হোটেলের এই ছশ' এগারো নম্বর হাইটটা তাঁর মাসিক হিসাবে ভাড়া নেওয়া। এ ঘরের চার দেওয়ালের যদি প্রবলশক্তি থাকত তাহলে অনেক রোমাঞ্চকর সংবাদ সে শোনাতে পারত অগতকে। আগরওয়ালের সঙ্গে এ ঘরের ঐ শব্দ্যার সে অনেক অভিসারিকাকেই ততে দেখেছে ; এবং গৃহস্থায়ীর ব্যবস্থাপনার শহরের অনেক খনামধন্য ব্যক্তিকেও ঐ ভাবে এখানে কণিক সূখের সন্ধানে অভিসারী হতে দেখেছে। দেখেছে বড় বড় অর্ডার আর পারফিটের হাত-কের, দেখেছে অনেক কালো টাকার সেন বেন। কিন্তু জাহাজীর হোটেলের ঐ ছশ' এগারো নম্বর হাইটের দেওয়ালের কান সেই। গোপন খবরগুলো প্রাপ্তিকে ইমানসান পেইন্ট্-এ প্রতিহত হয়ে কিরে আসে শু।

নক করতে হলনা ডক্টর আলিকে। তার খুলেই রেখেছিল আগরওয়াল।

: মনিং ডক্টর। বি সীটেড গ্রীস।

ডাক্তার আলি কোলিও ব্যাগটা টেবিলের উপর রেখে এলিয়ে পড়েন একটা কোচে, ডিনকোনা একটা ডানমোপিলো কুশন টেবিলে নিয়ে আরাম

করে বলেন। কিন্তু খুলে আগরওয়ালা বার করে আনে কচ, মোড়া আর পানপাড়া। টানা দুয়ার থেকে উদ্ধার করে আনে এক মোট লবণাক্ত কাঁকড়াহাট। উভয়েই পানপাড়া তুলে নিয়ে প্রাথমিক মানে মানে ঠেকিয়ে বলেন—
চিরায়।

আরাম করে বসলেও আলিসাহেব মুখে একটা ব্যস্ততার ভাব বাজার রেখে-
ছিলেন। গভীরকণ্ঠে বলেন—মিষ্টার আগরওয়ালা, আজকের এ এ্যাপরেন্ট-
মেন্ট আপনি করেছেন। আমার সময় অল্প। একটার সময় আমার জরুরী
পার্ট মিটিং আছে। তার আগে একবার রাইটার্স বিল্ডিংস্ যেতে হবে। আমি
আধঘণ্টা সময় আপনাকে দিতে পারি। নিন শুরু করুন।

ঐ দুটি কুঁচকে ওঠে আগরওয়ালের। পরক্ষণেই সেটা মিলিয়ে যায়। ধীরে
হুহু পকেট থেকে একটা সিগার-কেস বার করে তিনি মোটা একটা চুরুট
ধরাতে ধরাতে বলেন, আরাম সো সরি ডক্টর আলি। আমি তুলে
গিরাছিলাম আপনি অভ্যস্ত ব্যস্ত মানুষ। আমি ভেবেছিলাম আজকের এ
আলোচনার ব্যাপারে আমার চেয়ে আপনার আগ্রহটাই বেশী। গতকাল
টেলিফোনে কথা বলার সময় ঐ রকম একটা ভ্রান্ত ধারণা আমার হয়েছিল।
কী আপলোনের কথা! বাক আমাদের দুজনেরই তুল হয়েছে, এবং সেটা
আমরা দুজনেই বুঝতে পেরেছি। আপনি কাজের মানুষ, বেশীকণ আপনাকে
অটকাবো না। পাঁচটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমরা বরং আজকের
আবহাওয়ার কথাটা আলোচনা করতে পারি, কি বলেন?

ডক্টর আলিও একটি চুরুট তুলে নেন, হুহু হেসে বলেন দর বাড়াচ্ছেন?

: দর! তোবা, তোবা! কী যে বলেন! আমার আবার বাজার দর
আছে নাকি?

: আছে! ইলেকসানের বাজারে প্রতিটি ভোটায়েরই একটা বাজার দর
থাকে। আপনার দরটা অবশ্য ভোটায় হিসাবে নয়, ভোট ব্যবসায়ের হোলসেল
ভিলায় হিসাবে।

যেন খুশী হয়ে উঠলেন আগরওয়ালা, বলেন খুব নতুন কথা শোনালেন বা
হ'ক। তা নিজের বাজার দরটা আগে ভেবে নিই, তারপর দরদায়ে নামব।
কি দামে বর্তমানে বিকোচ্ছি আমি?

আলি সাহেবও হেসে বলেন, আমার নির্বাচন এলাকার নতুনকেডন
আগরওয়ালের বর্তমান বাজারদর 'সাত পরবার'। তা কিনবার আমার সামর্থ্য

নেই, সে হয় বাটাই করতেও আনি নি আমি; তবে আপনার যৌল এগুটার জ্বায়ে আমি স্বীকার করতে বাধ্য বে, আজকের এ আলোচনার জন্য আমরা দুজনেই সমান আগ্রহান্বিত ছিলাম।

: কিন্তু সেটাও তো যৌল এগু নর আলি-সাহেব, যৌল এগু হয়ে আপনার সময়ের অভাব। আপনার হাতে বে সময় যাত্র আধঘন্টা!

: বেশ তো, আপনি শুরু করুন—না হয় পরবর্তী এ্যাপয়েন্টমেন্টগুলো পেছিয়ে দেওয়া যাবে। এটাও তো শুরুতর কাজ! এখন বলুন, কী-মতে আপনি আমাকে সাপোর্ট করতে রাজি হবেন।

: বেশ, শুরু করছি। প্রথমেই আমি বলে রাখতে চাই, নীতিগতভাবে আমি আপনাকে সাপোর্ট করিনা, করব না। আমি এমিটারিয়েট হলকৃত্ত নই;—আপনারাের এ সব ধর্মঘট, বিকোভ আর বেরাও-এর থিরোরিতে আমার সহায়কৃতি তো নেইই, একটা নকারজনক বিববিমা আছে। এই হাইপথেসিসটা-যেনে নিরে আমরা আলোচনা করব কিন্তু—

বাধা দি রে ডক্টর আলি বলে ওঠেন, কিন্তু এই হাইপথেসিস যেনে নিলে আপনার সঙ্গে আমার এ আলোচনার তো কোন অর্থ ই হয় না। আমাদের শোষণহীন সমাজ ব্যবহার ম্যানিকেষ্টো যদি আপনি না যেনে যেন—

ঠক করে হাসটা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে আগরওয়ারাল বলেন—দ্রীন ডক্টর আলি! এখানে আপনার জনগণও নেই, প্রেস রিপোর্টাররাও নেই। নেহাৎ আপনি আর আমি। ও সব কেতাবী বুকনি এখানে ঝাড়বেন না। শোষণহীন সমাজ ব্যবহা! যাই কুট!

হঠাৎ মুখটা লাল হয়ে ওঠে আলি সাহেবের। তিনিও সমান জোরে ঠক করে নামিয়ে রাখেন যদের পাজটা, বলেন, হোয়াট ড্যানু যীন! আমার ক্রীত নিরে এমন ভাষা ব্যবহার করার মানে?

: কী আশ্চর্য! আপনি কি সুখোসটা খুলে রেখে আলোচনা করবেন না। কিসের ক্রীত যশাই? আপনি কি এমিটারিয়েট হলের প্রতিদ্ব? আপনি বছরে বিশ থেকে পঁচিশ হাজার টাকা ইনকামট্যার যেন এ খবর কে না জানে? শোষণ হীন সমাজ ব্যবহা কারেন করতে হলে আপনার নিজের কি হাল হয় তা কি ভেবে দেখেছেন? ভারতবর্ষের প্রতিটি জনগণের গড় আয়ের সঙ্গে আপনার রোজগারের কি সম্পর্ক তা কি খতিরে দেখেন-নি কোনদিন? হুতরাং আপনাকে যেনে নিজেই হবে বে ক্রীত হিসাবে নয়, পলিনি হিসাবে আপনাকে আর ই

বিশ্বক শিবিরে মাথা বিকোতে হয়েছে। আসলে আপনার ধমনীতেও বইছে
আমার রক্ত নীল বুর্জোয়া রক্ত। না, না, আপনি উত্তেজিত হবেন না, এ সোজা
কথাটা মেনে না নিলে এ আলোচনার কোন অর্থই হয় না। একটু ভেবে
দেখুন না আপনি আজ ক্যাপিটালিস্ট ময়ূরকেতন আগরওয়ালের সঙ্গে নির্বাচনী
আন্তাত করতে জাহাজীর হোটলে হাজির হয়েছেন, এ কি আপনার শোষণ-
চীন সমাজ ব্যবস্থার ক্রীড়ার অন্ত ? না কি ইলেকশন জেতার অন্ত ?

: আপনি কি আমাকে এখানে ডেকে এনেছেন কতকগুলো কটু কথা
শোনাবেন বলে ?

: হুতাপ্য আমার ! কথাটা আপনাকে বোঝাতে পারছি না। এগুলো
যোটেই কটু কথা নয় আলী-সাহেব, এগুলো নির্ভেজাল সত্য কথা। তৃতীয়
ব্যক্তির উপস্থিতিতে হ্যাঁ নিশ্চয়ই এগুলো কটু কথা হত, অপমানকর কথা হত।
কিন্তু এখবের মধ্যে আমরা একেবারে খোলাখুলি কথা বলব বলেই তো এসেছি !
প্যাণ্টের ভেতর কে আর স্কাটো নয় মশাই ? শাক দিয়ে যে লোকটার কাছে
মাহ টাকা দিতে চাইছেন সেই পরম বৈক্য যে নিজেরই মালপোয়া দিয়ে মূর্গীর
ঠ্যাং টাকা দিচ্ছে ! আর নেহাৎ যদি আপনার মনে হয় আপনাকে কটু কথা
বলেছি, তাহলে আপনিও বলুন—ওহে আগরওয়াল, তুমি একটি বুর্জোয়া কুল-
কলঙ্ক ! তুমি তলে তলে হাত মেলাতে চাইছ বুর্জোয়া বিরোধী প্রলিটারিয়েট
জনের সঙ্গে ! আমি রাগ করব না। হেসে বলব, আমি যে কলঙ্কিনী রাই পো !

ইতিমধ্যে হুপাজ রঙিন পানীর আলি সাহেবের উদরজাত হওয়ার তাঁর
বুঁড়ি খুলেছে দেখা গেল। হে হে করে খানিক হেসে নিয়ে বলেন,
অলরাইট অলরাইট !

আগরওয়াল বলে, তাশ বখন আমরা ছুজনের কেউই লুকাবো না হির হল
তখন খোলাখুলি কথা বলাই ভাল। তাতে সময়ও সংক্ষেপ হবে। যে কথা
বলছিলাম, আমার ধমনীতে নির্ভেজাল নীল রক্ত, তাই আমি আপনাদের ঐ
লাজলোমায়ে বিশ্বাস নেই। তবু আপনাকে এ নির্বাচনে গোপনে সাহায্য করতে
প্রস্তুত। বিনিময়ে আপনি কি দিতে পারেন বলুন ?

: আপনি কি চান, তাই আগে শুনি।

: তিনটি জিনিস চাই। এক নব্বয়, কথা দিন, আপনারা যদি গদি পান
তাহলে আমার পিছনে লাগবেন না ; দু-নব্বয় গদি পান না পান, আমার
আগরওয়াল কেমিক্যালস্ ক্যাকটারির সুনিয়াম যে সড়ের দকা দাবী দিয়েছে

সেটা তুলে নেবেন এবং তিন নম্বর যদি পান না পান, গণেশদত্তকে আমার এলাকা থেকে সরিয়ে নিতে হবে।

একটু ভেবে নিরে আলি সাহেব বলেন, আপনার প্রথম দুটি সর্ভ হারডো মেনে নেওয়া চমতে পারে কিন্তু তৃতীয় সর্ভটা মেনে নেওয়া অসম্ভব। গণেশ ঐ এলাকার অবিসংবাদিত প্রমিক নেতা।

: পাটি ইচ্ছা করলেই তাকে সমূলে উৎপাটিত করে অন্য কোন ভাগ্যবানের স্বর্ণলঙ্কার আগুন জ্বালাতে পাঠাতে পারে।

: লঙ্কা কাণ্ড করা গণেশের কাজ নয় মি: আগরওয়াল! সে প্রমিক স্বার্থে কাজ করে।

: সে কথা আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করবেন না আলি সাহেব! আপনি বিধর্মী, আপনার চেয়ে রামায়ণ আমার ভাল করে পড়া আছে। আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেব এখনও ত্রিসঙ্গা তুঙ্গসীদাসজী পাঠ করে থাকেন। আমি নিশ্চিত জানি, ও বেটা গণেশ নয়, ও হল গোদ বজ্রজবলী! গণেশ হলে তার অমর্যাদা আমার হাতে হত না, মাথার করে রাখতাম যতদিন না উন্টে যায়, কিন্তু—

বাধা দিবে আলি বলেন, রসিকতা থাক, কিন্তু পাটি ওর মত একজন যোগ্য প্রমিক নেতাকে হঠাৎ তার কর্মক্ষেত্র থেকে সরিয়ে রাজি হবে কেন বলুন?

: কারণ, আমি আপনাকে নির্বাচনে সাহায্য করছি। আয়াস নষ্ট ব্যাপিং, কিন্তু আপনি নিশ্চয় জানেন, আমি আমার কলটিটুয়েন্টিতে আপনাকে জিতিয়ে দিতে পারি, আবার মহাপাত্রকেও জিতিয়ে দিতে পারি। এ্যাসেম্ব্লির একটা সীট বস্তুত নির্ভর করছে আমার নমিনেশনে। সাত পরজার না হলেও একটা পরজার আমাকে তো দেবেন?

: আপনি ডব্লু-ক্রপিং করবেন না তার গ্যারাণ্টি কি?

: এটা কি ছেনে মাহুযের মত কথা বললেন ডক্টর আলি? আমি তো বশাই আগেই আমার ট্রান্স কার্ড পেড়ে লীড দিছি। আমি তো আগেই আপনাকে জিতিয়ে দিছি। আপনিই বরং পরে এই নির্জন ঘরে দেওয়া মৌখিক প্রতিশ্রুতি ভুল করতে পারেন।

আলি সাহেব ছেনে বলেন, ধরুন তাই যদি করি?

আগরওয়ালও ছানে, বলে, মরুরকেতন আগরওয়ালকে আপনি চেনেন, এটাই আমার গ্যারাণ্টি! শুধু এ্যাসেম্ব্লির মেম্বর নয়, তার চেয়ে উচ্চতর কোন

গদ্বিতে বসেও কেউ যদি ময়ূরকেতনের সঙ্গে ডব্লু ক্রসিং করে তার কি হান হবে তা আপনি আন্দাজ করতে পারেন, এটাই আমার ভরসা !

: আপনি কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন ?

শত্রুকে ভয় দেখিয়ে সাবধান করে দেব এত বড় মূর্খ আমি নই। সুতরাং হয় আপনাকে ভয় দেখাচ্ছি না, নয় শত্রু বলে আপনাকে আমি মনে করি না।

আবার একপাত্র ঢেলে নিয়ে আলি সাহেব বলেন, একটা কথা। হঠাৎ আপনি মহাপাত্রকে ছেড়ে এভাবে আমাকে কেন সাহায্য করতে চাইছেন, তা বলবেন ?

: আলবৎ ! আজ তো দুজনেই খোলাখুলি কথা বলব স্থির হয়েছে। আমি বরাবর মহাপাত্রকে সাপোর্ট করছি, তাঁর সাপোর্টও পেয়েছি। এবারও তাঁকে জিতিয়ে দেবার ক্ষমতা আমি রাখি। কিন্তু আমার আশঙ্কা হয়েছে মহাপাত্র জিতলেও এদার ওরা মেজরিটি হতে পারবেন না, সরকার গঠন করবেন আপনারা। তাই ঝড়ের আগেই আমি নৌকা সাইলাম। সোজা কথা !

: বুঝলাম। তাহলে আমাকে খোলাখুলি সাপোর্ট করছেন না কেন ?

: কারণ আপনারাই যে মেজরিটি হবেন এটা আমি নিশ্চিত জানিনা। কোয়ালিফাইড মন্ত্রী হতে পারে। যে আলিসাহেব আজ শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থার জন্য কুড়ীরাশ সংবরণ করতে পারছেন না এবং মহাপাত্রকে বুর্জোয়া দলভুক্ত মনে করছেন, সেদিন হয়তো দেখব তিনিই রাজ্যপালের কাছে আর দশজনের সঙ্গে মিলিয়ে দরখাস্ত পাঠিয়েছেন ও-কোর্টে গিয়ে খেলবার জন্য !

: কী যা তা বলছেন আপনি !

: যা তা কথা নয় আলিসাহেব, যথার্থ কথা। অমন চমকে ওঠারও কিছু নেই, লজ্জা পাবারও কিছু নেই। এ খেলা আগেও অনেক খেলেছেন, প্রয়োজন বোধে আপনিও খেলবেন। সে অধিকার পবিত্র সংবিধান আপনাকে দিয়েছে ! ভয় নেই। ফলে আমাকেও ছ নৌকায় পা-দিয়ে চলতে হচ্ছে।

: কিন্তু আমি কেরন করে বুঝব যে আপনি সত্যিই আমাকে সাপোর্ট করলেন ? তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাব কি করে ?

: কিছু কিছু প্রমাণ আপনি এখনই পাবেন। বাকিটা জানবেন ব্যালট বাক্স খোলা হলে। আপনি রিটানর্ড না হলে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার কোন দায় আপনার থাকবেনা—

হঠাৎ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে আলি সাহেব বলেন—মনে থাকবে ? আপনি এইমাত্র যা বললেন, তার অর্থ হল আমি রিটানর্ড না হয়েও যদি আমরা সরকার গঠন করি তাহলে আমার প্রতিশ্রুতি রাখার কোন দায় থাকবে না ! আপনি গোপনে সাপোর্ট করলেও !

আগরওয়াল হেসে বলেন, আই সে হোয়াট আই মীন, এ্যাণ্ড আই মীন, হোয়াট আই সে ! হ্যা, মনে থাকবে ! তাই বলেছি আমি ।

: আই একসেন্ট ! —হাতটা বাড়িয়ে দেন আলি সাহেব ।

হাতটা গ্রহণ করে আগরওয়াল বলেন সাবজেক্ট টু ওয়ান কন্ডিশান্ !

হাতটা টেনে নিয়ে আলি বলেন, আবার কি সর্ত ?

: কিছু মনে করবেন না আলি সাহেব । যে পার্টির নির্দেশে গণেশকে সরানো সম্ভবপর আপনি সে পার্টির লোক নন । নির্বাচনী আঁতাতে তাদের দলভুক্ত হয়েছেন মাত্র । পার্টির তরফে প্রতিশ্রুতি দেবার অধিকার আপনার নেই । আপনাদের দলপতিকেও এ ভাবে মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিতে হবে আমাকে । সে কথা এ ঘরেও হতে পারে, তাঁর শুধানেও আমি যেতে পারি । আপনাদের যা অভিরুচি ।

আলি বলেন, এই কথা ? তাঁর সঙ্গে কথা বলেই আমি এনেছি আপনার কাছে । আমি এখনই টেলিফোনে আপনার সঙ্গে তাঁর কথা বলিয়ে দিচ্ছি ।

হাতটা তিনি বাড়িয়ে দেন টেলিফোনটার দিকে । তাঁর হাতখানা চেপে ধরে আগরওয়াল বলেন, অত উত্তেজিত হবেন না আলি সাহেব । এখান থেকে টেলিফোন করা চলবে না । এটা খানদানী হোটেল । প্রতিটি কলের নাখার একটা লেজারে তোলা থাকে । এ সুইচ আমার নামে পার্মানেন্টলি বুক করা । আর যে নম্বরটা আপনি ডায়াল করতে যাচ্ছেন সেটা বড় মার্কা মারী । এখান থেকে নয় ।

: আপনার যেমন অভিরুচি । বেশ, আমি এখনই আপনার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ করিয়ে দিচ্ছি । চলুন ।

: চলুন ।

উঠে পড়েন আগরওয়াল । ওয়ান্ডো থেকে টাইটা বার করে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গলার দড়ি দিতে দিতে বলেন, ভাল কথা, শনিবার বিকালে কাছারী ময়দানে আপনাদের ইলেকশান মিটিং আছে না ?

: হ্যা আছে, কেন বলুন তো ?

: কটায় মিটিং ?

: বিকাল চারটেয় ।

: ওটা পিছিয়ে দিন । না, না, তারিখ ঠিকই আছে । সময়টা পিছিয়ে দিন শুধু । মিটিং শুরু করুন সাড়ে পাঁচটায় । আর সাজেসানটা যে আমার সেটা দয়া করে ভুলে যান ।

: কেন বলুন তো ? কি ব্যাপার ?

: বিকাল সওয়া চারটে থেকে কাছারী মাঠের উন্টোদিকে কলেজ মাঠে ফাইনাল খেলা হবে । আপনার মিটিং ভেঙে লোক খেলা দেখতে ছুটে আসবে তার চেয়ে ঠিক সাড়ে পাঁচটায় মিটিংটা শুরু করুন । খেলা ভেঙে গেলে লোকগুলো যখন মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে আসবে ঠিক তখনই যদি মাঠকে আপনারা প্লোগান-মিউসিক ককুটেল বাজতে থাকে তাহলে অকর্মী মানুষগুলো হুড় হুড় করে ঢুকে পড়বে কাছারী মাঠে ।

আলিসাহেব বলেন, প্লোগান-মিউসিক-ককুটেল মানে ?

আগরওয়ালের টাই বাঁধা হয়ে গিয়েছিল । হাঙ্গার থেকে কোর্টটা নিয়ে গায়ে চড়াতে চড়াতে ঘুরে দাঁড়ান, বলেন, মশাই আমি রাজনীতি করিনা, ও বস্তুটাকে আপনারা পলিটিক্সের পরিভাষায় কী নামে অভিহিত করা হয় আমি জানি না । কিন্তু যেখানেই নির্বাচনী মিটিং হয়, দেখি মাইকে হিম্মিগান এবং সমবেত কণ্ঠে প্লোগান পর্যায়ক্রমে চলতে থাকে । গানগুলি এক টঙের, শুধু প্লোগান শুনে বুঝতে পারি কারা চিন্তাচ্ছেন । এক পক্ষের বাঁধা গৎ 'নইলে গদি ছাড়তে হবে—সারে লাম্বা লা' অপর পক্ষের অমুঠানহুচী-‘চীনের দালাল নিপাত যাক ইপি-ইপি ইয়া-ইয়া-ইয়া ।’ আপনারা একে কী নামে অভিহিত করেন জানিনা, আমরা মানে নীলরঙের বুজোয়া কুল এর নাম দিয়েছি প্লোগান-মিউসিক-ককুটেল !

পবিত্র ক্রীড়ার প্রতি অসম্মানহুচক কথা বলায় আলি সাহেব যতটা বিচক্ক হয়েছিলেন পবিত্র প্লোগানের প্রতি এই রসিকতার কিন্তু ততটা মর্মান্বিত হলেন না । তিনি হো-হো করে হেসে ওঠেন, বলেন, বেশ আছেন মশাই আপনারা !

বোধকরি ইতিমধ্যে বেঁটে বোতলটা শূন্যগর্ত হয়ে গিয়েছিল বলেই তাঁর এ বহান্নতা ।

ঘর বন্ধ করে বেরিয়ে আসছিলেন আগরওয়াল হঠাৎ বেজে উঠল টেলিফোনটা । সেটা ভুলে নিয়ে আগরওয়াল ও প্রান্তের কণ্ঠস্বর করেক মুহূর্ত

জেন নিয়ে বলেন, যু মে বি অফ্ ডিউটি নাউ, বাট আশ্বাস নট। সরি...ইয়েস,
বাই টেন পি. এম...বাঈ, বাঈ।

॥ দশ ॥

কবি কৌশিক তার দিনপঞ্জিকায় লিখছে :

ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছিলাম মেসার্স...কোম্পানিতে। বিরাট এজ্ঞানস্রাবিং
কার্ম। কোটি কোটি টাকার কাজ করেন বছরে। ত্রিজন কন্সট্রাকসনেই এঁদের
বিশেষত্ব। নেপাল বর্ডারের কাছে বৃষ্টি কতকগুলো নতুন কাজ হবে, তারজন্ত
ওরা কষ্টেদহিষ্ণু কিছু নতুন মিডিল এঞ্জিনিয়ার খুঁজছেন। পবরের কাগজের
বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে চাকরি সম্পূর্ণ অস্থায়ী। আপাতত ছয়মাসের জন্ত।
অবশ্য এ কথাও বলা হয়েছে যে যোগাতামুসারে কিছু লোককে স্থায়ীভাবে
রেখে দেবার সম্ভাবনাও আছে। তবু আমার মত দুই'শ সাইক্লিশ জন বেকার
এঞ্জিনিয়ার দরখাস্ত করেছে নেপালের তরাই অঞ্চলে যাবার জন্ত।

ক'লকাতা থেকে অনতিদূরে কোম্পানির একটি ফ্যাকটরি আছে। ষ্টিল-
ফ্যাব্রিকেশন হয় সেখানে। সেখানেই যেতে হল। বিজ্ঞপিতে বলা ছিল যে
প্রার্থীকে নিম্ন বায়ে উপস্থিত হতে হবে। অগত্যা শেষ দু টাকার নোট খানা
ভাঙিয়ে বাসের টিকিট কাটলাম।

এসে দেখি আমার আগেই অনেকে এসে উপস্থিত। খান কয় বেকি
কতৃপক্ষ পেতে দিয়েছেন; কিন্তু তাতে এতগুলি ভাগ্যান্বেষীর স্থান সঙ্কলান
হবার কথা নয়! তিন দিন ধরে নাকি চলছে এই কাগরার। বসবার জায়গা
নেই, কখনও ডান পায়ে কখনও বা পায়ে ভর দিয়ে মাড়োঁ নটা থেকে ঘড়ির
কাঁটা ছুটোকে একটার ঘরে পৌছাতে দেখলাম। ছুঁতগ্য আমার, আমার নব্বর
পৌছানোর আগেই লাক আওয়ার্সের বিরতি হল। মিলেকসন বোর্ডের সদস্যদ্বন্দ্ব
খানায় বেরিয়ে গেলেন। আমার মত বেকার মানুষের খাবার উপযুক্ত
লোকান ওপাড়ার নজরে পড়ল না। পকেট হাতড়ে দেখি এখনও বা আছে
তাতে কিঞ্চিৎ সুরিবুত্তির চেষ্টা করা যেতে পারে। দু-আনার কাল চান্না কেনা
গেল, দশ নয়া পয়সা দিয়ে এক কালি কাটা পশাও অমৃতের খাদ এনে দিল।

মাস্তা সেয়ে পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে একটা কাঁচি সিগারেট কিনব কি কিনব না ভাবছি হঠাৎ বাঁচ করে এসে দাঁড়ালো একখানা এ্যাংসাডার।

: কৌশিক! তুই এখানে? কি করছিস?

: বাজেট এন্টিমেট করছি! দেখছি, কলকাতা ফেরার ভাড়া বাদ রাখলে একটা সিগারেট কেনা যায় কিনা। কিন্তু তুমি এসে পড়লে, কিনলে এখন দুটো সিগ্রেট কিনতে হয়, সুতরাং এন্টিমেট বাস্ট করে গেল কিশোরদা!

হো-হো করে হেসে উঠল কিশোরদা, বললে, খুব হয়েছে, উঠে আস, আমার কাছে সিগ্রেট আছে।

কিশোর ডালমিয়া চমৎকার বাড়ী বলে। আমাদের একবছরের সিনিয়র। অবশ্য মাঝে একবছর ফেল করায় আমার সঙ্গে একই বছরে পাশ করেছে। বড় লোকের ছেলে, চক্চকে চেহারা, পোষাক আমাদের একটা জোলুঘ, তা হ'ক, দিলু তার চিরদিনই দরাজ। বললাম, আমার যে এখন ইন্টারভিউ আছে কিশোরদা।

: আরে সে-পব শুরু হতে এখনও একঘণ্টা। উঠে আস লিগ্‌গির!

অগত্যা উঠে বসি তার কক্‌ককে গাড়িতে, ড্রাইভারের সীটের পাশে। পকেট থেকে স্মৃশ্চ একটা সিগারেট-কেস বার করে খুলে ধরল আমার সামনে, নিজেও ধরালো একটা। ওঃ! কতদিন পরে গোল্ড-ফ্লেক পেলাম! কী মোলায়েম আমেজ! এঁকে বেকে গাড়িটা এসে থামল একটা রেস্তোরাঁর সামনে। কিশোরদা আমাকে নিয়ে বসালো একটা কোনার, খাবারের অর্ডার দিল; বললে, এখানে ইন্টারভিউ দিতে এসেছিস কেন মরতে? নেপাল যাণি?

: নেপাল নয়, নেপাল বড়ার!

: ও একই কথা। তা সে বাই হোক এ চাকরি তোর হবে না।

: হবেনা কেমন ক'রে বুঝলে? হ'তেও তো পারে।

: যাক ও কথা। এখন ওসব কথা তোকে শোনাও না। এতদূর যখন এসেছিস ইন্টারভিউটা দিয়ে মনের সাধ মেটা। তারপর ভিতরের গ্যাড়াকলের কথা বলব এখন। আমি ঐ সামনের অফিসটার থাকব, ঐ পরেটিং করা লাল বাড়িটার। ফেরার পথে তোকে পৌছে দেব।

কিশোরদা ভাগ্যবান। তাকে চাকরি খুঁজতে হয়নি। চাকরিই বরং ওর জন্ত পাঁচবছর প্রতীক্ষা করে বসেছিল। ওর বাবার মন্ত ঠিকাদারী আছে। রেলওয়ে পি. ডাব্‌ফার্মডি এবং সি. পি. ডাব্লু ডির নামকরা কন্ট্রাকটর।

তাই দেখা শোনা করছে। এখানে এসেছে একটা বিলের পেয়েই নিতে।
বললে, স্বজন আর শচীনন্দন জব ডাউটার নিয়ে বিলেত চলে গেছে, অনেকদিন ?
: অনেকদিন।

: স্বরেন, রবি আর সুবিমল তিন হতভাগার মিলে একটা কার্য খুলেছে,
কাজ ধরতে পারেনি কোন। ক্রমাগত টেওয়ার দিচ্ছে চলেছে।

: জানি !

: সবই জানিস্ দেখছি ! এ জুতো জোড়ার দাম কত জানিস্ ?

জুতো সমেত ঠ্যাঙখানা সে বাড়িয়ে ধরে। এ অপ্রাদিক্ষিক প্রস্তাবের কি
জবাব দেব ভাবছি, কিশোরদা তার আগেই বলে : এ জুতো কেনার একটা
ভারি মজার ইতিহাস আছে ! ফাইনাল পরীক্ষায় আমার সীট পড়েছিল মতু
লাহিড়ীর ঠিক পিছনেই। শালা একটুও হেল্প করেনি আমাকে। পরীক্ষার
হলে যেন আমাকে চিনতেই পারছিল না ! পিছন থেকে কলমের খোঁচা
মারতে কপে উঠে বললে, অমন করলে আমি কিছু গার্ডকে বলে দেব
কিশোরদা ! শালা, আমার উপর টেকা দেবে ? পরীক্ষার পর বললাম, কিরে
মতু হলের মধ্যে তুই আমাকে চিনতে পারছিলি না নাকি ? তা বললে,
পরীক্ষার হলে না চেনাই তো স্বাভাবিক !

আমি বাধা দিয়ে বলি, হঠাৎ এসব কথা কেন বলছ কিশোরদা ?

: শোন তো শেষ পর্যন্ত ! বুধবার দিন লিওনেস স্ট্রিটের বাটার দোকানে
জুতো কিনতে গিয়ে দেখি শ্রীমান মতু একটি যুবতী তরীর ঠ্যাঙখানা কোলে
তুলে নিয়ে স্নিগার পরাচ্ছেন ! ও শালা যে বাটার দোকানে সেলসম্যান হয়েছে
তা আমি জানতুম না, বুঝেছি। শালা আমায় দেখতে পারনি। যেই আমার
দিকে ফিরেছে ঠ্যাঙটা ওর কোলে তুলে দিয়ে বললুম : দেখুন তো এই মাপের
এ্যাংগাডার জুতো আছে কিনা ! শালার মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল। মুখে
কিছু বললে না। আমার ঠ্যাঙখানা নামিয়ে দিয়ে জুতো নিয়ে এল। আমি
ছোড়নেওয়ালো নই। শোধ তুলে ছাড়ব। বললুম পরিচয় দিন, ফিতে বেঁধে
দিন। তুই শালা আমাকে পরীক্ষার হলে চিনতে পারিস না, আমিই বা কেন
তোকে জুতোর দোকানে চিনতে বাব ?

আমার কেমন যেন অত্যন্ত খারাপ লাগল। মতুটার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব
পতীর ছিল। লাক্ক মুখচোরা ভাল ছেলে। পড়াশুনা নিয়ে থাকত।
সাংস্কৃতিক প্রকৃতির, একটু গুলো গুলো বাস্তবিক ছিল। হস্টেলের ঐ পরিবেশেও

সে সন্ধ্যা বেলা অফিস করত। আমরা তাকে বিরক্ত করতাম, এবং সে চটুত না বলে নিজেরাই বিরক্ত হতাম। একটু সূচিবায়ুও ছিল। দোকানে খেতে পারত না। অচেনা অজানা লোকের হাতের রাগা তার মুখে কচত না। গোড়া ব্রাহ্মণ পরিবারের ছেলে আরকি! ভাগ্যের ফেরে সে আজ জাত বেড়াতে লোকের পায়ে জুতো পরায়! প্রসঙ্গটা বদলাবার জন্য বলি, শিবুর খবর জান?

: কে শিবু পালোয়ান? শিবেটা কম্পাউণ্ডারি করছে। আর সবচেয়ে মজার খবর সুরেশ নাগিনের। তার লেটেস্ট খবর জানিস?

: জানি বইকি; সে ফলতার ব্রিক-ফিল্ডে চাকরি করছে। দৈনিক আড়াই টাকা হারে। সেটা তোমার কাছে ‘মজার খবর’ মনে হল কেন কিশোরদা?

: তুই চাই জানিস। নাগিন এখন হাজতে। কগনিজেল অফেন্স। ‘বেল’ পায়নি, আর জামিন দাঁড়াবেই বা কে বল?

: বল কি? সুরেশ নাগ বিচারাধীন আসামী? কি চার্জ তার বিরুদ্ধে?

: সে অনেক ব্যাপার! পরে বলব, ঐ শালা ম্যাকফারসনের গাড়ি ফিরে এল। আমি যাই, পেমেন্টটা আজই নিতে হবে। কাল ফাষ্ট আওয়ারে স্লিয়ারিং না পেলে মুশকিল হবে। চলি ভাই! ঐ যাঃ; খাবারের দামটা দেওয়া হয়নি—

কিশোরদা উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, বেয়ারাটাকে এ দিকে ওদিকে খুঁজল, তারপর বললে,—টাকাটা তোকে দিয়ে যাব? কাইওলি পেমেন্ট করে দিবি?

কেমন যেন বিল্লী লাগল আমার, বলে ফেললাম কোঁকের মাথায়—সে কি কথা কিশোরদা; তুমি তো কিছুই খাওনি, খেলাম তো আমিই। পেমেন্ট আমিই করে দেব।

কিশোরদা মানিব্যাগটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল, তার দৃষ্টি কিন্তু ঐ দূরের ম্যাকফারসন সাহেবের গাড়ির দিকে নিবদ্ধ। বেশ অন্তরমনস্ক হয়ে পড়েছে সে। দঠাং ব্যাগটা পকেটে ভরে বললে, তুই কিন্তু ইন্টারভিউ দিয়ে চলে যাস্নে। আমাকে ঐ সামনের অফিসটার পাবি, বিল লেকসানে।

ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল কিশোরদা।

এবং তখনই নিজের অবস্থাটা খেয়াল হল আমার। বা খেয়েছি, না হ’ক দেড়-হুটাকার বিল হবে। কেয়ার ভাড়া হাতে না রেখেও সে বিল যেটাবার মত পরসা আমার হাতে নেই। কেন এ ধার্টামো করতে গেলাম? কি বলব এবার বেয়ারাটাকে? পকেটে হাত দিবে কি মানিব্যাগ চুরি

বাওয়ার অভিনয় করতে হবে? কি কুক্ষেণে কিশোরী পালার পড়েছিলাম! ঠিকই শান্তি হয়েছে আমার! শিবু সমাদার, মতু লাহিড়ী আর সুরেশ নাগ আমার স্ব-গোত্রের। বড় লোকের ছেলে কিশোর ডালমিরা তাদের লাহনার ব্যঙ্গ করছিল এটা আমার সহ্য হয়নি। তাই রাগের মাথায় হাত পেতে ওর কাছ থেকে টাকাটা নিতে পারিনি! কেমন যেন প্রচণ্ড অভিমান হয়েছিল আমার। অভিমান কার উপর, কোন অধিকারে করেছি জানি না, বোধহয় আমার ভাগ্য দেবতার উপর! ঐ কিশোরীদা হঠাৎ ধাক্কা কতবার আমার হারহা হয়েছিল। ডিসাইনের খিয়োরি না বুঝতে পেরে, অঙ্কের ফর্মুলা না ধরতে পেরে মিনেমা দেখিয়েছে, রেস্তোরাঁয় খাইয়েছে। পরিবর্তে তার সেমানাল প্রেট করে দিয়েছি, অঙ্ক কষে দিয়েছি, অথবা পড়া বুঝিয়ে দিয়েছি। তখন দাবী করেছি, এবার কোনদিন মোকাফোতে খাওয়াতে হবে কিন্তু কিশোরীদা। তা সে খাইয়েছে—নিজের গাড়ি করে কলকাতা নিয়ে গিয়ে। কোন সঙ্কোচ বোধ করিনি। কারণ সেখানে দান প্রতিদান ছিল বলে নয়, সেখানে সত্যিকারের বন্ধুত্ব ছিল, সমানে সমানে বন্ধুত্ব। এক হস্টেলের ছুটি ছেলের মধ্যে যে দৃঢ়তা থাকার কথা, তাই ছিল। কিন্তু আজ তো আর তা নয়। আজ আমি নিঃস্ব বেকার, আর সে বড়লোক কন্ট্রাক্টার! আজ আমরা জুতো পরাই, আর সে জুতো পরে। আমার যে সিগ্রেট কিনার পরমা ছিল না সে কথাও আমি জানিয়েছিলাম, হয়তো ও সেটা রসিকতা মনে করে থাকবে। দোদুল অবস্থা কিশোরীদাকেও দেওয়া যায় না। সে যে সুরের মানুষ তাতে সত্যিই আশঙ্কা করেনি, ছ-টাকা খাবার বিল মেটাবার সম্ভাবিতা নেই আমার!

ভাবতে ভাবতেই বেয়ারাটা বিল নিয়ে এল। এক টাকা বারো আনা! টিপস্ নিয়ে ছ-টাকাই আমার দেওয়া উচিত! মানিব্যাগ চুরি বাওয়ার মিথ্যা অভিনয়টা কিছুতেই করতে পারলাম না। পকেট হাতড়ে দেখলাম, এক টাকা পাড়ে তিন আনা পরমা আছে। মরিয়া হয়ে ওর চাত থেকে বিলটা নিয়ে উঠে গেলাম কাউন্টারে। যে ভদ্রলোক ক্যাশ জমা নিচ্ছিলেন তাঁকে ইংরাজিতে বললাম, আমার কিছু ভুল হয়েছে। বিলে এত উঠবে ভাবিনি। আমার কাছে মাত্র একটাকা পাড়ে তিন আনা আছে!

ভদ্রলোক তীব্র দৃষ্টিতে আমাকে আপাদমস্তক দেখে নিলেন। তারপর বললেন, আপনি মিটার ডালমিয়ার সঙ্গে বসেছিলেন, নয়?

: হ্যা, কিশোর ডালমিরা আমার কান ফেও!

: ঠিক আছে। বাকি পরমা পরে সুবিধামত দিয়ে যাবেন।

নিঃস্ব হাতে বেরিয়ে এলাম দোকান থেকে।

ব্যাপারটা হয়তো কিছুই নয়, কিন্তু প্রচণ্ড আঘাত পেলাম একটা। খেড়ে ছেলে, কিন্তু চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে চাইছিল আমার। আশ্রয় চোরের দায়ে ধরা পড়লাম না, সুরেশ নাগের মত হাজত বাস করতে হলনা তার কারণ আমি কিশোর ডালমিয়ার সঙ্গে এ দোকানে ঢুকেছিলাম। কিশোরকে দোকানের ম্যানেজার চেনে তাই আমি রক্ষা পেয়ে গেলাম। দোকানের সাইনবোর্ডটা দেখে নিলাম একবার। কলকাতার গিয়ে ঐ বাকি লাড়ে আট আনা পরমা মানি-অর্ডার করে পাঠাতে হবে আমাকে, না হলে এ লাঞ্চার প্রতিশোধ নেওয়া হবে না।

কিন্তু প্রতিশোধ কার বিরুদ্ধে? আমার বেকারত্বের? অভাবগ্রস্ততার? কার উপর অভিমান করে লাড়ে আট আনা পরমা মানি-অর্ডার করব? তা জানিনা। তবে ওটুকু আমাকে করতেই হবে।

আড়াইটা নাগাদ ডাক পড়ল। আমার পরনে স্যুট নয়, ছিল বুশ শার্ট। টাই নেই গলায়, পায়ে স্না নয়, কাবলি। তাই বোধকরি এ পানদানি কোম্পানির নির্বাচকদল একটু চমকে গেলেন। আমি ছাড়া আর সবাই এসেছিল স্যুট চড়িয়ে। অধিকাংশই ধার করা প্যান্ট কোর্ট এবং গলার অপরের-হাতে-পারিয়ে-নেওয়া টাই বেঁধে এসেছে, সানফ্রান্সিস্কো-না-করা কাপড়ের বিজ্ঞাপনে দেখা বিচিত্রবেশীর মত। আমার নাম ঘোষিত হতে ভিতরে ঢুকলাম। বোর্ডে পাঁচজন মেধার। আমাকে বসবার চেয়ার দেওয়া হল। আর কিছু না ঠাণ্ড হুঁটো বাঁচল।

গ্রে-রঙের স্যুট পরা মধ্যবয়স্ক একজন প্রথম প্রশ্ন করেন—বুশশার্ট এবং কাবলি চপ্পল একজন এঞ্জিনিয়ারের উপযুক্ত পোষাক বলে মনে করেন আপনি?

তৎক্ষণাৎ জবাব দিলাম, করি! যতদিন সে আনএমপ্লয়েড এঞ্জিনিয়ার! এ প্রয়োক্তরের ঐখানেই ইতি।

দ্বিতীয়জন বলেন, পাশ করার পর এতদিন কি করছিলেন?

: একটা চাকরি খুঁজছিলাম।

: সে তো জানি। কোথাও কোন কাজ করেছিলেন কি, পাশ করার পরে?

: না! কোথাও রাখা গোলার আলুর পাইনি। এমনকি বিনা মাইনেতে শুধু পকেট এ্যালাউন্স দিয়েও কেউ রাখতে রাজি হন নি।

: তাহলে তো আপনার কোন অভিজ্ঞতা নেই ?

: না, চাকরি জীবনের কোন অভিজ্ঞতা নেই আমার ।

: কন্ট্রাক্টর হিসাবেও নেই বোধকরি ?

: আজ্ঞে না । কন্ট্রাক্টারি করতে হলে মূলধন লাগে । আমার তা নেই ।
ইন্টারভিউ দিতে আসার উপযুক্ত একছোড়া জুতোই কিনতে পারিনি ।

তৃতীয়জন বলেন, আপনি তো ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছেন দেখছি ; এ চাকরিতে
টিকে থাকবেন তো ?

বললাম, কিন্তু বিজ্ঞপ্তিতে তো আপনারাই লিখেছেন যে, পদগুলি
অস্থায়ী । ছয়মাস হয়ে গেলেই তাদের বিদায় দেবেন !

: কিন্তু ছয়মাসও যে আপনি মন দিয়ে কাজ করবেন তার গ্যারান্টি
কি ? আপনি তো ছয়মাস ধরে ক্রমাগত বেশি মাইনের চাকরির জন্ত
দরখাস্ত করে যেতে পারেন, এবং অনবরত দুটির আঞ্জি পেশ করে
ইন্টারভিউ দিয়ে বেড়াতে পারেন ?

: কী বলতে চাইছেন ? আপনারা কি একতরফা বক্তৃতা লিখিয়ে নিতে
চান যে এই ছয়মাসের মধ্যে অল্প কোথাও দরখাস্ত করার অধিকার আমার
থাকবে না ?

চতুর্থজন বিরক্ত হয়ে বলেন, না, তা চাই না । আমরা কারও মৌলিক
অধিকারে হাত দিতে চাই না । আমরা চাই এমন লোক যে খুশি হয়ে
মন দিয়ে কাজ করবার চেষ্টা করবে । ক্রমাগত বেশি মাইনের চাকরির
জন্ত দরখাস্ত করবেনা ।

: মাপ করবেন, তাই যদি সত্যি সত্যি চান আপনারা, তবে তাকে
খুশি হওয়ার সুযোগও আপনাদের দেওয়া উচিত ছিল । সে ক্ষেত্রে প্রার্থীকে
নিম্নতম বেতনের কথা উল্লেখ করে দরখাস্ত করতে বলেছেন কেন ? ন্যূনতম
বেতন নিয়ে একটা লোক যে খুশি থাকবেনা এতো জানা কথা । উপযুক্ত
বেতনের অঙ্ক ঘোষণা করেই বিজ্ঞপ্তি দিতে পারতেন আপনারা ?

: ন্যূনতম বেতন মানে, বেতনের সেই ন্যূনতম অঙ্ক যাতে সে খুশি
থাকবে, তাই নয়-কি ? অঙ্কটা প্রার্থীকেই জানাতে বলেছি আমরা, নিজে
থেকে আরোপ করিনি ।

: ঠিক কি তাই ? আমার কথাই ধরুন, আমি ন্যূনতম বেতন উল্লেখ
করেছি দুশ' এগারো টাকা । সরকারি চাকরিতে এ্যাসিস্টেন্ট এঞ্জিনিয়ারের

কেল শুরু হচ্ছে ৩২৫'০০ টাকা। এতে তো বেশ বোঝা যায় যে আমি দুশ' এগারো টাকা খুশি থাকতে পারিনা।

: তবে ও কথা লিখলেন কেন ?

: যাতে পরবর্তী ইন্টারভিউ বোর্ডে বলতে পারি চাকরি করার অভিজ্ঞতা আমার আছে। ডিমাণ্ড এ্যাণ্ড সাপ্লাইয়ের অবদারিত নিয়মে আমাকে দর নামাতে হয়েছে। আপনারাও জানেন, আমিও জানি যে আমরা, কোয়ালিফায়েড এঞ্জিনিয়াররা আজ বাজারে সারপ্রাস !

প্রথমজন আবার আলোচনায় যোগ দেন, হেসে বলেন, তার উপর আপনি তো আবার শুধু কোয়ালিফায়েড নন, ওভার-কোয়ালিফায়েড ; ফার্ট'ক্রাস পেয়েছেন আপনি।

হাসিতে হাসি আনে। আমিও হেসে বলি, আপনার এ আশঙ্কার কথা জানা থাকলে চেষ্টা করতাম যাতে ফার্ট'ক্রাস না পাই। সেটা খুব কষ্টকর ছিলনা আমার তরফে।

ও পক্ষ কিঙ্ক এবার আর হাসলেন না রসিকতাটায়।

পঞ্চম মনস্ত, তিনি এতক্ষণ চুপ করে শুনছিলেন, তিনি এবার প্রশ্ন করেন : একটা কথা। নিম্নতম বেতন দুশ' এগারো টাকা বলেছেন কেন ?

: দুশ' এগারো টাকা বেতন পেলেই আমি নেপাল বর্ডারে চাকরি করতে যেতে রাজি আছি বলে।

: শাই মীন, দুশ' দশ নয় কেন ? অথবা দুশ' কুড়ি নয়, কেন ? হোয়াই দিস্ অড্ ফিগার, দু হাণ্ড্রেড এ্যাণ্ড ইলভেন ?

বললাম, আজকের দিনে একজন ভালো রাজযন্ত্রির দিন যজুরি দৈনিক সাতটাকা ; অর্থাৎ মাসে দুশ দশটাকা। তার কম নিতে ভ্যানিটিতে বাধছিল বলে এবটাকা বেশি চেয়েছি। নাহলে শুধু খোরাকি পেলেই বিনা মাইনেতে আমি জ্বেন করতে রাজি আছি।

এতক্ষণে গ্রে স্ট-পরা প্রথম জন বললেন, আচ্ছা আপনি বেতে পারেন।

আমি বর ছেড়ে বেরিয়ে আমার আগে সহযোগীকে বললেন, শুনতে পেলাম, লীম্ টু বি ওভার কোয়ালি-ফায়েড !

সহযোগী বললেন, শুধু তাই নয়, কথার ভঙ্গিমা কেখেন ? সব কথাতেই কেমন চ্যাটাং চ্যাটাং জবাব ! এরাই ঐসব ধর্মঘট আর ঘেরাও অর্গানাইস করে।

ইচ্ছে হল কিরে গিরে তুনিরে আনি তিনকড়ের সেই অনবদ্য উক্তিটি—
‘পেটে আগুন জ্বলে বাক্যগুলো মুখ দিয়ে কিছু গরম গরমই বার হয়।’ কিন্তু
সে স্বযোগ হয়নি, তার আগেই দারপাল আমাকে পথ দেখিয়ে ঘর থেকে বাইরে
নিরে আসে।

বেশ বুঝতে পারি এ চাকরি হবার নয়, কিশোরদা ঠিকই বলেছিল। কিন্তু
কিশোরদার কথার পিছনে কী যেন একটা ইঙ্গিত ছিল। মরুক গে, এখন আর
কিশোরদার খোঁজ করতে ইচ্ছা হল না। কিশোর ডালমিয়ার সঙ্গে এখন আর
বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্বীকার করিনা আমি। হাত আর হাতনটের বিরাট ফারাক
সৃষ্টি হয়ে গেছে দুজনের মধ্যে। কলেজে থাকতে কিশোরদা আমাকে মোকা-
দোতে বাইরেছে, সিনেমা দেখিয়েছে, গাড়ি করে বেড়াতে নিয়ে গেছে। তার
গাড়িতেই ড্রাইভিং শিখেছি আমি—হাতে ধরে সেই শিখিয়েছিল আমাকে। সে
সব কণই স্বীকার করি আমি। কিন্তু পরিবার্তে তাকেও প্রভুতভাবে সাহায্য
করেছি। আমার সাহায্য না পেলে সে এ বছরও পাশ করতে পারত না।
কলে দান প্রতিদান শোধবোধ হয়ে গেছে। এখন নতুন করে হিসেব লিখতে
হবে। নতুন খাতায়। এ খাতার আমি জমার অঙ্কে কিছুই দিতে পারব না।
এ খেলাঘরে আমরা দুজনে সতীর্থ নই, দুজনে হুঁ দলে। আমি আছি ঐ শিবু
সমাদারের দলে—যে হতভাগ্য বি, ই পাশ করে এখন কম্পাউণ্ডিং শিখেছে।
আমি ঐ সতু লাহিড়ীর দলে যে হতভাগ্য আজ কিশোরদার পায়ে জুতো
পরায়। আমি ঐ সুরেশ নাগের দলে, যে দুর্ভাগ্য দৈনিক-আড়াই টাকা
মজুরিতে আজকের বাজারে—; না! সুরেশ আজ দিনমজুর নয়। সে
হাজতি আসামী। কী করে ছিল সুরেশ? সত্যি কিছু করেছিল, না মিথো
মামলার জড়িয়ে পড়েছে? কিশোরদা বলেছিল সব কথা যে আমাকে বলবে।
বলেছিল, আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবে তার গাড়িতে। কিন্তু না! তার খোঁজ
আমি করব না। তার গাড়িতে চাপবার দীনতা আমি আর স্বীকার করতে
চাই না। আমার কাছে সে যে ভাবায় শিবু, সতু, আর সুরেশের মর্মবিহারক
অবমাননার কথাগুলো ‘মজার খবর’ হিলাবে দিয়েছে, এর পর কৌশিক মিজের
মজার খবর হয়তো তেমনি ভাবে পেশ করবে আমাদের অন্ত কোন বন্ধুর কাছে,
বলবে—‘লেটেস্ট মজার খবর হচ্ছে আমাদের কৌশিক মিজের। বেটা ইন্টারভিউ
দিতে গিরে দেখে বাড়ি ফেরার বাস ভাড়া নেই পকেটে! শেষে আমি একটা
লিক্ট দিয়ে দিলুম। হাজার হ’ক, একসময় আমার সঙ্গে পড়ত তো?’

- জামবাজারে আমাদের মেনটা ওখান থেকে মাইল বারো-তের। ঘণ্টা তিনেক হাটলেই পৌছে যাব। বাস-স্ট্যাণ্ডের দিকে আর গেলাম না। হাটা পথে রওনা দিলাম ক'লকাতার দিকে।

হেঁটে কিছু কিয়তে হয়নি আমাকে। মাইল তিনেক আসার পর হঠাৎ একটা অ্যাম্বাসাডার এসে দাঁড়িয়ে পড়ল আমার পাশে। কিশোরদা মুখ বাড়িয়ে বললে : মানে ? তুই হেঁটে হেঁটে কোথায় যাচ্ছিস ?

কেমন যেন রোখ চেপে গেল। দারিদ্র্যের একটা অভিমান আছে, দারিদ্র্য গোপন করার মধ্যে আছে হীনমন্ত্রতা। তাই মোজাহুজি জবাব দিলাম, ফেরার বাসভাড়া আমার কাছে নেই কিশোরদা। তোমাকে তখন বলেছিলাম, একটা কাচি সিগারেট কিনবার পরমা আছে কিনা শুনে দেখছিলাম, সেটা ছিল সত্যি কথা, রমিকতা নয়।

কিশোরদা মিনিট খানেক জবাব দিলনা। তারপর অল্প স্বরে বলল, উঠে আয় !

: না, কিশোরদা। খোলাখুলি কথা বলাই ভাল। তোমার সঙ্গে মেলামেশা করলে তোমারও বিপদ, আমারও বিপদ।

গাড়ির ডালা খুলে নেমে এসে কিশোরদা। আমার হাতখানা চেপে ধরে বললে, কোশিক !

যে ভাবে প্রচণ্ড জ্বরে ও আমার হাতখানা বজ্রমুষ্টিতে ধরেছে তাতেই বুঝতে পারি, এর পর প্রতিবাদ করা আমার পক্ষে উচিত হবেনা। চূপ চাপ উঠে বসি ওর গাড়িতে। কিশোরদা একটা সিগারেট ধরায়। একটা আমার হাতে দিয়ে বলে, স্বীকার করছি কোশিক, তখন আমি বুঝতে পারিনি, তোর এই হাল হয়েছে। বুঝতে পারলুম, সেই রেষ্টোরঁতে ফিরে গিয়ে। তোকে খুঁজতে খুঁজতে ওখানেও গিয়েছিলুম। রেষ্টোরঁর ম্যানেজার আমাকে চেনে। তোর কথা তার কাছে শুনলাম। তোর বাকি পরমা, লাড়ো আর্ট আনা আমি দিয়েছি। তখনই বুঝলাম, তোর কাছে বাড়ি ফেরার বাস ভাড়া নেই। বিশ্বাস কর, একঘণ্টা ধরে তোকে ওখানে আতি পাতি করে গরু খোজা খুঁজেছি।

: ঠিক আছে, চল এখন।

: তুই চালা।

: আমার লাইসেন্স রিনিউ করা হয়নি এ বছর

: তা হোক। চালা তুই।

বাধ্য হয়ে ‘স্মারিঙে বসলাম। কিশোরদা মিথ্রেটে লম্বা একটা টান দিয়ে বললে, কোণিক, তুই যেমনতো রবেকারেবের জন্ত দায়ী নস—সেটা তোর কর্মকল, আমিও তেমন আমার বড়লোকদের জন্ত দায়ী নই—সেটা আমার জন্মফল।

আমি জবাব দিইনা। গিয়ার বদলে গাড়ি চালাতে থাকি।

আবার খানিকক্ষণ ধোঁয়া টেনে কিশোরদা বলে, এ চাকরি তোর হবেনা। আমি ভিতরের খবর সব জানি। ওদের লোক সব সিলেক্ট হয়েই আছে, শুধু এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জকে খুশী করতে এই লোক দেখানো ইন্টারভিউ করেছে।

বললাম, আমারও তাই মনে হল। বারবার আমাকে ওভার-কোয়ালিফায়েড বলল। যোধহয় যারা সিলেক্টেড হয়েছে তারা কেউ ফাস্ট ক্লাস পাওয়া ছেলে নয়, তাই নয়?

কিশোরদা সে কথার জবাব না দিয়ে বললে, কোণিক তুই আমাদের কার্যে চাকরি করবি? এঞ্জিনিয়ার অবশ্য আমাদের এখন দরকার নেই; কিন্তু ওভারসিয়ার স্কেলে দু-একটি লোক নিতে পারি আমরা। তুই তো দুশ’ দশ টাকায় নেপাল পর্যন্ত যেতে রাজি ছিলি।

আমি হেসে বলি, দুশ দশ নয়, এগারো। আর নেপাল নয়, নেপাল-বর্ডার।

কিশোরদা কিন্তু মিরিয়ার, বললে, আমার কথার জবাব ওটা নয়। আমাকেও গম্ভীর হতে হল, বলি, না কিশোরদা। তোমার এ দানের কথা চিরদিন কৃতজ্ঞ-চিন্তে স্মরণ করব আমি; কিন্তু ও চাকরি আমি নেব না। না না, ওভারসিয়ারের স্কেল বলে নয়, তোমার অধীনে চাকরি করতে পারব না আমি। তুমি আমার বন্ধু, সেই সম্পর্কটাই থাক বরং।

কিশোরদা বললে, কেন, এতে আপত্তি কিসের? নিখিলদা আর সুজিতদা তো ক্লাশফ্রেণ্ড, একই ইয়ারের! অথচ নিখিলদা আজ এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার, তার পোষ্টিং সুজিতদার আওরে, সুজিতদা আর এস, ইঁ। এ তো আকছার হয়।

বললাম, তা জানি। তবু রাজি নই আমি। ও কথা বাক। সুরেশ নাগের ব্যাপারটা বল তো। কি হয়েছিল তার?

কিশোরদার কাছে বললাম ঘটনাটা।

কলতা ত্রিক ক্যাকটারিতে সুরেশ নাগের চাকরি হয়েছিল একটু বেলাইনি ভাবে। খাতা পড়ে তাকে দেখানো হচ্ছিল দিনমজুর হিসাবে, আগলে তাকে

দিয়ে করানো হচ্ছিল কেরানীর কাজ। হঠাৎ একদিন কেরানী-পদের আংশান এসে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে এসে গেল একজন কেরানী। সারপ্রান স্টাক হিসাবে যে অপেক্ষমান-তালিকায় বসেছিল এতদিন! তাকে নিতেই হল। ফলে, তারপর সুরেশ নাগকে রাখতে হলে তাকে দিয়ে সত্যিকারের মাটিকাটার কাজ করাতে হয়। সেটা সম্ভব নয়।

বেচারির সংসারে সত্যিই প্রচণ্ড অভাব। বাপ বৃদ্ধ, অবসর প্রাপ্ত; ওই বড় ছেলে। ছোট ভাই স্কুলে পড়ে, ছোট বোন কলেজে, তার বিয়ে দেওয়া বাকি। সুরেশ নাকি পাগলের মত ঘরে ঘরে ঘুরছে। আরও দুটো আইভেট টিউশানি নিয়েছে; কিন্তু এ বাজারে সাত আট জনের সংসার চারটে টিউশানিতে চালানো যায় না। সুরেশ মরিয়া হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ অভাবনীয় ভাবে কাজ পেয়ে গেল একটা। কাজটা দিনের আলোয় করা চলে না। যা বুঝতে পারলেন সবার আগে, বারণ করলেন না, আঁচলে চোখ মুছে বললেন, আমার বড় ভয় করে রে। বুঝলেন বাবাও, এ নিয়ে কোন উচ্চবাচ্য করলেন না। ছোট ভাই দুটি বয়সে কম হলে কি হবে, এ যুগের ছেলে, বুঝল কিছুটা তারাত। চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল। একমাত্র প্রতিবাদ করতে এগিয়ে এল ছোট বোন, বললে, এ তুমি কী করছ দাদা? না, এভাবে তোমাকে—

বাধা দিয়ে সুরেশ বলেছিল, তোর ভয় কি রে? শুনি নি দস্যু রত্নাকরের উপাখ্যান? পাপ বা হচ্ছে তা একা আমার। তোদের গায়ে আঁচড়টা লাগবেনা! শান্তি হলে আমার হবে—

বোন বলেছিল, তখন কোথায় দাঁড়া আমরা?

: তা আমি তো আর দেখতে আসব না।

আঁচলে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল ওর কলেজে পড়া ছোট বোন। তার মাথায় হাত বুলিয়ে সুরেশ বলেছিল, তোর ভয় নেই রে। ধরা আমি পড়ব না। তোদের এভাবে ডুবিয়ে দিয়ে যাব না।

সে প্রতিশ্রুতি পুরোপুরি রাখতে পারেনি সুরেশ। ধরা সে পড়েছিল। একদিন ভোররাত্রে সমস্ত পাড়াটা ঘেরাও করে পুলিশ ওকে ধরে নিয়ে গেল। কিন্তু সংসারটাকে সে ডুবিয়ে রাখনি। ওর বাপকে যদি পুলিশে বি.এল. কেলে ধরে না নিয়ে যায়, তবে সংসারটা দীর্ঘদিন চলবে এভাবে। দু ভাইয়ের স্কুলের বাইনে, বোনের কলেজ-ফি, বাবার আফিডের চুখ, আর মায়ের—না

যারের কোন সখ আহ্লাদ আর নেই; শুধু ভাত-কাণড়ের ব্যবস্থা করে গেছে সে।

কিশোরদাকে খামিয়ে দিয়ে বলি : চার্জটা কি ?

: ডাকাতি ! ওর কাছ থেকে নগদ একটি টাকাও পাওয়া যায়নি ; কিন্তু আনলাইসেন্স পিস্তল আর তাক্সি কার্তুজ পাওয়া গেছে। পার্কস্ট্রীট না সদর স্ট্রীটে ঘাস কতক আগে একটা ডাকাতি হয়েছিল কাগজে দেখে থাকবি, পুলিশের সন্দেহ স্বরেশ তার সঙ্গে জড়িত।

আমি দৃঢ় প্রতিবাদ করে বলেছিলাম, আমি বিশ্বাস করি না !

কিশোরদা হেসে বলেছিল, আমি কিন্তু বিশ্বাস করি কোশিক !

: স্বরেশ ক্যামভ্যান লুট করতে পারে ? স্বরেশ করেছে ?

: করেছে কিনা জানিনা, করতে পারে ! স্বরেশ মরিয়া হয়ে উঠেছিল, তাকে খোকা গুণ্ডার দলে স্বচক্ষে দেখেছি আমি !

: খোকা গুণ্ডা কে ?

: তুই চিনবি না। তা সে যাইহোক, আমি আশ্চর্য হব না যদি ওর কঠোর সাজা হয়ে যায়। মরিয়া হয়ে গেলে মানুষ সব করতে পারে। দারিদ্র্যের শেষ সীমায় পৌঁছে—

হঠাৎ কেন জানিনা বলে উঠি—কিশোরদা আমিও তো দারিদ্র্যের শেষ সীমায় পৌঁচেছি। তোমার কাছে কি লুকাব, একবেলা খাইনা, একটা গেলি কেনার পরস। নেই আমার। তুমি কি বিশ্বাস কর, আমি অমন ডাকাতির দলে নাম লেখাতে পারি ?

: না পারিনা, কিন্তু তার কারণটা সম্পূর্ণ আলাদা। তুই অন্য জাতের মানুষ। তুই কবি, তুই সেন্টিমেন্টাল, ক্রিমিনাল-টাইপ নয়। তুই ডাকাতির দলে নাম লিখিয়ে ডাকাতি করতে পারবি না, কিন্তু অভাবের তাড়নায়, অনুভব করার অক্ষম মোমেন্ট তুই মানুষ খুন করতে পারিস ! দেবিস, সামলে চালা !

সত্যিই স্ট্রারিংটা বেকারদা হয়ে গিয়েছিল। আমি, অধ্যাপক জগদানন্দ মিত্রের সন্তান, মানুষ খুন করতে পারি এ খবরটার রীতিমত চমকে উঠে ছিলাম।

কিশোরদা বলে, ভর তাকে নয়রে কোশিক, আমার ভর হয় শিবু পালোয়ানকে নিয়ে। ও বেটা যে কি করবে তাই আমি ভাবি। সেও আজকাল একবারে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

আমি বলি : কেন শিবু সমাদারের আবার কি হল ? সে তো আমাদের মত বেকার নয় ?

: তা নয়, কিন্তু তার অবস্থা আরও কাহিল। তুই কতদূর জানিস আমি জানিনা, শীলা ভৌমিককে চিনিস ?

: শীলা ভৌমিক ? না, সে কে ?

: বা দিকে রাখ, কিছু খেয়ে নেওয়া যাক বরং।

বুঝতে পারি কিশোরদা আজ রাত্রের খাবারের খরচটা আমার বাঁচিয়ে দিতে চাইছে। আপত্তি করতে পারিনা, আর আপত্তি করেই বা কি লাভ ? কিশোরদার বন্ধুত্ব আমি নতুন করে স্বীকার করেই তো নিয়েছি।

ভরপেট খাইয়ে দিল কিশোরদা, নিজেও খেল আমার সঙ্গে। আর এই সুযোগে শিবু পালোয়ানের গল্পটাও করল সে।

শিবু সমাদার ক্ষীণজীবী প্রাণী। রোগা এবং কমজোরি, কিন্তু অত্যন্ত বুদ্ধিমান, মেধাবী ছেলে। সেও স্কলারশীপ পেয়েছিল হায়ার সেকেন্ডারিতে, সেও ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে বি ই-ফাইনালে। লম্বা একহারা চেহারা, মাথার চুলগুলো পিছনে কেদ্রানো, চোখে বেমানান মোটা ফ্রেমের চশমা। অত্যন্ত ফর্সা গায়ের রঙ, চোখ দুটো নালচে, এমনকি চুলগুলোও লালচে। হঠাৎ দেখলে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বলে ভুল হয়। ফার্স্ট-ইয়ারে স্মিথ-শপে হাপরের সামনে লোহা পিটতে পিটতে হঠাৎ সে অজ্ঞান হয়ে যায়। গরমেই বোধহয়। জ্ঞান ফিরে আসতে তার মিনিট পাঁচেক লেগেছিল। কিন্তু ঐ পাঁচ মিনিটের দুর্ঘটনাটাই তাকে একেবারে দাগী করে দিয়েছে। ক্লাস শুরু ছেলে বরাবর তাকে ডেকেছে শিবু পালোয়ান বলে।

মুখচোরা লাজুক ছেলেটা যে লুকিয়ে প্রেম করতে পারে একথা আমি করুনাই করিনি। এ সব খবরও অবশ্য আমি রাখতাম না। কিশোরদা-সকলের সব হাঁড়ির খবর রাখে। তার কাছেই আজ প্রথম শুনলাম শিবু ও শীলার প্রণয়োপাখ্যান। শিবুর বাবা ডাক্তার, নিজেরই মস্ত ডিসপেন্সারী। শীলার বাবার চিকিৎসা করতেন তিনি। একই পাড়ার থাকে ওরা। শীলা ডিসপেন্সারীতে আসত ঔষধ নিতে। শিবুও তখন অবশ্য ডিসপেন্সারীতে বসত না, তবু তার সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল শীলার। তারপর থেকে আর শীলাকে ঔষধ আনতে আসতে হত না। শিবুই পৌছে দিয়ে আসত ঔষধ ও বাড়ি গিয়ে। তারপর বেমন হয়ে থাকে। বাড়ির বাইরেই দেখা শোনা

হত, সপ্তাহান্তে শিবেন্দ্র শিবপুর হস্টেল থেকে শনিবার বাড়ি আসত। সোজা বাড়িতে কিছু আসত না। কখনও যেত আউটগ্রাম বাটে, কখনও মেট্রোর সামনে, কখনও বা লেকের ধারে চিহ্নিত কুঞ্চূড়া গাছ তলার। শীলার কলেজেও শনিবার ছুটি হরে যেত বেলা আড়াইটার। মাকে সে বলেই যেত কলেজ থেকে সোজা তাকে যেতে হবে লাইব্রেরিতে। স্ত্রীরাং শনিবারের সন্ধ্যাটার তাদের ছিল নিয়মিত সাক্ষাতের ব্যবস্থা।

মুখচোরা হলে কি হয়, শিবু কিছু বাকবীর সঙ্গে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সম্পর্কটা নিবিড় করে নিয়েছিল। তার বক্তব্য সে মুখে বলত না, কিছু বুঝতে অসুবিধা হতনা শীলার। যে-দিন শীলা জানালো তার পিতৃবন্ধুর একটি ছেলের সঙ্গে তার বিয়ের কথা উঠেছে বাড়িতে, এবং ছেলেটি ওদের বাড়ি ষাভারাত শুরু করেছে, সেদিন ক্রঃকণ করেনি শিবেন্দ্র। লেকের ধারে বসে কথা হচ্ছিল দুজনের। শিবু বলেছিল, কি নাম ছোকরার?

শীলা চোর কাঁটার একটা ডাঁটা চিবুতে চিবুতে বলেছিল, ছোকরা নয় শিবুদা। তোমাদেরই বয়সী। তোমার চেয়ে নামটা অশ্রুত তার অনেক ভাল। মানস দায়।

: কি করে সে ছোকরা?

: ছোকরা ছোকরা করবেন না কিছু ভাল হবেনা। হয়তো তার সঙ্গেই আমার বিয়ে হবে। ডাক্তারী পড়ে। আর. প্রি. কর-এ।

: দেখি তোমার হাতখানা?—কোথাও কিছু নেই শীলার হাতখান টেনে নিয়ে শিবু পালোয়ান চাতের রেখা দেখতে থাকে। তারপর হেসে বলে : সে গুড়ে বাজি! ডাক্তারের বউ হওয়া ভাগ্যে নেই তোমার!

চোখ পাকিয়ে শীলা বলেছিল—তবে কার বউ হব আমি? এঞ্জিনিয়ারের?

: যদি কোন এঞ্জিনিয়ার তোমাকে বিয়ে করতে আদৌ রাজি হয়!

: হুঁ! ঠোঁট উল্টে শীলা বলেছিল, এঞ্জিনিয়ার বর্তে যাবে!

পরদিন কলেজ থেকে ফিরে শীলা মায়ের কথার অবাধ হয়ে গিয়েছিল। মা বললেন, তুই কোন্ দোকানে তোর বাপের সঙ্গে আধ ডজন আপেল কিনে দোকানেই ফেলে রেখে এসেছিলি, দোকানি দিয়ে গেছে। মাথা মুণ্ড কিছুই বুঝতে পারেনি শীলা। রহস্যটা ভেদ হয়েছিল সেদিনের ডাক-পিরন আগার পর। খামটা খুলে স্বাক্ষরহীন যে চিঠিখানা পেয়েছিল তাতে লেখা আছে,

: An apple a day keeps the doctor away!

কী হুঃসাহস শিবেনের, ভেবেছিল শীলা। ইংরাজি প্রবাদ বাক্য অনুযায়ী সে যাতে লপ্তাহের বাকি ছয়দিন ডাক্তারকে দূরে রাখতে পারে তার তির্যক নির্দেশ পাঠিয়েছে হুঃসাহসী ছেলেটা। কিশোরদাকে খামিয়ে দিয়ে বলেছিলাম—এত বিস্তারিত তুমি জানলে কেমন করে ?

: পালোয়ানই গল্প করেছে !

: এগন ওদের কি অবস্থা ?

: তাই তো বলছি। শিবু পালোয়ানের সঙ্গে শীলার বিয়ের সব ঠিক ঠাক হয়ে গিয়েছিল। গত বছরই। না ল্যভ ম্যারেজ নয়, রীতিমত বাপ মায়ে ঠিক করা বিয়ে। দুপক্ষই ছেলে দেখা মেয়ে দেখা করেছিলেন। দেনা পাওনা সবই ঠিক হল, কথা ছিল শীলার বি. এ. পরীক্ষা এবং শিবুর বি. ই. পরীক্ষার ফল বার হলেই হু-বাড়িতে ম্যারাপ বাঁধা হবে। মায় শিবু পর্যন্ত আমাকে সমেত কিছু বন্ধু বান্ধব নিয়ে একদিন মেয়ে দেখে এল। দুজনেই পাশ করেছে, কিন্তু এখন শীলার বাবা বেকে বসেছেন। কম্পাউণ্ডারের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন কেমন করে !

—হো হো করে হেসে উঠল কিশোরদা।

সে হাসিতে আমি যোগ দিতে পারিনি।

কিছুতেই কিশোরদার সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারছিলাম না। বললাম, চল ওঠা যাক !

: বসনা একটু ! শোন, তুই তো আমার ফার্মে চাকরি করবি না। অথচ অবস্থা তো বলছিস অস্বভাব্যদুঃখঃ ! কী করবি ? ব্যবসা করতে রাজি আছিস ?

: ব্যবসা ? ক্যাপিটাল কোথায় ?

: ক্যাপিটাল লাগবেনা। তুই ওয়াকিং পার্টনার। একেবারে স্বাধীন ব্যবসা। বলতো ব্যবস্থা করে দিই। যতদিন না চাকরি বাকরি পাচ্ছিস, দিন পাঁচ-সাত মায় দশটাকা রোজগার করতে পারিস' যদি ভ্যানিটিতে না লাগে ?

: কাজটা কি শুনি ?

: আমার একজন আত্মীয় সম্প্রতি একটা ট্যান্সির পারমিট পেয়েছে। গাড়িও কিনেছে, চালাবি ? আই মীন, যদি না—

: ট্যান্সি-ড্রাইভার ?

: বললাম তো যতদিন না—

: ঠিক আছে। আমি রাজি।

: এই ঠাখ! অথচ আমি দু'ঘণ্টা ধরে তাল করছি কথাটা তোকে বলব কি বলব না।

: কেন এত সঙ্কোচ কিসের?

: না, মানে...যাকগে ও কথা! কাল সকালে তা হলে চলে আর আমার ওখানে।

পকেট থেকে আইভরি ফিনিস একটা কার্ড বের করতে যায় কিশোরদা। তাকে বাধা দিয়ে বলি. তোমার বাড়ি আমি চিনি কিশোরদা। কতবার তো গেছি!

: ও হ্যাঁ তাই তো! যাক নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। সত্যি কথা বলতে কি তোরা একটা হিলে না হওয়া পর্যন্ত...আমি মানে...আমি শালা ভাবতেই পারিনি যে তোরা কাছে...যাকগে!

উঠে পড়ে কিশোরদা।

আমাকে মেনের সামনে নামিয়ে দিয়ে কিশোরদা বললে, ই্যা রে কৌশিক, তুই এখনও কবিতা লিখিস? না সে ভূত নেমেছে ঘাড় থেকে?

হেসে বললাম, না কিশোরদা ভূত এখনও ঘাড়ে চড়েই আছে।

: আজও লিখবি?

: কি জানি? দেখব চেষ্টা করে।

চেষ্টা সে রাত্রে করেছিলাম। কবিতা লিখেছিলাম একটা। না, সুরেশ নাগের অবক্ষয় নয়, সত্যপ্রিয়ের জুতা পরানোর কথা নয়; শিবু পালোয়ানের ব্যর্থ প্রেম নয়, আমি কবিতা লিখেছিলাম ঐ ফ্যাকটারিটার উপর।

কলেজে থাকতে ছাত্রজীবনে একটা চিনির কারখানা দেখতে গিয়েছিলাম। সেদিনও সেই ফ্যাকটারি তার যন্ত্রসঙ্গীত শুনিয়েছিল আমাকে। কিন্তু আমি তখন বধির ছিলাম। ওদের সঙ্গীত আমার কানে প্রবেশ করেনি। কলেজ-জীবনে যন্ত্রকে দৈত্য বলে মনে করতে শিখিনি। কলেজে লিখেছিলাম, যন্ত্র হচ্ছেন দেবতা। চক্রমুখরমস্ত্রিত এবং বজ্রবহুবিন্দিত যন্ত্র দেবতার প্রচণ্ড বিক্রমে তখন মুগ্ধ ছিলাম। তার কাছে লিখতে চেয়েছিলাম 'লৌহগমন, শৈলদমন অচলচলন যন্ত্র।' রেনেসাঁসের যুগে, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশানের যুগে সমগ্র যুরোপও যেমন প্রকান্ডচিত্তে যন্ত্র দেবতার বন্দনা গান গাইতে লিখেছিল, আমরাও তেমনি বি. ই. কলেজে বলতাম, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র।

তারপর দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেল। ধনতাত্ত্বিক পৃথিবীর যাবতীয় কল-কারখানায় নিপীড়িত মানুষের আর্তনাদ শুনে মনে হল দেবতা নয়, যন্ত্র আসলে দানব। আশীর্বাদ নয়, যন্ত্র এ সভ্যতার অভিশাপ। সে চক্রমুখর-মস্ত্রিত নয়, সে চক্রাস্ত-ইতর-মস্ত্রিত! শুধু ক্ষিতিকেই বিদীর্ণ করেনা, শুধু পাথরকেই দলন করেনা—মেহনতি-মানুষের হৃদপিণ্ডকে সে বিদীর্ণ করে, তাদের দলিত পিষ্ট করে অস্তি-নাস্তি দলের মাঝখানে খাল কেটে চলে! যন্ত্র-দৈত্যকে অভিশাপ দিয়েছিলাম সেদিন।

কিন্তু আজ মনে হল সে ধারণাটাও ভুল। আজ এই স্টীল-ফ্যাব্রিকেসন ফ্যাক্টোরিতে মনে হল—যন্ত্র দেবতা নয়, দানবও নয়। সে আসলে এক বন্দিনী নারী। যন্ত্রী-দানবের ক্রীতদাসী সে হতভাগিনী! তোমার-আমার মতই সে স্বাধীনতার সোনালী স্বপ্ন দেখে শিকল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার যন্ত্র জপ করে চলে গোপনে। এই ফ্যাক্টোরীতে আমার ঠাই হল না, সে জন্ম সে দায়ী নয়; কিন্তু ঐ ক্ষণিক স্ফুটনে সে তার গোপন কথা আমাকে শুনিয়ে দিয়েছে কানে কানে। যন্ত্রের যন্ত্রণা মর্মে মর্মে অনুভব করে এলাম আমি :

রোজ যারা আসে যায় তেল দেয় চাকাতে
চোখ বুঁজে চলে তারা ভুলে যায় তাকাতে
কোনদিন শোনে নাই ফ্যাক্টোরি কাব্যের ছন্দ!
কী মেশিন্ লোক ভাই! প্রাণে নাই কাব্যের গন্ধ!
আসে ভোর সাতটায়, পাঁচটায় ঘর যায়,
হানা দেয় ফিরে ফের বস্তীর দরজায়
কেউ ফিরে দেখে নাক' কোনদিন হাস্য হয়,
স্মৃতিতে ফ্যাক্টোরি রোজ কি যে গান গায়।
খুঁৎখুঁতে ঐ এঞ্জিনিয়ার ফেরেন শুধু খুঁৎ খুঁজে,
কোন্ নাট্টায় ঢিল ধরেছে বলেন তিনি চোখ বুঁজে।
ফোরম্যান সা'ব হ্যাটটি মাথে ফেরেন বিরাট স্প্যানার হাতে
কোথাও কাজের ছিদ্র পেলেই দেন মবিলের ক্যান শুঁজে।
মজুররা সব নীল পাজামায় দিন মজুরী কটে কামায়
কার্নেসটা তাদের ঘামায় কাটছে জীবন ঘাম মুছে।
যে যায় কাজে মত্ত সবাই, কেই বা হেথায় কান পাতে,
কেই বা শোনে গাইতে কী গান ফ্যাক্টোরিটার প্রাণ মাতে।

বন্ বন্ বন্ নাচছে ঘুরে ফাইট্‌ইলের স্নর্শন ।
 দাঁড়িয়ে খাড়া দেখছে চেয়ে বয়লারটা কু-দর্শন,
 কোন কাজের নয় ক' ওটা, যেমনি কালো তেমনি মোটা
 তবু ওরই বুকের তলায় অগ্নি নাচে কী নর্তন !
 গিয়ারগুলো বাড়িয়ে হুলো এগিয়ে নিল অগ্রগতি
 সমান তালে ক্যামগুলো সব সময়ের মুখে ফেলছে ষতি ।
 আমার হামার ঠক ঠকা ঠাই ঠিক সময়ে তাল দিয়ে ঘাই
 আমরা ক্রাশার নামাই আঘাত সর্বসময়ের নিষ্কাশন
 ধবক ধবক ধবক চিমনি আমি সবার উচ্ছে মোর আসন ।
 ম্যাকোমিটার কাঁটায় আমি শুনিবে বাব দিবস বাঘী
 প্রেদারগজের খবরটা ঠিক, ছিল কী চাপ মোর ঘাড়ে,
 বিপদ-সূচক এ্যালার্ম আমি, সবার দৃষ্টি মোর দ্বারে,
 আমরা আখের অশ্রু ঝরাই প্রবল চাপের পিষ্টনে
 আমরা ঘোরাই বিশ্ব চাকা ছোট্ট আমার পিস্টন-এ ।
 বামিংহামে জন্ম কারও, জন্ম কারও বালিনে,
 ফ্যাক্টোরির এ গানের মর্ম বুঝতে তোরা পারলি নে,
 মুখা মানুষ যন্ত্র যে, বুঝবে গানের মন্ত্র কে ?
 বুদ্ধিমোহে এঞ্জিনিয়ার করছ কেবল এয়াকি,
 পোষমান। এ শাস্তি রূপে করবেন। কেউ কেয়ার কি ?
 জান ওহে ! যদি মোরা একদিন বদলাই ছন্দ
 লাগে যদি সেই দিন যেদিনে ও মানবের দ্বন্দ্ব,
 নটরাজ যুতিতে নাচি যদি স্মৃতিতে
 এ্যালার্ম ও সিগন্যাল ক্ষণতরে করি যদি বন্ধ,
 কয়লারা গানে গানে বয়লার-কানে-কানে
 তাপ-জোয়ারের বানে বিজ্রোহ-বাণী আনে
 প্রলয়ের নৃত্যে উদ্দাম চিন্তে যদি মোরা কাটি ভাল,
 চৈতালী ঘূর্ণিতে চরাচর চূর্ণিতে জেগে উঠি উত্তাল !
 যুঁচ নয় ! সেই দিন করজোড়ে এসে চাবি' সন্ধি ;
 যন্ত্রের হাতে হবি উদ্ধত যন্ত্রীরা বন্দী ॥

॥ এগার ॥

টেলিফোনটা তুলে নিয়ে সাড়া দিতেই ওদিক থেকে ভেসে এল, সুজাতা, আমি মহাপাত্র বলছি। আগরওয়াল কি কলকাতা চলে গেছে ?

—হ্যাঁ, উনি তো কালকেই চলে গেছেন।

—কবে ফিরবে যেন ?

—বলে গেলেন তো বুধবারে।

—ও, তা তোমরা সব কেমন আছ ?

—ভালই।

—শোন, একটা বড় অর্ডার আছে। নেবে তোমরা ?

সুজাতা একটু ইতস্তত করে বলে, বুধবার মিস্টার আগরওয়াল ফিরে এলে তাঁর সঙ্গে বরং কথা বলবেন।

চোখে দেখতে না পেলেও সুজাতা অসুভব করে ও-প্রাস্তবাসীর মুখে এক চিলতে একটা হাসির রেখা ফুটে উঠল। বৈদ্যুতিক তার বেয়ে ভেসে এল, সব কথা যদি তার সঙ্গে আলোচনা করি, তবে তুমি ও অফিসের কী এ্যাডমিনিস্ট্রেশন দেখছ ?

—না, যানে গতবার আপনি রেলওয়ের অর্ডারটাও অফার করেছিলেন, তা আমরা নিতে পারিনি, সে সব তো আপনি জানেনই, তাই—

বাধা দিয়ে জীমূতবাহন বলে ওঠেন, ভাল কথা, সে অর্ডারটা তোমরা নিলে না কেন, বলত ?

—আমাদের প্রডাকশন অতবড় অর্ডার ধরার উপযুক্ত এখনও হয়নি। মিস্টার আগরওয়াল বলেন,—

আবার ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে জীমূতবাহন বলেন, মিস্টার আগরওয়াল কি বলেন, তা তাঁর কাছ থেকেই শুনতে পেয়েছি, মিস্ সুজাতা কি বলেন তাই শুনতে চাই আমি। প্রডাকশন বাড়াবার জন্য যা যা প্রয়োজনীয় তা কি তোমরা করছ ? না করতে বাধা কোথায় ? ক্যাপিটাল ? পেটেন্টটা বা নেওয়া হচ্ছে না কেন ? না কি এগ্রিমেন্ট হয়ে গেলে তারপর কারখানাটা বাড়াতে চাও। সে ক্ষেত্রে এগ্রিমেন্টটাই বা হচ্ছে না কেন ?

সুজাতা বলে, আপনি একসঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন করছেন। জবাব দিতে হলে অনেক কথা বলতে হয়। টেলিফোনে সে সব কথা বলাও ঠিক নয়।

—বেশ তো, বল তো সামনাসামনি গিয়েই কথা বলতে পারি—

—না, আপনি কেন কষ্ট করে আসবেন, আমিই বরং আপনার কাছে যাবি।

—বেশ তাই এস, গাড়ি পাঠিয়ে দেব ?

—না গাড়ি আছে, বেশ এখনি আসছি।

টেলিফোনের লাইন কেটে দিয়ে সুজাতা তৈরী হয়ে নেয়। প্রসাধন সে কোন কালেই করেনা। কাপড়টা পালটে নেয় শুধু। বনোয়ারিলালকে ডেকে গাড়িটা বার করতে বলতে যায়, তারপর কী ভেবে থেমে পড়ে। গ্যারেজ পর্যন্ত হেঁটেই যাবে। সেই গরুড়পক্ষী ড্রাইভারটা দোতলার ঘরখানা দখল করেছে কিনা জেনে নেওয়াও যাবে। হোক মাইনে করা চাকর, নিম্ন-শ্রেণীর কর্মী তবু তো লোকটা এ বাড়ির অতিথি। সুজাতা বরং চৌকাঠের বাইরে থেকে মামুলী প্রশ্ন করবে—ঘর পছন্দ হয়েছে তো তোমার ? লোকটা কৃতার্থ হয়ে যাবে। আর কিছু নয়, কর্তী তারমত সামান্য কর্মচারীর সুখ দুঃখের কথাটাও তাহলে ভাবেন।

সুজাতা কাঁদবার অবকাশ পায়নি। কেঁদেছিল, অঝোর ধারে কান্নার বন্যায় ভেসে গিয়েছিল, কিন্তু সে ক্ষণিকের জ্ঞান। তারপরে তাকে নিজে থেকেই সামলাতে হয়েছে। কিছুতেই সে ভুলতে পারেনি মৃত্যুপথযাত্রীর কাছে দেওয়া তার শেষ প্রতিশ্রুতি। সে কথা দিয়েছিল তাঁকে, কিছু ভেবনা তুমি, তোমার রিসার্চের কাগজগুলো বেহাত হতে দেবো না আমি। তুমি ভাল হয়ে ওঠ, ততদিন ওগুলো আমি ঠিক মতই লুকিয়ে রাখব। সে প্রতিশ্রুতি সুজাতা ভোলেনি। ডাক্তার সান্তাল যখন শেষ জবাব দিয়ে গিয়েছিলেন, তখন সেই মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও সুজাতা কথা ঠিক রেখেছিল। তার মনে হয়েছিল, সদাশিবের যথেষ্ট বরস হয়েছে। হার্টফেল করে মারা যাওয়া তাঁর পক্ষে অস্বাভাবিক ঘটনা নয়, কিন্তু এমন বিচিত্র সময়ে সেটা ঘটল কেন ? যতদিন রিসার্চের ব্যাপারটা লুকানো ছিল সদাশিবের মস্তিষ্কে ততদিন কিছু হল না তাঁর, আর যে রাতে তিনি সেগুলি কাগজে টাইপ করে ফেললেন তারপর দিনই এভাবে রোগাক্রান্ত কেন হলেন তিনি ? কাগজগুলো পেটেন্ট-অফিসে দাখিল করার আগেই এ দুর্ঘটনা ঘটল কেন ?

কেন? কেন? কেন? ঐ একই সুরে নিজেকেই সে প্রশ্ন করতে থাকে, বাপির মৃত্যুর পর অমন সুরক্ষিত কাঁটাতারের ঘেরা বাড়িতে চুরি হয়ে গেল কেন? আর সেটা ঘটল রাত্রে নয়, দিনের বেলা, সে যখন বেরিয়েছিল মাত্র ঘণ্টা দু'য়েকের জন্য। চুরি গেল অফিসঘরের ঘড়ি, আর টেবিল ক্যানটা বনোয়ারিলালের সাইকেল আর সূজাতার স্ট্রটকেশ। সূজাতা বেশ জানে চোর যে জিনিসের খোঁজে এসেছিল তা সে পায়নি। পুলিশে খবরে দিতে ইচ্ছা ছিল না সূজাতার; কিন্তু আগরওয়াল ওর আপত্তিতে কান দেননি! থানায় ডায়েরি করিয়েছিলেন। থানার বড় দারোগা রমেন গুহ নিজে এসে তদন্ত করেছিলেন। দিনের বেলা এমন দুঃসাহসিক চুরি আগরওয়াল বরদাস্ত করতে চাননি। চোর অবশ্য ধরা পড়েনি, কিন্তু চোরাই মাল প্রায় সব কিছুই উদ্ধার করা গিয়েছিল। বনোয়ারিলাল তার সাইকেল ফেরৎ পেল, সূজাতাও ফেরৎ পেল তার তালভাঙ্গা স্ট্রটকেশ। নগদ গোটা পঁচিশ টাকা ছাড়া সব কিছুই ছিল তাতে। চোরাই মাল হজম করা শক্ত হবে মনে করে রেল লাইনের ধারে সেটা নাকি চোরে ফেলে রেখে যেতে বাধ্য হয়। এটাই পুলিশের খিয়োরি, পাওয়া গেলনা শুধু অফিসের ঘড়িটা আর বৈদ্যুতিক পাখাটা।

আর যারই থাক সূজাতার তরফে এ ব্যাপারে কোন 'কেন' নেই। সে জানে চোর আসলে যা চুরি করতে এসেছিল তা পায়নি, কিন্তু এটা যে নেহাৎ একটা সাধারণ চুরির কেস, সেটা প্রতিপন্ন করতেই বেচারিকে এতগুলি জিনিস সরাতে হয়েছে। বোধকরি ময়ূরকেতন আগরওয়ালেরও 'বিবেক' বলে একটি বস্তু আছে, তাই বনোয়ারিলাল তার সাইকেল আর সূজাতা তার স্ট্রটকেশ ফেরত পেয়েছিল।

সূজাতা নেমে আসে দ্বিতল বাড়িটা থেকে। বারান্দার সামনে খানিকটা জমি বেদিপাতার বেড়া দিয়ে ঘেরা বারান্দা থেকে কাঠের ছোট গেট পর্যন্ত লাল কাকরের রাস্তা। দু'পাশে ফুলের বেড়া। যদিও ফুল নেই তাতে। বাগানের ও প্রান্তে একটি করবী ও একটি শিউলি গাছ। বাড়ির পিছন দিকে গ্যারেজ, তার উপর আধতলায় বিত্ত দাসের আস্তানা।

পায়ে পায়ে সূজাতা উঠে বার আধতলা পর্যন্ত। দরজাটা হাট করে খোলা। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সূজাতা প্রশ্ন করে—আসব?

বিত্ত একেবারে চম্কে যায়। নিয়োগকর্তা যে এভাবে বিনা এত্তেলার

একেবারে দোর গোড়ায় এসে হানা দেবেন আন্দাজ করেনি বেচারি। খালি গায়ে পায়জামা পরে খাটিয়ার বসে একটা সার্টে বোতামে লাগাচ্ছিল বিস্ম। দাঁড়িয়ে উঠে বলে, আপনি? খাটিয়ার উপর পড়ে থাকা একটা গামছা নিয়ে গায়ে জড়ায়, চওড়া লোমশ বুকটা ঢাকে।

সুজাতা শুধু ঘরের ভিতর ঢুকেই পড়েনি, একটা টুল টেনে নিয়ে বসেও পড়েছে। বলে, দেখতে এলাম, ঘর তোমার পছন্দ হয়েছে কিনা।

ডান হাতে সার্টটা ধরাই আছে। অভ্যাসবশে বাঁ হাতে ঘাড়টা চুলকে নিয়ে বিস্ম বলে, এমন চমৎকার ঘর, পছন্দ হবেনা? কি যে বলেন?

সুজাতা চারিদিকে তাকিয়ে দেখে। খাটিয়ার উপর বিস্মর সতরঞ্চি মোড়া বিছানাটা গোটানো। ও পাশে তার লাল গোলাপফুল আঁকা টিনের স্ট্রাকেশ, জানালার উপর একটা কাঠের হাত আয়না, চিক্রনি। মটোর গাড়ির কতকগুলি যন্ত্রপাতি স্তূপাকার করে রাখা আছে এক কোণায়, একটা বাতিল টায়ারও। বাগানে জল দেবার ঝারি, একটা হোস পাইপ।

: একটু বের হতাম, বলে সুজাতা।

: চলুন, এখনই আসছি। সার্টটা বিনা গেঞ্জিতেই গায়ে চড়ায়।

সুজাতা বলে, দাঁড়ি কামাওনি কেন?

গালের উপর আলতো করে হাত বুলিয়ে বিস্ম বলে, বলছেন?

: বলছেন মানে? তুমি রোজ দাঁড়ি কামাও না?

: আগে রোজ কামাতাম। সেফ্টি রেজারটা হারিয়ে যাবার পর থেকে এখন হস্তায় একদিন কামাই, সেলুনে গিয়ে।

: আর একটা সেফ্টি রেজার কিনলেই পার?

বিস্ম হাসে। ঝকঝকে একসার দাঁত বেরিয়ে পড়ে। বলে, এবার কিনব, মাইনেটা পেলেই। চলুন।

সুজাতা উঠে পড়ে। চলতে গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়ে। বিস্মর দিকে একবার দেখে নিয়ে বলে, ও কি বোতাম লাগানো হল? তিনটে সাদা বোতাম, আর একটি খাঁকি রঙের?

আবার হাতটা ঘাড়ের কাছে চলে যায়। লাজুক লাজুক মুখে বলে, সাদা বোতাম ছিলনা আর।

: তাহলে অন্য একটা সার্ট পরে নাও।

বিস্ম জবাব দেয় না। মিটিমিটি হাসে আর ঘাড় চুলকায়।

: নাটও কি ঐ একটাই ? মাইনে পেলে বুঝি সাদা বোতাম কিনবে ?

: আজ্ঞে না, বোতাম আজই কিনব। বোতাম কেনার পরস্য আছে।

: আছে ? তবে তো তুমি বড়লোক। নাও, চল।

গাড়ি কিন্তু বিত্ত দাস ভালই চালায়। কোন তাড়াহুড়া নেই। ত্রেকে বারে বারে পা দেয় না। এ্যাকসিলেটোরের উপর চাপ বাড়িয়ে কমিয়ে নিয়ে এল গাড়িটা জীমুতবাহনের বাড়ির সামনে। গাড়িটা দাঁড় করিয়ে সমস্তম্বে স্জাতার পিছনের আসনের নিক্রমণদ্বার খুলে দিয়ে বলে, আমি ঐ ছায়ায় গাড়িটা রাখছি।

বাইরের ঘরে জীমুতবাহন নেই। ঘরটা ফাঁকা। বাইরের ঘরে বসে আছে অরুপরতন। জীমুতবাহন মহাপাত্রের বড় ছেলে। বেতের চেয়ারে বসে কি একটা সাপ্তাহিক দেখছিল। স্জাতাকে দেখতে পেয়ে বইখানা রেখে এগিয়ে আসে। যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে বলে, স্জপ্রভাত। এত দেবী হল যে আপনার।

স্জজাতা একটু হেসে বলে, আপনি যে আমার প্রতীকায় প্রহর গুণছেন তা তো জানতাম না।

অরুপও হেসে বলে, সেইটাই তো ট্র্যাজেডি স্জজাতাদেবী। যে প্রহর গণে সে খেয়াল করে না অপরপক্ষকে ব্রীতিমত উকিলের নোটিশ না-দেওয়া থাকলে তার ধারণা হয় না যে তার জন্ত কেউ পথ চেয়ে বসে আছে।

—বাজে কথা রেখে বলুন, আপনার বাবা কোথায় ? তিনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন আমাকে।

—জানি। কাজের কথা ছাড়া আপনি তো কিছুই ভাবতে পারেন না। তা সেই কাজের কথা যিনি বলবেন, তিনি আমাকে জানিয়ে গেলেন যে আপনি আসছেন। আমার উপর আদেশ হয়েছে আপনাকে আপ্যায়ন করে বসাতে। স্ততরাং আপনি দয়া করে আসন গ্রহণ করুন।

আর একটা বেতের চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বসতে স্জজাতা বলে, এটা তো হল নিছক আদেশ তামিল করা, কিন্তু পিতৃদেব কি এ আদেশ দিয়ে যান নি যে তাঁর অস্থপহিতিকালে ছ'টো হাতা কথা বলে আমার সঙ্গে সম্মত কাটাতে ?

অরুপ একটা সিগারেট ধরিয়ে বলে, না সে জাতীয় কোন নির্দেশ আমার

উপর দেওয়া হয়নি, কিন্তু আমি ঠিক ক্যাসাবিয়ারার মত অন্ধরে অন্ধরে পিতার নির্দেশ নাও মেনে চলতে পারি। যদি অহুমতি করেন, দু-পেরালা কফির ফরমারেস করি এবং আলাপচারিতে আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করি।

—আমি খুশীই হব তাতে, বললে সূজাতা।

অরুণ এক পট কফির আয়োজন করতে বলল একজন ভৃত্যকে।

সূজাতা বলে, আপনার নতুন প্রায়টিশ কেমন চলছে বলুন?

হাত দুটি জোড় করে অরুণরতন বলে, আপনিও ঐ প্রশ্নটা করে দসলেন? ঐ একটি প্রশ্ন ছাড়া আর বাণতীয় প্রশ্নের জবাব দেবার জগুই যে আমি তৈরী হয়ে বসেছিলাম—

ওর ভঙ্গি দেখে সূজাতা হেসে ফেলে, বলে, কেন? এ প্রশ্নটাতেই বা অত বিব্রত হবার কি আছে?

—তা আছে। প্রথমতঃ সত্যভাষণ করতে হলে সেটা আমার পক্ষে খুব কিছু গৌরবের হয় না, দ্বিতীয়তঃ আপনার কাছে অনুভাষণে সন্কোচ হচ্ছে, তৃতীয়তঃ যে কটাক্ষ পেয়েছি তা স্বনামধন্য পিতার পুত্র হিসাবেই পেয়েছি, উদীয়মান আইনজীবী হিসাবে নয়। এসব কথা বাইরের লোকের কাছে স্বীকার করিনা, কিন্তু—

সূজাতা বলে, কিন্তু আমিও তো বাইরের লোক। না হয় আমার কাছেও এসব কথা গোপন রাখতেন?

অরুণ একটু ভেবে নিয়ে বলে, সেটা আবার আমার দ্বিতীয় নম্বর ট্র্যাঙ্কেডি।

—বুঝলাম না।

—প্রথমতঃ আপনি বাইরের লোক এটা মনে করে নিতে কষ্ট হয়, দ্বিতীয়তঃ আপনার কাছে কোন্ কথাটা গোপন করব, আর কোন্টা করব না, অর্থাৎ কোনটা আপনার কাছে আমার গোপন কথা—

বাধা নিয়ে সূজাতা বলে, আপনার তো জবর প্রায়টিশ জমে যাওয়া উচিত। সব বক্তব্যের পিছনেই দেখছি আপনার একাধিক যুক্তি থাকে। সব কথাতেই আপনি প্রথমতঃ, দ্বিতীয়তঃ, করে যেভাবে যুক্তি খাড়া করছেন—

অরুণও হেসে ফেলে, বলে, এবার তাহলে নেহাৎ অবৌক্তিক একটা কথার অবতারণা করি, অহুমতি করুন।

—বলুন।

—আপনি আমাকে একটা বিষয়ে সাহায্য করবেন ?

—কি বিষয়ে ?

—একটু ভূমিকা করি। আপনি জানেন এ বৎসর উত্তরবঙ্গে প্রচণ্ড বন্যার প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এ জাতীয় প্রাবনে সর্বস্তরের মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এটুকুই আমরা জানি। কিন্তু প্রাবনের একটা আশীর্বাদও আছে। শুধু পলিমাটিই নয়, এ বন্যা নিয়ে আসে আমাদের মত দূর মফঃস্বলের মানুষদের জন্য কিছু সেবা করার দুর্লভ সুযোগ। বন্যার্তদের জন্য প্রচুর অশ্রুপাত এবং প্রচুরতর বহুতার আয়োজন না করে আমরা কিছু অর্থসংগ্রহের প্রচেষ্টা করছি কিন্তু শুধু চাঁদার খাতা নিয়ে বাড়ি বাড়ি ধর্না দিলে এ যুগে যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করা যায় না তাই আমরা একটা নাটক মঞ্চস্থ করব বলে স্থির করেছি। দুর্জনে বলছে বটে যে জীমূতদাহন মহাপাত্র মশাই খবরের কাগজে নিজের নামটা ফলাও করে ছাপাতে এবং এ্যাসম্ব্লিতে আসনটা পাকা করার শুভবুদ্ধিতে একাজে নেমেছেন, কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমাদের আসল উদ্দেশ্য তা নয়। আমরা শুঁকে কমিটির চেয়ারম্যান করেছি, তার একমাত্র কারণ ওঁর মাধ্যমে ব্যবসায়ী মহলে সামনের দুটি রো-র সমস্ত আসন একশ টাকার টিকিট বেচতে পারব বলে। এ কাজ আসলে তাঁর নয়, আমাদের ; আমার এবং আপনার।

সুজাতা বলে, ভূমিকা তো হ'ল, এবার আসল কথাটা। আমাকে কি ভাবে সাহায্য করতে হবে, টিকিট কিনতে হবে, না বেচতে ?

—না, না, না ! কেনাবেচার হাটে বাজারে আসতে হবেনা আপনাকে। ও কাজ আপনার নয়। আপনার সাহায্য আমরা সম্পূর্ণ অন্য দিক থেকে চাইছি। এ মফঃস্বল শহরে, বুঝতেই পারছেন, মহিলা শিল্পী আমরা সুবিধামত পাচ্ছি না। নাটকে চারটি স্ত্রীচরিত্র। তার একটি আপনাকে উদ্ধার করে দিতে হবে।

—করে বাবা ! প্রায় লাফিয়ে ওঠে সুজাতা, বলে—অভিনয় আমি জীবনে করিনি ; ও আমার দ্বারা হবেনা !

—আর যাকে হ'ক, আমাকে ও কথা বিশ্বাস করতে বলবেন না। মঞ্চে অভিনয় হয়তো আপনি করেন নি কিন্তু ও কাজ আপনার দ্বারা হবেনা, এটা অবিস্বাস্য ! আপনাকে আমি মতটুকু জেনেছি—

—কতটুকু জেনেছেন আমাকে ?

অরূপ গম্ভীর হয়ে বলে, দেখুন স্বজাতা দেবী মানুষকে জানার তো কোন মাণকাঠি নেই। তার কোন যুনিট নেই। পকাশ বছর ঘর করার পরেও যদি কোন মহিলা তাঁর বৃদ্ধ স্বামীকে ঐ মোক্ষম প্রশ্নটি করেন তাহলে তাঁকেও স্বীকার করতে হবে যে ‘জীয়াশ্চরিত্রম্’ স্বহৃজের রহস্যে ঘেরা। কিন্তু কথা তো তা নয়, অন্ন পরিপক হয়েছে কিনা জানবার জন্য অন্নপাত্রের তলদেশ পর্যন্ত কি দেখার কোন প্রয়োজন আছে ?

—আমার যে গলাই উঠবে না।

—কতি নেই তাতে। জিরাফের মত গলা না হলেও চলবে আমাদের। আমরা মাইক্রোফোনের আয়োজন করেছি। মাইক-প্লে ছাড়া আমাদের কারও গলা অতটা উঠবে না। হাজারের উপর লোক হবে অডিটোরিয়ামে।

—অত লোকের সামনে আমি যদি ঘাবড়ে যাই ?

—আপনি না করতে চান, বলুন ‘করবনা’, ‘পারবনা’ বলবেন না। ইচ্ছে করলে দু-চার হাজার লোকের সামনে আপনি এক্সটেম্পোর বক্তৃতাও যে দিতে পারেন এটুকু আমি নিশ্চিত জানি।

—আমার সম্বন্ধে এমন সব আজগুবি ধারণা আপনার হুল কেমন করে বলুন তো ?

একটুকুণ চুপ করে থাকে অরূপ। তারপর সিগারেটের দন্ধপ্রায় অংশটার দিকে তাকিয়ে বলতে থাকে, আমি জানি ! এ বিংশ-শতাব্দীতে জোয়ান-অফ-আর্ক, বা কাঁসির রাণীর সম্ভাবনা অল্প; কিন্তু স্বযোগ পেলে আপনি ঐ রকমই কিছু হয়ে উঠতে পারেন বলে আমার বিশ্বাস।

স্বজাতা একটু লাল হয়ে ওঠে, তাই লজ্জাটা গোপন করবার জন্যে অকারণে হো হো করে হেসে ওঠে।

অরূপরতন কিন্তু হাসে না। একই সুরে বলে, এ রণাঙ্গনে আমার ভূমিকা দর্শক মাত্র; কিন্তু দুই প্রচণ্ড শক্তির যোদ্ধাকে যে ভাবে আপনি ভূতলশায়ী করছেন, তাতে আমি আর নিরপেক্ষ দর্শক হয়ে থাকতে পারছি না, আমি আপনার অন্ধ-তরু হয়ে পড়েছি।

জোড়া লুহুটি কুঞ্চিত হয়ে যায় স্বজাতার, বলে—আমি আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না। রণাঙ্গনই বা কোনটা, যুগল যোদ্ধাই বা কে ?

—বোঝাবার চেষ্টা আমি করব না, কারণ বুঝতে আপনি ঠিকই

পেয়েছেন। এই সঙ্গে শুধু নিবেদন করে রাখতে চাই, যদি কখনও কোন নাহায্যের জন্য আমাকে প্রয়োজন হয়, অসঙ্কোচে আমাকে স্বরণ করবেন। আপাতদৃষ্টিতে আপনার হয়তো মনে হতে পারে আমি নির্দলীয় নই; সেটা আংশিক সত্য মাত্র। আমি নির্দলীয় নই এই অর্থে যে আমি আপনার দলে।

—এতক্ষণে আপনি সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছেন!

—উপায় নেই স্বজ্ঞাতা দেবী, আপনি স্বীকার না করলে আমাকে বাধ্য হয়েই ভাববাচ্যে কথা বলতে হবে। যদি কোনদিন খোলা খুলি আলোচনা করতে চান, আমাকে তলব করবেন। কিন্তু না, এ প্রসঙ্গে আপনি বিব্রত বোধ করছেন, সুতরাং একথা থাক। আমার প্রস্তাবটার কথাই হ'ক, বলুন একটা চরিত্র অভিনয় করতে রাজি আছেন?

—বেশ, যদি আমার দ্বারা সম্ভবপর হয়, ছোটখাটো পার্ট দেবেন একটা, চেষ্টা করে দেখব।

—ছোটখাটো পার্ট তো নেই, স্ত্রীচরিত্র চারটি। মায়ের চরিত্র ঠিক হয়ে গেছে, পুত্রবধূ-প্রমীলা এবং বসন্তের স্ত্রী রেখার চরিত্রেও দু'জনকে নির্বাচন করেছি আমরা। আসলে নায়িকার চরিত্রেই উপযুক্ত লোক পাচ্ছি না আমরা।

—বইটা কী?

—অনভিনীত নাটক একটা। নাম 'অকাল বসন্ত'। পাণ্ডুলিপি থেকে অভিনয় হবে। ছাপা বই নেই।

—কার লেখা?

বিচিত্র হেসে অরূপরতন বলে, নবীন নাট্যকার একজন, এটাই তাঁর লেখা প্রথম নাটক।

স্বজ্ঞাতা হেসে বলে, আপনি উকিল হয়েও জেরার জবাব দিতে শেখেন নি। প্রশ্ন ছিল নাটকটা কার লেখা, আর জবাবে বলছেন, নাট্যকার নবীন, এটাই তাঁর প্রথম নাটক।

—নাট্যকারের নাম অরূপরতন মহাপাত্র!

—আচ্ছা! তাই এত কুণ্ঠা! আপনি নাটক লেখেন? খুব ইন্টারেস্টিং খবর তো! মোটামুটি বিষয়বস্তুটা কি? সোশাল ড্রামা?

—হ্যাঁ, সামাজিক নাটক। নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজের। পরিবারের একমাত্র

উপার্জনকম মানুষটির স্বহস্তে অব্যবহিত পরেই নাটকের পটোস্তলন হচ্ছে। সন্তোষবিধবার তিনটি সন্তান। বড় মেয়ে কলেজে পড়ে, সেই নারিক। ছোট দুটি ভাই বোনকে মানুষ করতে সে কলেজ ছেড়ে উপার্জনের আসরে নামল। কাদায় বসে বাওয়া সংসারের চাকটি আবার চলতে শুরু করে। ভাইবোন আর বিধবা মায়ের কাছে সেই বড় মেয়েই হল আশীর্বাদ। নারিক বসন্তও মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, তার সঙ্গে নারিকার পূর্বরাগের পালাটা প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে পড়েছিল, কিন্তু বসন্তকে এই নতুন পরিস্থিতিতে প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হল নারিক। এ অবস্থায় মেয়েটি বিয়ে করতে পারল না। নারিকও দূরস্ত অভিযানে সরে গেল দূরে। মা বুঝলেন, ছোট বোনও বুঝল, কিন্তু উপায় নেই। আত্মত্যাগের মহিমায় সে সংসারে মেয়েটি দেবীর পর্যায়ে উন্নীত হল প্রায়। সবাই তার অঙ্ক ভক্ত। তিল তিল করে দীপের মত নিজেকে জালিয়ে, ধূপের মত নিজেকে পুড়িয়ে সে খাড়া করে তুলল সংসারটাকে। মা গত হলেন। ভাইবোনরা স্বাভাবিক হয়ে উঠল, তারা দুজনেই ক্রমে বিয়ে করল। ততদিনে নারিকার যৌবন গত হয়েছে। বিয়ের প্রশ্ন আর ওঠেনা, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তার দৃষ্টিশক্তিও গেছে। চল্লিশ বছর বয়সেই সে প্রায়-অন্ধ। তখনকার সে-সংসারের সে একটা বোঝা মাত্র। এতদিন যে ছিল সংসারের মূলকাণ্ড আজ সে পরগাছা; জগদল বোঝা ছাড়া কিছু নয়। ইতিমধ্যে বসন্তও প্রৌঢ় হয়েছে, বিয়ে-খা করে সংসারে বসে গেছে। ছেলে মেয়েরাও বড় হয়েছে তার। ঘটনাচক্রে প্রথম যৌবনের বাস্তবীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল প্রৌঢ় বসন্তের। অন্ধ মেয়েটির প্রতি স্বতঃই করুণা হল তার। স্ত্রী রেখার প্রতি কোন বিশ্বাসঘাতকতা না করেও সে মহানুভূতির সুরে নারিকার সঙ্গে মেলামেশা শুরু করল আবার। সমাজ সেটা বরদাস্ত করেনা। ভাই বোনের মনে হয় বড়দির বুড়োবয়সে ঘোড়া রোগ হয়েছে। বসন্তের স্ত্রী অপর্ণাকে তারা সমর্থন করে, এবং সেই সমর্থনের জোরে বসন্তের স্ত্রী অপর্ণা একদিন মেয়েটিকে অপমানের চূড়ান্ত করে গেল। সকলের কাছ থেকেই প্রত্যাখ্যাত হয়ে নারিক। বুঝতে পারে এ ছুনিয়ার তার কৃমিকা শেষ হয়েছে। এখন বেঁচে থাকার অর্থ প্রাণ ধারণের মানি। একদিন বসন্ত তার জীবনে এসেছিল, সেদিন সে তাকে গ্রহণ করতে পারেনি, আর বখন সে প্রস্তুত হল তখন বসন্ত তার জীবন থেকে বিদায় নিয়েছে। এটাই নাটকের ই্যাজেডি—যদিও দৃষ্টান্ত নাটকের যবনিকা পড়ছে নারিকার আত্মহত্যায়।

তার মৃত্যুর অন্ত কেউ দায়ী নয়, এই স্বীকারোক্তি লিখে যেহেতু সংসারের বোঝা হাক করে দিয়ে যায়।

—বুঝলাম। নারিকার নামটা কিন্তু আপনি বলেন নি।

অরুণরতন আবার লাজুক লাজুক মুখে বলে, নাট্যকারের নামটা জানাতে যতটা কুঠা হয়েছিল এবার কিন্তু তার চেয়েও বেশী লজ্জা পাচ্ছি আমি।

—এ আবার কি রহস্য?

—আমার নারিকার নাম, ... মানে আমার নাটকের নারিকার নাম, স্ফূটাত।

লজ্জা স্ফূটাত পেতনা, যদি না এভাবে অরুণ মাঝপথে নিজেকে সংশোধন করে নিত। তবু সে সঙ্কোচ এড়িয়ে বলে—এতে এত কুঠার কি আছে? এ তো কাকতালীয় ঘটনামাত্র। হয় তো আমার সঙ্গে পরিচিত হবার আগেই এ নাটক লিখেছিলেন আপনি।

—কুঠা তো সেখানেই। সেটা সত্যি কথা নয়। আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার পরেই নাটকটা লেখা হয়েছে।

হো হো করে হেসে ওঠা ছাড়া আর কোন কথা খুঁজে পায়না স্ফূটাত।

ভূত্য কফির সরঞ্জাম নিয়ে প্রবেশ করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জীমূতবাহন এসে উপস্থিত হন। স্ফূটাত যে কফির কাপটা এই মাত্র ভতি করেছে সেটা বাপের দিকে এগিয়ে দিয়ে অরুণ উঠে দাঁড়ায়।

—কি হল, উঠছিস কেন? বসনা। জীমূতবাহন ঘরোয়া হতে চান।

—না, আমাকে এখনি একবার বের হতে হবে। জরুরী কাজ আছে। স্ফূটাতার দিকে ফিরে বলে, আপনাকে ফোন করে জানাব কখন আমাদের রিহার্সাল। আচ্ছা চলি—

অরুণরতন চলে যাবার পর জীমূতবাহন কফির কাপটার চুমুক দিয়ে বলেন, তুমিও কি ঐ থিয়েটারে যেতেছ নাকি?

—কাজটা তো ভাল। আর আপনিই তো এর প্রধান উদ্যোক্তা।

—হ্যাঁ, শিখণ্ডী যেমন ছিল ভ্রোণবধের প্রধান উদ্যোক্তা।

—আপনি কাজের কথা তখন ফোনে কি যেন বলছিলেন?

—হ্যাঁ, কাজের কথা। আমি জানতে চাইছিলাম, তোমরা কারখানাটা বড় করছ না কেন? প্রডাকসান বাড়াবার চেষ্টা করছ না কেন?

স্ফূটাত যেন তৈরী জবাব মুখস্ত বলে যায়, দশজনের বেশী কর্মী সংখ্যা

দেখালেই আমাদের 'ফ্যাক্টারি ল'-রের আওতার আগতে হবে। ছয়দিন কাজ করিয়ে সাতদিনের মাইনে দিতে হবে সবাইকে। ওয়ার্কান্স ইন্সুরেন্স পলিসি খুলতে হবে সবার নামে। আরও কত কি খাতা পত্র রাখতে হবে। পুরোপুরি কোম্পানি খোলার আগে কি আমার একার পক্ষে এতসব হিসাবের কামেলার মধ্যে বাওয়া ঠিক হবে ?

জীমুতবাহন পাইপে তামাক ভরে তাতে অগ্নিসংযোগ করতে করতে বলেন, দেখ স্বজাতা, হাত লুকিয়ে খেলতে হয় বলে তাশ আমি খেলিনা। সারা জীবন খোলা মনে খোলা কথা বলে এসেছি। সেজন্য আমাকে কারাবাসও ভোগ করতে হয়েছে। তোমার সঙ্গে আমি খোলাখুলি কথা বলতে চাই। তুমি যদি এবিষয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করতে না চাও আমি আপত্তি করব না, দুঃখিতও হবে না। কিন্তু যদি এটা আমরা আদৌ আলোচনা করি, তাহলে তুমি আমি দুজনেই খোলাখুলি আলোচনা করব। রেখে ঢেকে কথা বললে চলবে না। এখন তুমি বল, তুমি কি আমার সঙ্গে এ বিষয়ে আদৌ আলোচনা করতে চাও ?

—তাই করতেই তো এসেছি। রেখে ঢেকে কোন কথা ভো আমি বলছি না।

—বলছ ! কেন পেটেন্ট নেওয়া হচ্ছেনা, কেন প্রডাকশান্ বাড়ানো হচ্ছে না, কেন কোম্পানি ফ্লোট করতে তোমাদের দেবী হচ্ছে—এর একটা কথাও তুমি আমাকে বলনি, বলছ না। যদি এটা মামুলি কোন ব্যাপার হত, আমি নাক গলাতে যেতাম না। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, তোমার বাবা একটা যুগান্তকারী আবিষ্কার করে গেছেন। তাঁর সে আবিষ্কারের সুফল যদি দেশ বা জাতি না পায় তার চেয়ে দুঃখের কথা আর কিছু হতে পারেনা। দেশের সেবা আমি আজীবন করে এসেছি, আমি সব জেনে শুনে তা হতে দিতে পারি না। একথাও যেমন সত্য, তেমনি তোমার অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে কেউ তোমাকে বঞ্চিত করলে আমি নীরব দর্শকের ভূমিকায় তা সহ্য করতে পারিনা। আমার স্বার্থ শুধু এটুকুই।

—সেজন্যেই তো আপনার সাহায্য চাইছি।

—তুমি কি আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পার ?

—আমার বাবা আমাকে যতটা বিশ্বাস করতেন তার কম নয়।

—বেশ, তাহলে বল ডাঃ চ্যাটার্জির কাগজগুলো কি আগরওয়ালা পেয়েছে ?

—না !

—সেগুলো তোমার কাছেই আছে ?

—হ্যাঁ।

—সেগুলো কি বেহাত হয়ে যাবার আশঙ্কা আছে ?

—বলা শক্ত। আমি যতদূর সম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করেছি।

—কাগজগুলো কি ঐ বাড়িতেই আছে ?

সুজাতা একটু চুপ করে থাকে। তারপর বলে—আপনি সত্যিই কি এ প্রশ্নের জবাব জানতে চান ?

একটু সামনের দিকে মুঁকে পড়ে জীমূতবাহন বলেন, চাই বইকি সুজাতা ! তুমি তো সব কথাই খোলাখুলি আলোচনা করবে বলেছ।

—এবং এর পরেও যদি আপনি প্রশ্ন করেন, ‘কাগজগুলি এখন কোথায় আছে’ তাও বোধকরি সৰ্ত্ত অমুঘায়ী আমার বলে দেওয়া উচিত হবে ?

জীমূতবাহন একটু থতমত খেয়ে যান। সামলে নিয়ে বলেন, কিন্তু তুমিই তো তখন বললে যে আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস কর—

—তাবলিনি স্মার, আমি বলেছি, আমি আপনাকে ততখানিই বিশ্বাস করি, যতখানি আমার বাপি আমাকে করতেন। একটা ঘটনা বলি, বাপিকে একদিন প্রশ্ন করেছিলাম, সিগার-ব্লকে জোড় লাগাবার জন্য যে ক্যাটালিটিক এজেন্টটা ব্যবহার করছেন সেটা আসলে কী ! উত্তরে তিনি বলেছিলেন, কোতুহল জিনিসটা ভাল, অহেতুক কোতুহলটা নয় !

হঠাৎ কেমন যেন অপমানিত বোধ করেন জীমূতবাহন। বেশ একটু রাগত ভাবেই বলেন, অর্থাৎ রিপোর্টটা ও বাড়িতে আছে কিনা জানতে চাওয়া আমার পক্ষে অহেতুক কোতুহল !

সুজাতা হেসে বলে, অহেতুক কোতুহল নিশ্চয়ই। কোন উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে নিশ্চয় আপনি ওটা জানতে চাইছেন না।

—সে কথা মনে করছ কেন ? উদ্দেশ্য নিশ্চয় কিছু আছে !

—কী সেই উদ্দেশ্য ?

—তুমি কি আমার কৈফিয়ৎ চাইছ ?

সুজাতা দিব্য হেসে হেসে বলে, কী আশ্চর্য ! সৰ্ত্ত হয়েছে আমরা দুজনেই খোলাখুলি কথা বলব। আলোচনা মানে এ নয় যে, আপনিই এক তরফা সওয়াল করে যাবেন এবং আমি জবাব দিয়ে যাব !

জীমূতবাহনের মনে হল যেহেতু একান্তি পক্ষের অরূপরতনের চেয়ে তাড়াতাড়ি প্রাকটিক জমাতে পারত! গলাটা সাকা করে নিয়ে বলেন, আমার উদ্দেশ্য জেনে নেওয়া যে কাগজগুলো বেহাত হয়ে যাবার কোন আশঙ্কা আছে কিনা।

সুজাতা বলে, কাগজগুলো অত্যন্ত গোপন স্থানে লুকিয়ে রেখেছি। না হলে ইতিপূর্বেই তা চোরের হাতে চলে যেত। জানেন নিশ্চয়, ও বাড়িতে ইতিমধ্যেই একদিন দুঃসাহসিক চুরি হয়ে গেছে।

—জানি। তাই তো জানতে চাইছি, কাগজগুলো আগরওয়ালের হাতে পড়েছে কিনা।

—না পড়েনি।

জীমূতবাহন বার কয়েক চুরুটে টান দিয়ে বলেন, বেশ ধরে নিলাম তোমার কথাই সত্যি। সেগুলো সংরক্ষিত আছে। এখন তুমি কি করতে চাও? ও কাগজগুলো চিরকাল লুকিয়ে রেখে তোমার কিছু লাভ হবে না, নিজেও তুমি পেটেন্ট নিতে পারবে না। কোন বিশ্বস্ত বৈজ্ঞানিকের সাহায্য তোমাকে নিতেই হবে। সে বিষয়ে তুমি কি করছ?

সুজাতা বুঝতে পারে, জীমূতবাহন বুঝতে পেরেছেন—কাগজপত্রগুলি কোথায় আছে তা সুজাতা জানাতে চায়না। লেবু বেনী কচকালে তেতো হয়ে যায় এ সত্য তাঁর জানা আছে। তাই ও প্রশ্ন আর করলেন না। সুজাতা একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। বলে, আপনি আমাকে কী পরামর্শ দেন?

—আমি তো তোমাকে কোন পরামর্শ দেব না সুজাতা। তোমার সামনে দুজন ব্যক্তি আছেন, তাঁদের মধ্যে একজনকে বেছে নিতে হবে তোমাকে। শুধু তোমাকেই। অজানা অচেনা তৃতীয় পক্ষের দ্বারস্থ হওয়া এ অবস্থায় তোমার পক্ষে উচিত হবে না। ফলে যে-দুজন সম্ভাব্য ক্যান্ডিডেট আছেন তাঁদের মধ্যে একজনকে বেছে নিতে হবে। তাদের অতীত ইতিহাসকে জেনে নিয়ে তোমাকেই মনস্থির করতে হবে। কাকে বিশ্বাস করবে সে তোমার বিবেচ্য।

—আমি কিন্তু তার তৃতীয় পক্ষেরই দ্বারস্থ হব বলেই স্থির করেছি।

চমকে ওঠেন জীমূতবাহন—বলেন, এখন তৃতীয় পক্ষ? যানে? সে আবার কে?

—কে তা জানি না। তবে আপনি বা আগরওয়ালার নয়!

জীমূতবাহন যেন ভাষা খুঁজে পাননা প্রথমটার। তারপর ঢৌক গিলে বলেন, আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না!

—বলছি। আপনি খুব খোলাখুলি বলতে বলেছেন, তাই খোলাখুলিই বলছি আমি! আগরওয়ালের চেয়ে আপনাকে অনেক অনেক বেশী বিশ্বাসযোগ্য মনে করি আমি। আপনি শুধু অতীত ইতিহাসটা যাচাই করে দেখতে বলেছেন—তাই যদি দেখতাম, তাহলে মনস্থির করতে আমার সময় লাগত না, কিন্তু মাপ করবেন স্যার, অতীত ছাড়া বর্তমানটাকেও যে আমি গুরুত্ব করে দেখছি! আজ আপনার পরিচয় শুধু দেশসেবক নয়, আপনি দেশনেতা—প্রকাণ্ড ব্যবসায়ী! আমি স্থির করেছি একজন খুব বিশ্বস্ত এ-ক্লাস মলিসিটার্স কার্মকে আমার সমস্তটা জানাব। তাঁরা যে ভাবে পরামর্শ দেন সেই ভাবে অগ্রসর হব আমি—

জীমূতবাহন রাজনীতিকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেছেন। কথা বেচে যাচ্ছেন আজকাল। মুহূর্তমধ্যে তিনি ভোল পালটে পেলেন। সূজাতার স্কুল ইন্জিতের স্ক্রল খোঁচাটা তাঁর অন্তরে বিঁধেছিল ঠিকই, তাই যেন তা বুঝতেই পারেন নি এ ভাব বজায় রেখে হঠাৎ একেবারে খুশিয়াল হয়ে ওঠেন। সর্বাস্তঃকরণে তাকে সমর্থন করে বলে ওঠেন, খুব ভাল কথা! আমি খুব ভাল একজন মলিসিটার্সকে খবর দিচ্ছি। মিস্টার দত্ত বার এ্যাট-ল্‌য়ানে ঝাঁর জুনিয়ার হিসাবে অরূপ কাজ শিখেছে, আমি লিখলেই—

বাধা দিয়ে সূজাতা বলে, না না, তাঁকে আর কষ্ট দিতে হবে না। আমি নিজেই আমার মলিসিটার্স খুঁজে নেব—

ঐ একফোটা মেয়েটার কাছে প্রতি চালেই বাধা পেয়ে ধৈর্য রাখতে পারেন না ধুরন্ধর ব্যবসায়ী জীমূতবাহন মহাপাত্র, বলেন—তুমি যখন আমাকে বিশ্বাসই করনা, তখন আমার কাছে এলে কেন?

সূজাতা বলে, আপনাকে বিশ্বাস করি বলেই এসেছি। এসেছি কেন? এসেছি আপনার কাছ থেকে একটি পরিচয় পত্র লিখিয়ে নেব বলে।

—পরিচয় পত্র? কার নামে? কি উদ্দেশ্য?

—‘টু হুই ইট মে কলার্ণ’ বলে লিখে দিন। আমি কালপত্রের মধ্যেই কলকাতা যাচ্ছি। কিন্তু আমার আশঙ্কা হচ্ছে, কোন নামকরা মলিসিটার্স-কার্ম আমাকে পাতাই দেবেনা। আমার বিবর আশর, ব্যাঙ্ক ব্যালেন কিছুই

নেই। বাপির আবিষ্কারের কথাটা তারা হয়তো আঘাতে গল্প বলে উড়িয়ে দিতে চাইবে। আপনার ইন্টেলিজেন্স থাকলে আমি অন্তত আমার বক্তব্যটা পেশ করার একটা সুযোগ পাব।

জীমুতবাহন গুচ হাসি হেসে বলেন, কিন্তু আমি কোন স্বার্থে তোমাকে এই পরিচয় পত্র লিখে দেব, তাতো বললে না সূজাতা?

—আপনার তো একটিই স্বার্থ আছে। এখনই আপনি বলেছেন তা। বাপির আবিষ্কারটা যাতে চিরকাল বাস্তব বন্দী হয়ে না থাকে, আর আমাকে কেউ যেন না ঠকিয়ে নিতে পারে। এ ছাড়া তো আপনার আর কোন স্বার্থ নেই? তাই বললেন না তখন? না কি ভুল বুঝেছি আমি?

জীমুতবাহন বিনা বাক্যব্যয়ে লেটার-হেড প্যাডখানা টেনে নেন।

বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে এসে সূজাতা দেখে বারান্দার প্রান্তে সেই বেতের চেয়ারখানায় বসে অরুণরতন আগের মতই সিনেমা সাপ্তাহিকের পাতা ওন্টাচ্ছে। সূজাতাকে দেখতে পেয়ে বই রেখে এগিয়ে আসে। সূজাতা হেসে বলে, আপনার ভাবখানা দেখে মনে হচ্ছে সেই একই কথা বলবেন আবার?

—একই কথা মানে?

—‘এত দেরী হল যে আপনার? সেই কখন থেকে বসে আছি!’

হুজনেই হেসে ওঠে।

অরুণরতন বলে, আপনি তো বেশ খট-রিড্ডিং জানেন!

—তা তো জানি, কিন্তু আপনি যে তখন আপনার বাবার কাছে বললেন, আপনার কি জরুরী কাজ আছে?

—জনান্তিকে আপনার সাক্ষাত পাওয়ার জন্য বসে থাকাটা কি জরুরী কাজ নয়?

পায়ে পায়ে ওরা বারান্দা অতিক্রম করে নেমে পড়ে বাগানে। লাল কাকরে পথটা পার হয়ে এগিয়ে আসে গাড়ির দিকে। ড্রাইভার বিত্ত দাস দরজা খুলে দেয়। সূজাতা উঠে বসে, পিছনের সীটে। মুখ বাড়িয়ে কি একটা কথা বলতে যায়, তারপর থেমে গিয়ে লক্ষ্য করে অরুণরতন একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে বিত্ত দাসের দিকে। অরুণই প্রথম কথা বলে, বিত্ত দাসের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলে, আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো?

বিত্ত চমকে পিছন ফিরে তাকায়। কথা বলে না।

সূজাতাই জবাবে বলে—ও আমাদের ড্রাইভার, বিত্ত। বিশ্বনাথ দাস।

অরুণ বিজ্ঞকেই প্রশ্ন করে, আপনি ক্রিকেট খেলতেন ?

বিশু বোকার হাসি হাসে বলে, আমাকে আবার ‘আপনি’ কেন আর ? আপনি আর কারও সঙ্গে আমাকে ভুল করেছেন। ডাংগুলি আর চোর চোর ছাড়া আর কোন খেলা জানি না আমি।

—আপনার নাম বিশ্বনাথ দাস ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। অভ্যাসে ওর হাতটা ষ্টিয়ারিং ছেড়ে ঘাড়ের কাছে চলে যায়।

—আপনি আর কারও সঙ্গে ভুল করেছেন—বলে সূজাতাও।

অরুণরতন তবু হাল ছাড়ে না। বলে, আচ্ছা আপনার কোন ভাই কি শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়তেন ? কী সাম মিত্র ?

ঘাড় চুলকাতে চুলকাতে বিশু বলে, আজ্ঞে না। আমরা কায়েৎ নই। মিত্তিরদের সঙ্গে আমাদের বে-খাই হয় না।

সূজাতা এ পরিচ্ছেদের যবনিকা টানতেই বোধকরি বলে ওঠে—কখন আপনার রিহার্সাল হবে আমাকে টেলিফোনে জানাবেন—

অরুণরতন জবাব দেয় না। সে বেশ অন্তমনস্ক হয়ে পড়েছে।

জীমূতবাহনের কম্পাউণ্ড থেকে বেরিয়ে এসে বিশু দাস বলে—সোজা বাড়িই যাবেন তো ?

—না পোষ্ট অফিসে চল একটু।

পোষ্ট অফিসে গাড়ি থেকে নেমে রেজিস্ট্রেশন অফিসের দিকে যেতেই একটি সূদর্শন ছেলে হাত তুলে তাকে নমস্কার করে বলে, শুধু শুধু আপনি খোঁজ নিতে আসেন। আপনার টেলিফোন নাম্বার আমার লেখা আছে। রেজিস্ট্রেশনটা এলেই আপনাকে ফোন করব আমি।

—পিয়নের হাতে পাঠাবেন না যেন।

পাঁচশ’ টাকার ইনসিওর্ড প্যাকেট পিওন ডেলিভারি দেয় না।

—সে তো সেদিনই বললেন। নোটিশও দেবেন না, শুধু ফোনে আমাকে জানাবেন।

—ঠিক আছে।

পোষ্ট অফিস থেকে বেরিয়ে আবার গাড়িতে উঠে বলে, বাজারে যাব একটু। ড্যারাইটি স্টোরের সামনে একটু রেখ।

বড় মণিহারী দোকানটার সামনে গাড়ি রেখে বিশু দরজা খুলে দেয়। সূজাতা বলে, গাড়ি লক করে তুমিও এস।

—আমি ? আমি আপনার সঙ্গে দোকানে আসব ?

—আসবেনা ? আমি কি জানি কোন সেক্টি-রেজার-সেট ভাল ? কত ইঞ্চি কলারের সার্ট তোমার গায়ে লাগবে ?

একগাল হাসলে বিত্ত দাস ।

॥ বার ॥

পাঁচটার মধ্যেই সূজাতা তৈরী হয়ে নিচে নেমে আসে । রিহার্সাল শুরু হবে সাড়ে ছয়টায় । সেটা হবে জেলা-সমাহর্তা ঘোষ সাহেবের বাড়িতে । ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেব নিজে নাট্যামোদী মানুষ, যদিও নিজে কোন চরিত্রে তিনি অভিনয় করছেন না । কিন্তু তাঁর মেয়ে প্রগতি ঘোষ করছে সূজাতার ছোট বোন সুলতার চরিত্র । তাই মহড়ার আয়োজন হয়েছে ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেবের বাড়ীতে । কথা ছিল, সূজাতা যাওয়ার পথে অরুপরতনকে তুলে নিয়ে যাবে । সে জন্য একটু সকাল করেই নেমে আসে সূজাতা ।

গাড়িটা গ্যারেজ থেকে বার করা আছে ; কিন্তু বনেটটা বিরাট মুখব্যাধান করে দাঁড়িয়ে আছে । বিত্ত হুমড়ি খেয়ে পড়ে যন্ত্রপাতি দেখছে ।

—কী হল ? গাড়ি গড়বড় করছে নাকি ?

—না স্যার, নতুন গাড়ি, গড়বড় করবে কেন ? রেডিয়েটারে একটু জল দিতে হবে । নেংটি জল আনতে গেছে । বসুন না ।

সূজাতা লক্ষ্য করে দেখে বিত্ত দাস আজকে পরিষ্কার করে দাড়ি কাঁচিয়েছে । গায়েও চড়িয়েছে পাট ভাঙা নতুন সার্ট । পিছনের দরজার পালাটা খুলে দেয় বিত্ত দাস । সূজাতা কিন্তু ওঠে না । মাডগার্ডের পাশে দাঁড়িয়ে ড্যানিটি ব্যাগ খুলে ছোট আয়নার মুখটা দেখতে থাকে, খোঁপাটি ঠিক করে ।

পিছন থেকে বিত্ত বলে, একটা কথা ; আপনাকে কি বলে ডাকব ?

আয়নার ভিতরে তাকিয়ে মুখ না ঘুরিয়েই সূজাতা বলে, আর পাঁচজনে যে নামে ডাকে সেই নামেই ডাকবে । আমাকে ডাকবার জন্য তোমার আবার নতুন নাম চাই নাকি ?

বিত্ত বেশ মরমে মরে যায় । অভ্যাস বেশে হাতটা চলে যায় খাড়ের কাছে । বলে, আজ্ঞে না, তা নয় । ব্যাপারটা হচ্ছে কি, বানে, আর পাঁচজনে তো

আপনাকে ডাকে স্বজাতাদেবী বলে। কেউ কেউ বলে মিস্ চ্যাটার্জি। তা আমি হলাম গিরে আপনাদের মাইনে করা ড্রাইভার। আমি তো আর তা ডাকতে পারি না। তাই বলছিলাম—

স্বজাতা ড্যানিটি ব্যাগ বন্ধ করে সমস্তটা ভেবে দেখতে থাকে।

বিশু ড্রাইভার আবার নিজেকে থেকেই বলে, বছর কয়েক আগে এক মাদ্রাজি সাহেবের কাছে কাজ করতাম, বুয়েছেন, তাঁর গিরি ছিলেন একেবারে মিশ্ কালো রঙের। মানে এত কালো যে ‘লিফ্টিং’-কাজল গুর যে কোন একটা পেলেই তাঁর দুটোর কাজ হয়ে যেত ঠোটে কাজল, বা চোখে লিফ্টিং লাগালেও কিছুটা মালুম পাওয়া যেত না! তাঁকে ‘মা’-ডাকতে তিনি মহা খাল্লা হয়ে উঠেছিলেন আমার উপর। শুনলাম অমন মা রক্ষাকালীকে নাকি ‘মেম-সাহেব’ বলে ডাকার রেওয়াজ ছিল সে বাড়িতে।

স্বজাতা হাসি চেপে গম্ভীর হয়ে বলে, তা আমার গায়ের রঙও তো মেমেদের মত ফর্সা নয়—

—না, মানে সে কথা নয়। তা বেশ, আপনাকেও না হয় ‘মেম সাহেব’ বলে ডাকব।

—না না, মেম সাহেব আবার কি? ও আমার একটুও পছন্দ নয়।

—তবে কি ‘মা’-ডাকব।

—ওরে বাবা! তোমার মত ছেলের মা হতে হলে আমাকে অনেক বুড়ি হতে হবে বাপু!

—এ্যাই দেখুন, এই সমিস্তুর মধ্যোই আমি তখন থেকে হাবুডুবু খাচ্ছি। কি বলে ডাকব আপনাকে? মানে, নামটা শুনতে বেশ মিষ্টি হবে;—না মানে খুব বেশী মিষ্টি হবেনা—

—এই টক-ঝাল-মিষ্টি-মিষ্টি লজ্জেলের মত? স্বজাতা গম্ভীর হয়ে বলে।

—এ্যাই দেখুন! আপনি তখন থেকে শুধু রহস্যই করছেন।

—তা আমাকে অত ডাকাডাকি করার দরকারই বা কি?

—বাঃ! প্রয়োজন হবে না, বলছেন? ধরুন গিরে আমি আপনার পিছন বাগে আছি, আপনি ওদিকে কিরে আছেন; এখন আমি না ডেকে তো আপনার মুখ কিরাতে পারছি না। তখন আমি, কি বলে ডাক—

—তখন তুমি, কি বলে ডাক, আমার সামনের ‘বাগে’ চলে আসবে! তাহলেই আমি তোমাকে দেখতে পাব। আর ডাকবার প্রয়োজন হবে না তোমার!

বিশু একগাল হেসে বলে, এ যে সেই ভিলাই-সাহেবের মত কথা বললেন আপনি !

—ভিলাই-সাহেব কে ?

—আমি ভিলাইয়ে এক সাহেবের কাছে ডাইভারি করতাম। তাঁর কি জান ভাল, প্রকাণ্ড একটা নাম ছিল। তা আমার উচ্চারণই হয় না। তা তিনি না পারেন বাঙলা-হিন্দি বলতে, না ইংরিজি। প্রথমটা আমার বিশ্বাসই হয়নি, লাল-মুখো খাম-সাহেব ইংরিজি বলতে পারেনা, সে আবার কিরে বাবা ? কিন্তু শেষে শুনলাম, ও একজাতের সাহেব আছে যারা ইংরিজিও জানে না। অনেক চেষ্টা করে সে অল্প অল্প হিন্দি শিখেছিল। মাসখানেক কাজ করার পর একদিন সাহেবের খাম বাবুচি আমাকে খবর পাঠালো সাহেব মাইনে নিতে ডেকেছেন। মাইনে নিতে তাঁর ঘরের দোরের সামনে দাঁড়িয়ে নিয়ম মাসিক আমি দরজায় ঠক্ ঠক্ করলাম। সাহেব টেবিলে বসে কি যেন লিখছিলেন, মুখ তুলে আমাকে দেখতে পেয়ে বললেন, ইধার আও। আমি নমস্কার করে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াই। সাহেব আমার হাতে একটি বন্ধ খাম দিলেন। হাতে হাতে তিনি মাইনে দিতেন না। খামে বন্ধ করে দিতেন। টাকাটা নিয়ে আমি ফের নমস্কার করলাম। সাহেব ইতস্তত করলেন খানিকক্ষণ। তারপর উঠে দাঁড়ালেন। আমি তখনও বুঝতে পারিনি সাহেবের সমস্তের কথাটা। আসলে সাহেব বলতে চাইছেন, 'এবার তুমি যাও।' কিন্তু তাঁর হিন্দিটা তাঁর মনে আসছে না। হাত নেড়ে তিনি আমাকে চলে যেতে বলতে পারতেন ; কিন্তু তিনি বোধহয় ভেবেছিলেন সেটা খুব অভদ্রতা হবে। চাকর-বাকরদের সঙ্গেও তিনি খুব ভদ্র ব্যবহার করতেন। শেষ বেশ কলম বন্ধ করে সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। গট গট করে ঘর ছেড়ে বারান্দার বেয়িয়ে গেলেন। এবার সেখানে দাঁড়িয়ে আমার দিকে ফিরে বললেন, 'ইধার আও' !

স্বজ্ঞাতা হো হো করে হেসে ওঠে। একসঙ্গে অতগুলো কথা বলে বিশু দাস খুব লজ্জা পায়। ঘাড়টা আবার চুলকাতে থাকে।

—আপনি যদি রাগ না করেন, আমি আপনাকে 'ম্যাডাম' ডাকতে পারি। এক মেমসাহেবকে তাই ডাকতাম আমি।

—ম্যাডাম ! তা মন্দ নয়। 'মাদমোয়াজেল'ও ডাকতে পারি।

—ওটা মস্ত বড় নাম। সেই ভিলাই-সাহেবের নামের মত। আমার অতবড় নাম উচ্চারণই হবে না।

—তবে ঐ ম্যাডামই ভাল।

ইতিমধ্যে ক্লিনার নেংটি এসে এক বাসতি জল রেডিয়েটারে ঢেলে দিয়েছে।
বিশ্ব আবার পিছনের দরজাটা খুলে ধরে। সূজাতা কিন্তু পিছনের সীটে
যায়না আজ। ডাইভারের পাশের সীটে উঠে বসে। গাড়ি বেরিয়ে যায়
গেট দিয়ে।

কারখানাটা শহর থেকে মাইল তিনেক দূরে। পথটা মসৃণ পিচের এবং
লোকজনের যাতায়াত এদিকটায় সচরাচর কম। বিশ্ব এ্যাকসিলারেটরে পা
দেয়। সূজাতা হাত ঘড়িটা দেখে বলে, অনেক আগে করে বেরিয়েছি,
চল নদীর ধারে এক চকর ঘুরে তারপর যাওয়া যাবে।

ঘাঁচ করে ত্রেক কবে বিশ্ব। গাড়িটাকে রাস্তার বা পাশে এনে বলে,
কিন্তু নকুলবাবুকে কি কৈফিয়ৎ দেব ?

হঠাৎ ক্রমে শুঠে সূজাতা। বলে, নকুলবাবুকে কোন কৈফিয়ৎ তোমাকে
দিতে হবে না। গাড়ির মালিক নকুল হই নয়, সে ম্যানেজার মাত্র। লগবুকে
বা লিখবার তা আমিই লিখব। কত কিলোমিটার নদীর ধারে ঘুরেছি তা
লিপে দেবার দায় আমার।

বিশ্ব বিনা বাক্যব্যয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে নেয়।

সূজাতার মনটা হঠাৎ বিষিয়ে উঠেছিল নকুল হইয়ের উল্লেখ।
আগরওয়ালের সব ব্যবস্থাপনার ভিতরেই ডবল-চেকিংয়ের আয়োজন। সূজাতা
গাড়িটা ব্যবহার করবে, সূজাতার হুকুম ছাড়া গাড়ি গ্যারেজ থেকে বার
হবে না, অথচ পেট্রোলের খরচ ঠিকমত হচ্ছে কিনা সে হিসাব দেখে নেবে
নকুল হই, লগবুক আর পেট্রোল-স্লিপ মিলিয়ে দেখে। অদ্ভুত ব্যবস্থা।
আগরওয়াল বোধকরি তার নিজের ডান হাতখানাকেও সর্বান্তঃকরণে
বিশ্বাস করেনা, বা হাতখানাকে সতর্ক করে রাখে ডান হাতের কার্যকলাপের
উপর নজর রাখতে। সূজাতা পেট্রোল চুরি করবে এ আশঙ্কা নিশ্চয়ই
তার নেই, তবু প্রথামাফিক সে সাবধানতা অবলম্বন করে চলে। জিজ্ঞাসা
করলে বলে, ট্রেনে দেখনি, জঙ্গ-সাহেব, কিম্বা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে চিনতে
পারলে টিকিট চেকার সেলাম দেয়, হাতখানাও বাড়িয়ে দেয় টিকিটখানা
পাক করে দিতে। ওতে মনে করার কিছু নেই। ওই হচ্ছে নিয়ম।

গাড়িটা এতক্ষণে বড় রাস্তা ছেড়ে বাঁধের সড়কে নেমেছে।

নদীর কিনার বরাবর লম্বা বস্তারোষি মাটির চওড়া বাঁধ। তার উপর

লাল কঁকরে সড়ক, ইরিগেজন বিভাগের রাস্তা। এ রাস্তার গরুর গাড়ি বেতে দেওয়া হয় না, ভারি ট্রাকও নয়। পদাতিক অথবা সাইকেল আরোহী অবশ্য চলেছে কিছু কিছু। দুধারে খেজুর, বাবলা, রাধাচূড়া আর রেইনট্রি গাছ। খেজুর গাছে কলসি বাঁধা, রাধাচূড়ার আর কুসুচূড়ার অজস্র ফুল ফুটেছে। খোলা হাওয়ার সূজাতার চুলগুলো অবাধ্যতা শুরু করেছে। হাত দিয়ে বারবার ঠিক করে নিতে হচ্ছে।

মুক্ত প্রকৃতির একটা অদ্ভুত মোহ বিস্তারের ক্ষমতা আছে। নাগরিক জীবনের কৃত্রিমতার মধ্যে আমরা ভদ্রতার অভিনয় করে চলি, হঠাৎ খোলা আকাশের তলায় এসে তার বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। মানুষের মনের মুখোমুখি হয়ে যায়, অন্তরাখ্যা যেন আদম ঈভের মত বাধাবন্ধনহীন নিরাবরণরূপে বেরিয়ে আসতে চায়। সূজাতা এই দিগন্ত অসুসারী ফাঁকা মাঠ, আর সমুদ্র-অভিনারী নদীর মাঝখানে সীমস্তিমী নারীর রক্তিম সিঁথির মত সরু লাল পথ বেয়ে দ্রুতবেগে ছুটেছে ছুটেছে কণিকের জন্ত ভুলে গেল তার যাবতীয় সমস্তা, তার বাপির রিসার্চের কাগজগুলোর কথা, তার জীবনের জটিলতা, আগরওয়ালের কুট-কৌশল আর মহাপাত্রে লুক্ক দৃষ্টি। কৈশোরে পদার্পণ করে বেণী দোলানো যে বালিকাকে চিরতরে বিদায় দিয়েছিল একদিন, সেই বালিকা-সূজাতা তাহলে হারিয়ে যায়নি। সূজাতার পরিণত বক্ষের অন্তরালে সে তাহলে লুকিয়ে বসে ছিল এতদিন। দ্রুতধাবমান গাড়ির গতির বেগে সেই ছোট মেয়েটি আজ হঠাৎ বেরিয়ে আসতে চাইল।

বাঁধের ধারে একটা গ্রাম। খড়ের চালার হলুদ রঙের ঝিঙে-ফুল, ঘুঁটের ছোপ ধরা বুড়িয়ার মেঠো-দেওয়াল, বাবলা গাছে খুঁটিতে বাঁধা রোমহনরত এলায়িত দেহ গরু, ডাংগুলি-বাস্ত কতকগুলো উলঙ্গ গ্রাম্য শিশু। অন্তর্যমান পূর্বের দিকে মুখ করে একটি পল্লীবধু শাখে ফুঁ দিল।

সূজাতার মনে হয়, আচ্ছা সন্ধ্যাবেলা আমরা শাখে ফুঁ দিই কেন? লক্ষ্মীকে আবাহন করতে। কিন্তু শাখ কেন? বাঁশী নয়, কঁাসি নয়, তানপুরা নয়, অমন লক্ষ্মীমেয়েটিকে ডাকতে এমন কর্কশ-নিমাদী শব্দ কেন বাজাই আমরা? ভৈরবের আছে বিষণ, আর ডব্বর; সেটার মানে বুঝি—তাণ্ডবনৃত্যের সঙ্গে সেগুলো ভাল রেখে চলে। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী আর সরস্বতীর বীণার সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কটা বেশ খাপ খায়। অনেক ইতিকথা আছে তাদের পিছনে। কালিপূজার রাতে ঐ সব পটকার প্রচণ্ড নিমাদ, আর কিছু নয় কালীমূর্তির পরিকল্পনার সঙ্গেও

খাপ খেয়ে যায়। কিন্তু ঠাণ্ডা মাছুষ লক্ষ্মীর সঙ্গে ঐ কৰ্কর-ধ্বনি শব্দের সম্বন্ধ কি? আছে একটা নিগূঢ় সম্বন্ধ। শব্দ হচ্ছে সমুদ্রের সম্পদ। লক্ষ্মীর জন্ম হয়েছিল সমুদ্রে। তাঁর বাল্যকাল কেটেছে ঐ শাঁখের পড়ায়। তাই শব্দধ্বনিতে লক্ষ্মীর মনে পড়ে যায় বালিকা বয়সের স্মৃতি। পরিণত বয়স্কা নারায়ণীর মনের মধ্যে থেকে উকি মাঝে ছোট লক্ষ্মীমেয়ে একটি।

আজ সূজাতার যা হচ্ছে।

হঠাৎ প্রশ্ন করে সূজাতা, আচ্ছা বিত্ত, ‘পরশপাথর’ কাকে বলে জান?

বিত্ত একটু অবাক হয়, এবার আড়চোখে দেখে নেন সূজাতার দিকে, জবাব দেয় না। সূজাতা দ্বিতীয়বার বলে, কই বললে না? পরশপাথর কাকে বলে জান?

এবার বিত্ত বেশ সপ্রতিভ ভাবেই বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ, পরশপাথর চিনি বইকি। মার্বেলের মত দেখতে; গোল, এই এ্যাতটুকুন।

ষ্ট্রিয়ারিঙ থেকে হাতটা তুলে মাপটা সে দেখায়।

সূজাতা হাসি গোপন করে বলে, আরে বাসরে! তুমি যে পরশ পাথরের মাপ পর্যন্ত জান! অতটা আবার জানতুম না আমি।

বিত্ত বেশ সহজস্বরেই বলে যায়, জানিনা ওর চেয়ে বড় সাইজের পরশপাথর পাওয়া যায় কিনা। আমি যেটা দেখেছিলাম সেটা ঐ সাইজের।

সূজাতা যেন আরও ছেলেমানুষ হয়ে ওঠে। কী সরল ঐ গ্রাম্য অশিক্ষিত ছেলেটা। চোখ পাকিয়ে বলে, আচ্ছা! পরশপাথর তুমি তাহলে দেখেছ! আমি শুধু নামটাই শুনেছি, স্বচক্ষে দেখিনি কখনও। আছে নাকি তোমার কাছে দু-একটা?

—আজ্ঞে না। আমি তো কোন পরশপাথর কুড়িয়ে পাইনি। পরেশবাবু একটা পেয়েছিলেন।

—কি হয় পাথরটার?

—যাতে ছোয়ানো যায় তাই সোনা হয়ে যায়, আবার কি?

—তাই বুঝি? তা তোমার পরেশবাবুর কাছে থেকে পাথরটা একবার চেয়ে নিরে আসতে পার না? এই গাড়িটাকে ছুঁইয়ে দিতাম, এটা সোনার গাড়ি হয়ে যেত।

বিত্তের হাসি হেসে বিত্ত বলে, তাতে লাভ হত না কিছু। গাড়িটা অচল হয়ে যেত শুধুমুখ। পরেশবাবুরও তাই হয়েছিল। শেষপর্যন্ত ভবলোক রেগে মেগে ঐ সর্বনেশে পাথরটা কেনেই দিয়েছিলেন।

—পরেশবাবু কে বলত ?

—তা আমি কি জানি ? একটা বাইস্কোপে দেখেছিলাম ।

—এতক্ষণে হালে গানি পার স্জাতা । ‘পরশপাথর’ সিনেমা দেখে বিত্ত দাস জানতে পেয়েছে পরশপাথরের মাপ মার্বেলের মত, এই এ্যাস্ট্রটুকুন !

স্জাতা বলে, জান বিত্ত, আমি ঐ রকম একটা পরশপাথর হঠাৎ পেয়ে গেছি । সেটা নিয়ে কি করি বলত ?

অগ্নানবদনে বিত্ত বলে, টান মেয়ে ফেলে দিন নদীর জলে । শেষবেশ ফেলেই তো দিতে হবে পরেশবাবুর মত । শুধুমুখ খানিক নাচানাচি করে কি লাভ বলুন ?

কথাটা ভেবে দেখার অপেক্ষা রাখে । প্রায় দার্শনিকের মত নিরুত্তাপ উদাসীনতায় বিত্ত ড্রাইভার যে অস্তিম নিদান হেঁকেছে তার বাথার্থ্য অনুধাবন করবার মত । তবু একটু ভেবে নিয়ে স্জাতা বলে, কিন্তু ওটা দিয়ে তো অনেকের অনেক উপকার করা যেতে পারে । কত গরীব দুঃখীর বরাত ফিরিয়ে দেওয়া যায় ওটা দিয়ে ; না কি বল ?

বিত্তও একটু ভেবে নিয়ে বলে, আজ্ঞে তা তো ষায়ই ।

—কিন্তু আপাতত ওটা আমি নিজের কাছে রাখতে সাহস পাচ্ছি না । আমি যে পরশপাথরটা লুকিয়ে রেখেছি, একটা চোর স্নে কথো জানতে পেয়েছে । দেখলে না, আমার ঘরে সেদিন চুরি হয়ে গেল ? চোর অবশ্য সেটা খুঁজে পায়নি । ওটা যদি তোমার কাছে রাখতে দিই, তুমি কিছুদিন সেটাকে লুকিয়ে রেখে দিতে পার ?

—আমি ? আজ্ঞে না । আমার তো থাকার মধ্যে ঐ এক ভাঙা স্ট্রটেকেশ ।

—ঐটাই তো সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা । চোরে তো আর ভাঙাটিনের স্ট্রটেকেসে পরশপাথর খুঁজতে আসবে না ।

—না না । তাহলে রাতে আমার ঘুমই আসবে না ।

—আচ্ছা, তোমাকে যদি দিন-দুয়েকের ছুটি দিই ? তুমি ওটা তোমার দেশের বাড়িতে লুকিয়ে রেখে দিয়ে আসতে পার না ?

—আজ্ঞে না । দেশের বাড়িতে বাবা একা থাকে । সে বুড়ো মানুষ, চোখে ভাল দেখে না । পরশপাথর লুকিয়ে রাখা তার কন্মো নয় ।

—তাহলে ?

—এক কাজ করবেন ম্যাডাম ? এই যে পথে আমরা যাচ্ছি, সেখানেই একটা বাড়ি আছে মালিকের। বাগানবাড়ি। একজন মুসলমান দারোয়ান থাকে সেখানে। আর কেউ থাকে না। সেখানে লুকিয়ে রেখে যান না। দেখবেন বাড়িটা ?

—কতদূর ?

—আর মাইল দেড়েক।

—আচ্ছা চল, দেখেই আসা যাক।

বিশু দাসের উৎসাহে ভাঙা বাগানবাড়িটা দেখে এল স্জাতা। নদীর ধারে এমন একান্তে আগরওয়ালের যে একটা বাগানবাড়ি আছে সে খবর স্জাতা জানত না। বুড়ো মুসলমান দারোয়ান বিশুকে চিনত। ঘরদোর খুলে দিল সে। এক ঝাঁক চামচিকে না বাহুড় পাখা সাপটিয়ে উড়ে বেরিয়ে গেল আলোর থাকায়। স্জাতা চমকে যায়। ছোট্ট ডাক বাঙলো ধরনের রানিগঞ্জ টালির ছাউনি একটা। খান দুই শয়নকক্ষ, মাঝে একটা হল। সামনে টানা বারান্দা। ইলেকট্রিক নেই। জানালার পাশে দু-একটা খুলে গেছে। গরাদও নেই জানালায়। ঘরে আসবাব পত্র আছে কিন্তু। এমন কি বিছানা, বালিশ পর্যন্ত। একটু দূরে দারোয়ানের খাপরা-টালির ঘর, তার পাশে রান্নাঘর। ফুলের বাগান নেই ! ঐককালে বাগান ছিল, বেশ বোঝা যায়। করবী, শিউলি, কামিনী, ফুকস গাছ কিছু কিছু টিকে আছে, বাকি আগাছায় আকীর্ণ। দারোয়ান লোকটা বৃদ্ধ, কিন্তু তাকে দেখে স্জাতার কেমন যেন মনে হল লোকটা সুবিধার নয়। কোন কারণ নেই। তবু ওর বলিরেখাক্তিত ভাবলেশহীন মুখে কেমন যেন একটা অদ্ভুত কাঠিন্য, একটা কৰ্কশতা—মৃত্যুর মত নীতল ! এই বিজন বনে একা একা লোকটা থাকে কি করে ? আর এমন একটা জায়গায় এ বাগানবাড়ি রাখার মানেটাই বা কি ?

দারোয়ান ওকে আপ্যায়ন করে বসাতে চাইল, বললে সরঞ্জাম সব আছে, চা কফি সব থাওয়াতে পারে। কিন্তু স্জাতা রাজি হল না। তার কেমন যেন একটুও ভাল লাগছিল না। দম বন্ধ হয়ে আসছিল। অন্ধকারও ঘনিয়ে আসছে।

ফেরার পথে স্জাতা বলে, লোকটা ওখানে একেবারে একা থাকে কেমন করে ?

বিশু অমানবধনে বলল, ওর অভ্যাস হয়ে গেছে। একেবারে একা ঘরে ওর জীবনই কেটেছে যে ?

—কেন ? একেবারে একা একা জীবন কেটেছে কেন ?

—ও কিছু না, মানুষ খুন করে দীপান্তরে গিয়েছিল ।

স্বজাতার শিরদাড়া বেয়ে একটা হিমশীতল প্রবাহ নেমে যায় । মুসলমান লোকটার চেহারা মনে পড়ে যায় । এক মুখ দাড়ি, মাথায় একটা ছোট সাদা টুপি, চোখ দুটো কোটরাগত । একেবারে ভাবলেশহীন মুখ । লোকটা মানুষ খুন করেছিল ? কাকে ? কেন ?

অনেকক্ষণ পর স্বজাতা আবার বলে, এখানে যে একটা বাগানবাড়ি আছে তুমি তা কেনন করে জানলে ?

—নকুলবাবুকে নিয়ে একবার এসেছিলাম যে ।

—আচ্ছা এখানে এমন একটা বাড়ি রাখার মানে ?

—সে আপনি শুনতে চাইবেন না ম্যাডাম !

স্বজাতা গম্ভীর হয়ে যায় । আগরওয়াল যে ঋণশ্রদ্ধা মূনি নয়, তা সে জানত । কিন্তু—

বাঁধের রাস্তা ছেড়ে বড় রাস্তায় এসে পৌঁছালো যখন তখনও ছটা বাজেনি । স্বজাতা বলে, এবার সোজা মহাপাত্র সাহেবের বাড়ির দিকে চল—

—তার আগে পেট্রল নিতে হবে । পথেই পড়বে পাম্পিং স্টেশন ।

অল্প পরে পেট্রল স্টেশনে এসে দাঁড়ালো গাড়িখানা । বিশ হর্ণ বাজালো । লোকজনের সাড়া নেই । বিশ দরজা খুলে দেখতে গেল । এই অবকাশে স্বজাতা ড্রাইংবোর্ডের সামনে ছোট যে ডালাটা থাকে সেটা খুলে ফেলল । ভেবেছিল ওতেই আছে পেট্রলের রসিদ-বই । পেট্রল স্লিপে স্বজাতাই সই দিয়ে পেট্রল নেয়গাড়ীতে । যাসান্তে সেই রসিদ বইয়ের কাউন্টার-ফয়েল দেখে হিসাব করে বিল মেটার নকুল হই । ডালাটা খুলেই একটু অবাক হয়ে যায় স্বজাতা । জু-ড্রাইভার, রেঞ্জ, প্লাস, ময়লা শাকড়া, জুট ছাড়াও রয়েছে পেঞ্জইন গিয়ারের একখানা ইংরাজি পকেট বই । এ বই কার ? এল কোথা থেকে । কোতুহলী হয়ে বইটা খুলে দেখে সেখানা ডস্টরেভ'স্বির 'ক্রাইম এ্যাণ্ড পানিশমেন্ট ।' দুইদুই কোতুহলে প্রথম পাতাটা খুলে ফেলল স্বজাতা । বইয়ের মালিকের নামটা লেখা আছে প্রথম পাতায়—কৌশিক মিত্র ! একটা তারিখও আছে, বছর দুয়েক আগেকার ।

বেন চুরি করে কারও ডায়েরী পড়ছিল, কিপ্রহাতে স্বজাতা বইটা বখাছানে রেখে দিয়ে ডালাটা বন্ধ করে দেয় । ঠিক তখনই বিশ দান করে আসে পেট্রল-

পাম্পের সার্ভিসম্যানকে সঙ্গে নিয়ে। পেট্রলের ডালাটা খুলে দেয় চাবি দিয়ে
প্যাণ্টের হিপ পকেট থেকে টেনে বার করে আনে পেট্রলের রসিদ বইটা।
যেলে ধরে সূজাতার সামনে। ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে কলম বার করে সূজাতা
সই করে দেয়।

পেট্রল নিয়ে গাড়িটা এসে থামল জীমূতবাহনের বাড়ির গাড়ি বারান্দায়।
অরুণরতন বাগানেই বসেছিল তৈরি হয়ে। গাড়ি ঢুকলেই এগিয়ে আসে;
কিন্তু তার চেয়েও দ্রুততর গতিতে সূজাতা এগিয়ে যায় তার দিকে। একবার
পিছন ফিরে দেখে বিষ্ণু দাস কতদূরে আছে। তারপর অরুণ কোন সম্ভাবণ
করার আগেই বলে ওঠে, একটা কথা, সেদিন আপনার মনে হয়েছিল আমার
ড্রাইভার আপনার পরিচিত, নয়?

—হ্যাঁ, ভুল হয়েছিল নিশ্চয়। হঠাৎ সেদিন মনে হল—

—কি মনে হয়েছিল বলুন তো?

—ও কিছু নয়।

—বলুন না শুনি।

—আচ্ছা বেশ বলছি। আমি ক্রিকেট খেলি। বছর তিন চার আগে
ইন্টার কলেজ টুর্নামেন্টে আমি খেলতাম ল-কলেজের হয়ে। শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং
কলেজের একটি প্রেয়ারের সঙ্গে আপনার ড্রাইভারের অভূত সাদৃশ্য। কাকতালীয়
ঘটনা নিশ্চয়। মানে আমি ছিলাম আমাদের টিমের উইকেট কীপার। সে
ছেলেটি অনেকক্ষণ উইকেটে ছিল—তাকে অনেকক্ষণ খুব কাছ থেকে
দেখেছিলাম আমি

—তার নামটা আপনার মনে নেই?

—কি হবে তার নামে? সে তো এ নয়। এর মত দেখতে শুধু।

—কিন্তু সেদিন আপনি যেন বলেছিলেন কী ‘সাম’ মিত্র, তাই নয়?

—হ্যাঁ মিত্র। মিত্রই তার উপাধি। নামটা ঠিক মনে আসছে না—

—‘কৌশিক মিত্র’ কি?

—একশাক্তি! আপনি কেমন করে জানলেন?

উত্তেজনার সূজাতা খণ্ করে অরুণের হাতখানা চেপে ধরে, বলে—আপনি
সেদিন বলেছিলেন, প্রয়োজন হলে আমাকে সাহায্য করবেন, মনে আছে?

অরুণরতন বিস্ময় হয়ে প্রত্যুত্তর করে, মনে আছে। কেন বলুন তো?

—আপনার কাছে একটি ভিক্ষা আছে!

—অমন করে বলছেন কেন ? আদেশ করুন না ।

—একনি আপনার সঙ্গে আমার যে কথোপকথন হল সেটা আপনাকে ভুলে যেতে হবে—

—আপনি আমার হাতখানা ধরেছিলেন, সে কথাও ?

সুজাতা অরূপের হাতখানা ছেড়ে দেয় । বলে, বেশ, ভুলতে আপনাকে কিছুই হবে না ; কিন্তু কথা দিন একথা কখনও কাউকে বলবেন না ।

—কথা দিলাম । কিন্তু কেন বলুন তো ?

—সে কথাও জানতে চাইবেন না কোনদিন ।

—বেশ, চাইব না ।

—তবে চলুন !

॥ তেরো ॥

নিঃসন্দেহে এঞ্জিনিয়ার-কবি কৌশিক মিত্রের দৃষ্টিভঙ্গি তিল তিল করে বদলে যাচ্ছে । বাপের মনি-অর্ডার-নির্ভর কলেজের পড়ুয়া ছেলে সে নয় আর । দ্বারে দ্বারে মাথা খুঁড়ে মরা বেকার একজন এঞ্জিনিয়ার । দেহে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে কার্যিক পরিশ্রমে অরসংহান করতে পারে না, সামাজিক বাধায়, লোকলজ্জার প্রতিবন্ধকতায় । ভদ্রলোকের ছেলে বলে, শিক্ষিত বলে অস্তুত এক টাকার তফাত যে রাখতে চায় তার উপার্জনে, রাজমিস্ত্রির উপার্জনের তুলনায় । তাই তার কবিতার সুরও পালটাচ্ছে । চিনিকলের কুলি বস্তিতে যে কবি বলেছিল তবু দেখি বাঁচিবারে চায় ওরা, হাসে মিষ্ট অতি', সেই ক্ষমতা ইটের কারখানার গিয়ে শুনেছে থাক-দেওয়া ইটের বিজোহের বাণী । পথের সন্ধান তখনও সে পায়নি, তখনও সে ছিল দৈব নির্ভর । নিজেদের সংহতির মধ্যে, আভ্যন্তরীণ শক্তির মধ্যে সে তখনও মুক্তি যন্ত্রের সন্ধান করেনি,—তাকিয়ে ছিল বাইরের থেকে সাহায্য আসার অপেক্ষায় । সেই কবিকেই তারপর দেখলাম 'ফ্যাক্টারি ছন্দ' কবিতার সুর বদলাতে । এখানে সে যন্ত্রের মন্ত্রণা শুনেছে—যন্ত্রীদলকে ক্ষমতান্যূত করবার জন্য তারা গোপনে গোপনে ষড়যন্ত্র করছে ; কবির আশীর্বাদ আছে তাদের উপর ।

এবার পড়লাম আর একটি কবিতা । 'টানেল' । আর ছন্দোবদ্ধ কবিতা নয়, বহিঃ অস্তমিলকে তবুও সে ত্যাগ করতে পারেনি । না পারক, তবু এ কবিতার কবির বিবর্তন সম্পূর্ণ হয়েছে বলতে পারি ।

কিন্তু সরাসরি কবিতাটার উপনীত হতে চাই না। তার ভারেরী ধরেই
বরং অগ্রসর হওয়া যাক :

রবিবারের সকাল। আর পাঁচজনের আজ ছুটির দিন। তাই আমার আজ
বিশ্রাম কাজ। সপ্তাহের আর ছটা দিনের তুলনায় আজ মিটারে অনেক বেশী
উঠবে। পর পর পাঁচটা সপ্তাহের অভিজ্ঞতা থেকে সেটা বুঝতে পেরেছি
আমি। এ বেশ ভাল কাজ পেয়েছি। স্বাধীন ব্যবসা। গাড়িটা আমার নয়।
পেট্রোল যবিল খরচ আমার নয়, মায় ছোট খাট রিপেয়ারের খরচও আমাকে
দিতে হয় না। মিটারে যা ওঠে তার একটা শতকরা অংশ আমার প্রাপ্য।
গাড়ির মালিক অতিশয় সজ্জন ব্যক্তি। কিশোরদার আত্মীয়। আমার মত
শিক্ষিত ভদ্র ট্যাক্সি ড্রাইভার পেয়ে তিনি খুশীই হয়েছেন। মিটার ভাউন না
করে খেপ মারব না। টাকা ঘেরে দিবে পালাব না। এ কি কম নিশ্চিত
হওয়া? ভাবছি, চাকরি-বাকরির চেষ্টা আর করবই না। এই তো বেশ।
দুনিয়াকে বেশ চিনতে পারছি। ইচ্ছে আছে এই অভিজ্ঞতা নিয়ে একটা
উপগ্রাম লিখব। ট্যাক্সি ড্রাইভারের অভিজ্ঞতা। কতই তো দেখলাম।
দিনের কলকাতা, রাতের কলকাতা। প্রত্যাষের শহর, শুষ্ক মধ্যাহ্নের শহর,
সন্ধ্যার কলমুখরিত কলকাতা শহর। কত জাতের যাত্রী, কত উদ্দেশ্য তাদের,
কত বিচিত্র ব্যবহার। কেউ 'আপ' বলে, কেউ তুই-তোকারি করলেও গায়ে
মাখি না। ভাগ্যক্রমে চেনা লোক একজনও ওঠেনি গাড়িতে এই পাঁচ সপ্তাহে।
সে সৌভাগ্য হবে নিশ্চয় একদিন। প্রথম চেনা লোক কাকে পাব? কলেজের
অধ্যাপক? সহপাঠী? সহপাঠী সুরেনের বিয়েতে গিয়ে তার সেই যে শালীটির
সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, সেই মেয়েটি? কি নাম যেন তার? যাঃ নামটাই
ভুলে গেছি। যাই হোক, চেনা হলেও আমি চিনতে পারব না। আমার
কাছে সে হবে একজন যাত্রী। সে যদি চেনে তখন হেসে বলবে, হ্যাঁ কি করব
বলুন? ট্যাক্সিই চালাই আজকাল। হাজার হোক স্বাধীন ব্যবসা।

উনি হয় তো বলবেন : কিন্তু আপনি না পাশ-করা এঞ্জিনিয়ার?

বলব, তাতে কি? চাকরি করলে 'বস'কে খুশী রাখতে হবে, ঠিকাদারী
করলেও পাঁচজনকে তেল দিতে হবে। তার চেয়ে এই ভাল। তেল যদি
ঢালতেই হয় গাড়িতেই ঢালি। আপনারা পাঁচজনে মিটার দেখে আমার যজুরি
মিটিয়ে দেবেন। এ আর বেশি কথা কি?

সকাল বেলাতেই গাড়িটা ধোয়া, মোছা করছিলাম। একটা রিনায়ে

নিরেছি। তার মাইনে অবশ্য আমাকে দিতে হয় না। তবু রাতের কলকাতায় একজন সহকারী নিয়ে বের হতে হয়। না, গাড়ি আমার একেবারে নতুন। কোন ট্রাবল নেই; কিন্তু রাতের কলকাতায় মানুষকে বিশ্বাস করতে নেই। আজকাল আকছার ট্যাক্সি ড্রাইভার খুন হচ্ছে। পাশে আর একজন লোক থাকা ভাল।

গাড়িটা সাফা করছি, হঠাৎ কিশোরদা এসে হাজির।

—কৌশিক উঠে আর। আমার সঙ্গে যেতে হবে।

—কোথায়? আমি ট্যাক্সি নিয়ে বের হব এখন।

—ট্যাক্সি বেরবেনা আজ। তুই চলে আর। জরুরী কাজ আছে।

আমি কান দিই না। বলি, রাখ তোমার জরুরী কাজ! আজ রবিবার!

কিশোরদা এসে আমার কাঁধে হাত দেশ। বলে, পালোরান একটা কলেঙ্কারি করেছে। এখন যেতে হবে। শিগ্গির উঠে আর। শিবুর বাবা আমাকে ফোন করেছিলেন। আমি যাওয়ার পথে তোকে উঠিয়ে নিতে এসেছি—

অবাক হয়ে বলি, শিবু কি করেছে?

—হতভাগা আর্সেনিক খেয়েছে। উঠে আর, এক মিনিটও দেরী করতে পারব না।

—আর্সেনিক? কেন?

যেমন ছিলাম উঠে বসি ওর গাড়িতে।

কিশোরদাই গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে আসে। বালিগঞ্জের দিকে শিবুদের বাড়ি। আমি আগেও গিয়েছি। শিবুর বাবা নামকরা ডাক্তার। গিয়ার বদলাতে বদলাতে কিশোরদা বলে, শিবুটা একটা ক্যাডাভারাস।

—হঠাৎ আর্সেনিক খেল কেন?

—না হলে নাটক হবে কেমন করে? ড্রামাটিক একটা কিছু করতে হবে তো!

—আরে ব্যাপারটা কি হয়েছে আমাকে বলবে তো?

—আমার বাঁ পকেটে সিগারেট কেসটা আছে, বার কর।

কিশোরদার বাঁ পকেট থেকে সিগ্রেট-কেসটা বার করে তার মুখে একটা বসিয়ে দিই, নিজের একটা নিলাম। আগুন জ্বলে ধরাই, ওরটাও ধরিয়ে দিই। সমান বেগে গাড়ি চালাতে চালাতে কিশোরদা একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল।

বেতে বেতেই গল্পটা বলল :

শীলার বাবা শিবুকে পাত্তা দেন নি। শিবুর বাবা বড়লোক, শিবু লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়েছে ; কিন্তু তার চেয়ে মানসকে পাত্তা হিসাবে বেশী লোভনীয় মনে হয়েছিল তাঁর। ইতিমধ্যে মানস পাশ করে কোথায় যেন হাউস-মার্জেন হয়েছিল। সম্ভ্রতি বিলাতে না আমেরিকায় একটা কাজ যোগাড় করেছে। চাকরি করবে এবং পরীক্ষাও দেবে। মানসের বাবা ছেলেকে বিলেত পাঠাবার আগে তার বিয়ে দিতে চান। দুজনকেই বিলাত পাঠাবেন। শীলার বাবার কাছে তিনি শেষ কথা চাইলেন। শীলার বাবা মনস্থির করতে দেয়ী করেন না। শিবুকে বাতিজ করে মানসের সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে পাকা করে ফেললেন।

—শীলার মত ছিল ? প্রশ্ন করলাম আমি।

—না ! মেয়ের অমতেই অগ্রসর হচ্ছিলেন তাঁরা। হাটস্ অফ্ টু শীলা ! মেয়েটা বিলেত যেতে চাইল না। কম্পাউণ্ডারের বউ হতে চাইল। শীলার মা, দিদি শেষে বাবাও ওকে অনেক করে বোঝালেন, মেয়েটা কিছুতেই রাজি নয়। শেষে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধেই ওঁরা অগ্রসর হতে থাকেন। নিমন্ত্রণ পত্র ছাপানো হল, পাকা দেখার খাওয়া দাওয়া হল। ওঁরা আশা করেছিলেন, কোন রকমে একবার বিয়েটা মিটিয়ে বিলেত পাঠাতে পারলেই শীলার মন ঘুরে যাবে ! ওঁরা নিজের মেয়েকে চিনতেন না।

—তারপর ?

—তারপর একদিন পালোয়ান শীলাকে নিয়ে পালাবার চেষ্টা করল। হতভাগা যদি আমাকে একবারও জানাতো, দেখতাম কোন শালা ধরে ওদের !

—ধরা পড়ে গেল ?

—গেল ! শীলার বাপ খুব কড়া আদমি। মেয়েকে বাড়ি এনে বন্দী করলেন। শিবু পালোয়ানকে অপমানের চূড়ান্ত করে ছেড়ে দিলেন। সবাই ভেবেছিল, এত কাণ্ডের পর মানস অথবা তার বাবা বঁকে দাঁড়াবেন। কিন্তু তাঁরা তা দাঁড়ালেন না। ওঁরা বললেন, ও কিছু নয়, মানস বউ নিয়ে একবার বিলেতে পাড়ি দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। শিবু পালোয়ানকে তার বাড়ির সবাই এবং পাড়ার ছেলেরা বিদ্রূপের চূড়ান্ত করল। শীলা নাবালিকা নয়, সে ইচ্ছে করলে অস্বীকার করতে পারত। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে তার বিয়ে দিতে পারেন না ওঁরা ; কিন্তু ঐ পালাবার চেষ্টা করে ধরা পড়ে যাবার

পরই সে বেন কেমন নিখর হয়ে গেল। পালোয়ান তার সঙ্গে আর যোগাযোগ করতে পারেনি। আজ রবিবারে তার বিয়ে; আর পালোয়ান আজ সকালে আসেনিক খেয়ে বসে আছে।

শিবুদের বাড়ির সামনে বেশ একটা জটলা। চেনা মুখও দেখলাম কিছু। আমাদের বন্ধু বাজুব। সুরেন, রবি, সুবিনয়, জগা। সুরেন এগিয়ে এসে বললে,—বাঁচবে বলে মনে হয় না কিশোরদা।

—হাসপাতাল নেবে না?

—না। ওর বাবাই সব করছে। আরও দু'একজন ডাক্তার এসেছেন।

—কী কলেঙ্কারী বল দিকি?

নজরে পড়ল শিবুদের তিনখানা বাড়ির পরেই একটা বাড়িতে ম্যারাপ বাঁধা হয়েছে। রসুন-চৌকি বসেছে; কিন্তু সানাই বাজছে না। বেন মৃত্যুর নীরবতা নেমে এসেছে সে বাড়িতেও। কোন সাড়াশব্দ নেই সেখানে। একটু পরে বেরিয়ে এলেন ডাক্তার সমাদার। শিবুর বাবা। শ্রোত রাশভারি মোটা মানুষ। ভীড়ের মধ্যে কিশোরকে দেখতে পেয়ে বললেন, এই যে এসে পড়েছ তুমি!

কিশোর ভীড় ঠেলে এগিয়ে এসে বলে, কতক্ষণ খেয়েছে?

—ঘণ্টা তিন চার মনে হয়।

—এখন কেমন বুঝছেন?

শ্রোত মানুষটি কথা বললেন না। মাথাটা নাড়লেন শুধু। কে একজন বললেন, ঘরে গিয়ে কথাবার্তা বললে হত না ছোট কাকা?

ভদ্রলোক নীরবে ঢুকে গেলেন আবার। কিশোরদা আর আমিও গেলাম ভিতরে। ঘরে অতটা ভীড় নেই। বৃদ্ধ বসলেন একটা শোফায়। কিশোরদা তাঁর পাশে বসে প্রায় চুপি চুপি বললে—ওকে কোন নাসিং হোমে রিসুভ করলে ভাল হ'তনা?

ঘরের ভিতর থেকে একটা চাপা কারা ভেসে আসছে। না, মড়া কারা নয়। হৃদয় নিঃড়ানো আর্ত ক্রন্দন। গুমরে গুমরে কেউ বেন কাঁদছে। শিবুর মা অথবা বোনেরা কেউ হবে বোধহয়। বৃদ্ধ আবার মাথা নেড়ে বললেন, দরকার হবে না।

—হ্যাঁ, দরকার হয়তো হবে না। আপনার কাছে সবরকম ব্যবহারই আছে। আপনার কোন পেনে যে কোন ডাক্তার ছুটে আসবেন; কিন্তু—

তাকে খামিয়ে দিয়ে শিবুর বাবা ঘড়িটা দেখে বলেন, আর ঘণ্টাখানেক লাগবে বোধহয় ! এদের কান্নাকাটির পালা মিটতে আরও একঘণ্টা। ধর, বারোটা নাগাদ বেরিয়ে পড়তে পারবে তোমরা !

আমার পায়ের নিচে মাটিটা ছলে উঠল ! কী অদ্ভুত মানুষ এ ডাক্তার সমাদার ! তাঁর চব্বিশ বছরের জোয়ান ছেলেটা একঘণ্টার মধ্যে মারা যাবে, সে কথা কী অদ্ভুতভাবে ঘোষণা করলেন উনি !

আমাদের কারও মুখে কথা ফুটল না।

ডাক্তার সমাদার চোখ থেকে চশমাটা খুলে ফেলেন। বাঁ হাতে কিশোরদার হাতখানা টেনে নিয়ে তাতে একটু চাপ দিয়ে বলেন, আমার একটি 'অনুরোধ' আছে বাবা

—বলুন, কাকাবাবু—

—এ গলিটার মধ্যে তোমরা 'হরিবোল' দিও না ! পাশেই বিয়ে বাড়ি।

বলেই উঠে পড়েন ! দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা কামড়ে থপ্ থপ্ করতে করতে ভিতরে চলে যান !

আমরা কজন নিষ্পন্দ বসে থাকি !

একটা বড় গাড়ি এসে দাঁড়ালো। নিকট আত্মীয় স্বজন কেউ এলেন বোধহয়। একজন ভদ্রমহিলা কাদতে কাদতে গাড়ি থেকে নেমে বৈঠকখানা পর্যন্ত আসতেই ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন ডাক্তার সমাদার ! তাঁকে দেখে ভদ্রমহিলা আরও উচ্চগ্রামে কঁদে উঠবার উপক্রম করতেই একটা প্রচণ্ড ধমক দিলেন সমাদার : হুরো ! কাদতে ইচ্ছে থাকে বাড়ি গিয়ে কাঁদে যা ! এখানে ওসব চলবে না !

লক্ষ্য করে দেখি ভিতর বাড়ির কান্নারও কঠরোধ করে এসেছেন উনি। চাপা কান্নাটা আর শোনা যাচ্ছে না !

কিন্তু আমার যে তখন ডাক ছেড়ে কাদতে ইচ্ছে করছে !

হুরো নামে যাকে ডাকলেন সে ভদ্রমহিলা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ততক্ষণে ভিতরে চলে গেছেন।

যুদ্ধ তখন কিশোরের দিকে ফিরে বলেন, কী অবিবেচক বল ! আজ বিয়েটা মিটে গেলে, কাল তুই এ কাণ্ড করলেই পারতিস !

কী বলব ? আমরা স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকি। প্রহর গনি।

বিচক্ষণ চিকিৎসকের ভুল হয়নি! প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে রাশভারি
মাহুঘটির সমস্ত নির্দেশ অগ্রাহ্য করে প্রচণ্ড কান্নার ভেঙ্গে পড়ল বাড়িটা। কে
একজন ছুটে এসে বলল, আপনি একবার ভিতরে আসুন জেঠামশাই!
শিগ্গীয় আসুন!

বৃদ্ধ হাতটা নেড়ে শুধু জানালেন—না!

চশমাটা খুলে দু হাতে মুখ ঢেকে বসে থাকেন নিথর হয়ে।

খাটিয়া এল, ফুল এল। শিবু পালোয়ানকে ধরাধরি করে বার করে
আনলাম আমরা। আঁত ক্রন্দনের পিচ্ছিল সে পথ। আর কোন বাধা
দিয়েছেন না ডাক্তার সমাদার। ফটো তুলতে দিলেন না তিনি। বাহকের
অভাব ছিল না। যেন চোরাই মাল পাচার করছি। আমরা সবাই কাঁধে করে
তুলে নিলাম শিবুকে। তার পিঙ্গল চুলগুলো অবিন্যস্ত, তার নাল চোখ
জোড়া অর্ধমুদিত। শিবু ফাস্ট ক্লাস থার্ড হয়েছিল; থার্ড না সেকেন্ড?
হরিশ্বনি দেবার প্রথা আছে একটা। আমরা অশ্রুট উচ্চারণ করলাম—
বলহরি! হরীবোল!

গুলির মধ্যে আর আমরা হরিশ্বনি দেবনা!

বাহকের দল রওনা হয়ে যাবার পর ডাক্তার সমাদার বললেন, নহু তুই
একবার ভৌমিক মশায়ের বাড়ি যা, বলে আস এরা রওনা হয়ে গেছে।

নহু ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, বলে আমার কি আছে? ওঁরা কি এদিকে
নজর রাখেন নি ভাবছ? সবই দেখছেন ওঁরা।

বৃদ্ধ দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা কামড়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল
তাঁর। তারপর বলে ওঠেন, অনেক খরচ করে ভৌমিক মশাই রহুন চৌকি
বসিয়েছেন রে। বাজনদারেরা থেমে আছে। বলে আস, এবার বাজাতে
পারেন! আমরা কিছু মনে করব না!

পাথরে খোদাই কঠিন গালের উপর দিয়ে অশ্রুর দুটি ধারা নেমে এল তাঁর।

শ্মশান থেকে যখন ফিরে এলাম তখনও সন্ধ্যা হয়নি। সমস্ত দেহমন ভেঙে
পড়তে চাইছে; কিন্তু তখনও নিস্তার নেই। কিশোরদা বলে, একটা মুশকিল
হল রে কৌশিক! আজ আমার হাজারিবাগ যাওয়ার কথা ছিল।

—কাল যেও।

—কাল গেলে হবে না। আজ রাতেই রওনা হতে হবে। তুই বাবি
আমার সঙ্গে?

রেলওয়ের কি একটা বড় কাজ হচ্ছে ওদের। কাল সন্ধ্যার আগেই তাকে সেখানে পৌঁছাতে হবে। কিশোরদার সনির্বন্ধ অহুরোধ এড়ানো গেলনা। এতটা পথ ও বেচারি একা ড্রাইভ করে যাবেই বা কেমন করে। সঙ্গে টাকাও আছে ওর। পেয়েই করতে যাচ্ছে। অগত্যা রাজি হয়ে গেলাম। কিশোরদা বললে, চল কিছু খেয়ে নিই আগে।

—খাওয়ার ইচ্ছে নেই আমার।

—ইচ্ছে না থাকলেও খেতে হবে। শুধু খাওয়া নয় পানীয়। দু এক পেগ পেটে না পড়লে এই ওভার ট্রেন সহ্য হবেনা!

সেই রাতেই আসানসোল পর্যন্ত চলে গেলাম আমরা। পরদিন ভোরে রওনা হয়ে বিকাল নাগাদ পৌঁছলাম ওদের সাইটে। রেল লাইনের একপাশে আসানসোল হচ্ছে। একটা নতুন টানেল কাটছে ওর কুলিরা। অনেক টাকার টেঙার। কিশোরদা কাজটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালো। রেল লাইন দু প্রান্ত থেকে এগিয়ে এসে থেমেছে একটা প্রকাণ্ড পাহাড়ের সামনে। ওরা নিরলস পরিশ্রমে পাথর কেটে চলেছে। বাধা যতই হক ওদের গাঁইতার সামনে শেষ পর্যন্ত তা চূর্ণ হবেই। গুম্ গুম্ করে মাঝে মাঝে ডিনামাইট ফাটছে। সাইটে খানকর তাঁবু খাটানো। তাতেই রাত্রিবাস করতে হবে। কিশোরদা ওখানকার ভারপ্রাপ্ত এঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল। ওরা হিসাব নিয়ে বসল। আমিও বসলাম ডায়েরি লিখতে। আজ একটা কবিতা লিখব। কিন্তু শিবু পালোয়ানের এপিটাক নয়, আমি শিবুর বাবার ওপর কবিতা লিখব। শিবুর বাবার প্রতীক যেন এই দুর্মদ শিলাসূপ। এতটুকু বেলা থেকে শিবুকে উনি মানুষ করেছেন। স্বলারশীপ পাওয়া মেধাবী ছাত্র ওর সম্ভান। অনেক স্বপ্ন দেখতেন তিনি। চেয়েছিলেন, ছেলে বাপের লাইনেই আসুক। ডাক্তার হ'ক। নিজের প্রকাণ্ড প্র্যাকটিশটা ছেলেকে দিয়ে যেতে চাইলেন; কিন্তু শিবুর বরাবর কোঁক কল-কারখানার ওপর। সে এঞ্জিনিয়ার হতে চাইল। রোজ কাগজে পড়েন, রেডিওতে শোনেন দেশের প্রয়োজন এখন শুধু এঞ্জিনিয়ারের। ছেলের বাসনায় তিনি বাধা দেন নি। শিবুও তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিল। ফার্স্ট ক্লাস ডিগ্রি নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল কলেজ থেকে। তারপর শুনলেন, পরিকল্পনাকারীদের কোথায় বুঝি কি ভুল হয়েছে। দেশে এখন এঞ্জিনিয়ারের অভাব নেই তারা এখন সারগ্রাম। ধারে ধারে বুথাই ঘুরে মরেছে তাঁর ছেলে। কোথাও

মাথা গোঁজার আশ্রয় পায়নি। না পার, নাই পেয়েছে। ডাক্তার সনাদার বললেন, তুমি আমার ডিস্পেন্সারিটা দেখে আপাতত, তারপর আমি তোমাকে ছোট খোট একটা কারখানা বানিয়ে দেব।

শিবু বলেছিল, কারখানা বানিয়ে কি হবে? দেশে যেখানে যত ছোট কারখানা ছিল এখন একে একে তা লালবাতি জ্বালছে।

—তবে ব্যবসাই কর। ঔষুধের ব্যবসা।

তাই করতে চেয়েছিল শিবু পালোয়ান; কিন্তু কোথায় কি যেন ভুল হয়ে গেল। শিবু পালোয়ান হঠাৎ হার স্বীকার করে বসল! হয়তো পাশের বাড়ির রসুন চোকিতে ভৈরবীর প্রথম মূর্ছনায় কী একটা ধাক্কা লাগল ওর মনে। ভৈরবীর স্মরে ও শুনতে পেল পুরবীর তান। বাড়ির লোকজন তখনও ওঠেনি। শিবু পালোয়ানের কাছে বাবার ঔষুধের আলিমারির চাবি ছিল। নিঃশব্দ পায়ে সে নেমে গিয়েছিল এক তলায়। ভোরের প্রথম আলো লাগা পাশের বাড়ির মঙ্গলঘটটা কি সে দেখতে পেয়েছিল জানালা দিয়ে? কী জানি, সে কথা সে বলে যায়নি। ঔষুধের আলিমারিটা খুলতে ওর কি হাত কেঁপেছিল? জানিনা, শুধু যে চিঠিখানা সে লিখে রেখে গেছে তার অক্ষরগুলো প্রমাণ দেয়, না তার হাতও কাঁপেনি, হৃদয়ও নয়। সে শীলার নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেনি তার চিঠিতে। সে শুধু লিখে গিয়েছিল,— কি জানি। তাও আমি জানিনা। শিবুর বাবা চিঠিখানা দেখতে দেননি আমাদের। কিন্তু না, আজ শিবু বা তার বাবা নয়, আজ আমার কবিতার বিষয়বস্তু ঐ নিঃস্ব কুলিদলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। অতবড় পাহাড়টাকে অস্বীকার করে যারা দুপাশ থেকে আক্রমণ করেছে ঐ অচলারতনকে! টানেল খুঁড়ছে ওরা! পাহাড়ের বাধা ওরা মানবেনা:

অগ্রগতি হঠাৎ রোধ করে দাঁড়াল অচলারতন বিরাট পর্বত!

ভিল ভিল করে এগিয়েছি আমরা। আমাদের পথ

প্রতি পদক্ষেপে পেয়েছে বাধা; কখনও খাড়া চড়াই

কাটতে হয়েছে, কখনও ভরাট করেছি খাড়া উৎরাই।

মাকে মাকে পথ আগলেছে ক্ষীতোদর নদী

অতিক্রম করেছি তাও; মেনেছি অসীম কতি।

শহীদেব মৃতদেহ পুঁতে সে নদীর মাঝখানে তুলেছি পাথর
 ক্রান্তি পাইলের চেয়েও দৃঢ়তর ভিত্তি । আর
 তার উপর পেতেছি আমার লৌহ কঠিন রেলপথ !
 আজ আবার পথরোধ করেছে এই দুর্বীর পর্বত !
 আমাদের অগ্রগতি কখনে কে ?
 ওরে নিঃশ্ব কুলির দল ! বলিষ্ঠ হাতে তুলে নে
 তোদের গাঁইতা আর খাঁচি ; তোদের হাতিয়ার ।
 পথ করে নে এগিয়ে চলার
 উড়িয়ে দে ঐ অচল পাহাড় ॥

যুগ যুগ মানুষের শ্বেদ ও শোণিতের ঐ ঘনীভূতরূপ
 পুঞ্জবানীর স্বার্থকঠিন ঐ দুর্মদ শিলাস্তূপ
 বিনাবাধায় ছেড়ে দেবেনা আমাদের একতিল পথ,
 রাষ্ট্রলালত মিলওয়ার আর মিলিওনেয়ারের অচল পর্বত ॥

হা-হা করে হেসে ওঠে নিঃশ্ব কুলির দল,
 গাঁইতা ওঠে আর পড়ে ! সৈনিকের সবল
 বাহুর মাংসপেশী চিক্ চিক্ করে সূর্যের আলোয়,
 বুক চিরে ছুটব আমরা পথ না দিলে ভালয় ভালয় ॥

টানেন খুঁড়ছি আমরা ! ছিন্নপথে ডিনামাইট ফাটে
 থর থর করে কাঁপে পাহাড় । ওরা পরামর্শ আঁটে
 কী করে সশস্ত্রে ভেঙে পড়ে দেবে আমাদের জীবন্তে গোর ।
 আমি বাস্তবকার ! ক্যাম্পে বসে অন্ধ করি রাত্রি ভোর !
 সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে জেগে ওঠে আমার সর্বহারা কুলিদল,
 গাঁইতা ওঠে, গাঁইতা নামে—ভাঙ্গে আগল ।
 ওরা নির্বোধ ! জানে না লাইনে স্লিপার পাতা
 একচুল বিচ্যুতি নেই কোথাও ! প্রতি পদক্ষেপে গাঁথা
 আমাদের একতার মহামন্ত্র !

পাহাড়ের বুক বসিয়েছি আমার থিরোডোলাইট বস—
 তারই নির্দেশে গাঁইতা ওঠে, গাঁইতা নামে,
 স্থির সম্মুখে চলেছি আমরা চাইনা ডাইনে বামে ॥

আর ভয় নেই ! পাহাড়ের বুক ভেদ করে এসেছে আওয়াজ
 ওপারেও কারা যেন গাঁইতা চালাচ্ছে আজ !
 দুর্ভেদ্য পাহাড়ের ওপারেও আছে নিঃশব্দ কুলির বসতি
 ছায়াও চার হাত মেলাতে, চাইছে অগ্রগতি ।
 আমার অজ্জের সেনার কানে বাজছে শহীদের শেষ আহ্বান,
 ব্রীজের ভিত্তিমূলে যারা গেয়ে গেল মহাজীবনের গান ।
 যারা মাথায় করে তুলেছে এই লোহাবাঁধা পথ
 আমরা ভুলিনি সেই মৃত্যুপথ যাত্রীদের শেষের শপথ !
 নির্বোধ জড় শিলাস্তূপ ! দিন শেষ হয়েছে তোমার !
 দুপারের কুলি গ্যাঙ হাত মেলাবে এইবার !
 আর হৃদিনেই, এই চাষী আর ঐ মিল কুলি
 পাহাড়ের বুক চিরে গিয়ে করবে কোলাকুলি ।
 আর দুটি দিন ! তোমার হৃদপিণ্ড নিষ্পেষিত করে ছোটাব বাষ্পরথ !
 টানেলের ক্ষতচিহ্ন বুক দাঁড়িয়ে থাকবে পুঞ্জিবাদী পরাস্ত পর্বত ॥

॥ চৌদ্দ ॥

ডি. এম.-এর বাড়িতে এতগুলি গণ্যমান্ত লোক যে তার জন্ত এ ভাবে
 প্রতীক্ষা করছিলেন, স্বজাতা তা স্বপ্নেও ভাবেনি । ঘরে ঢুকে তার এই প্রথম
 মনে হল এ সভার উপযুক্ত বেশবাস সে করে আসেনি । প্রকাণ্ড বড় হল-
 কামরাটাতে জনা বারো পুরুষ এবং জনা আষ্টেক মহিলা আগেই এসে উপস্থিত
 হয়েছেন । প্রত্যেকেই সাজ-পোষাকে একেবারে টিপটাপ । পুরুষরা স্যুটেড-
 বুটেড, একমাত্র ব্যতিক্রম নাট্যকার অরূপরতন স্বয়ং । সে ধূতি-পাঞ্জাবি পরে
 এসেছিল । মহিলাদের পরিধানে জর্জেট, বান্ধালোর সিক, মুশিদাবাদী তো
 বটেই, একজন বেনারসী পর্বত পরে এসেছেন । স্বজাতার লালপাড়
 ধনেখালি শাড়িটা যেন এ সভার বেমানান । কজ পাউডার-লিপস্টিকে সূক্ষ্মভিত্ত

মহিলাবৃন্দের যাবধানে সে রীতিমত একঘরে। তা হ'ক, সপ্রতিভতা হারান না স্বজাতা।

অরূপ প্রথমত তার পরিচয় করিয়ে দিল, এ'র কথাই বলছিলাম আপনাদের। স্বজাতা চট্টোপাধ্যায়।

তারপর স্বজাতার দিকে ফিরে বলে, আর এ'দের পরিচয় একে একে দিই। ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেবকে তো নিশ্চয়ই চেনেন। মনিবৌদি, মানে মিসেস ঘোষ। ডক্টর সান্তাল। ইনি রমেন গুহ, আমাদের সদর থানার ও. সি. এবং আমাদের নাটকের পরিচালক—নাট্যামোদী ব্যক্তি। মিস্টার সূত্র তার-চৌধুরী ডিষ্ট্রিক্ট এজিনিয়ার, মিসেস রায় চৌধুরী। আমাদের মুন্সেফবাবু। ইনি এস. ডি. ও-নর্থ মিঃ রুদ্র। অধ্যাপক সূধীর নিয়োগী। ডিয়ার মি, আপনার নামটা—।

ভদ্রমহিলা হাত দুটি জোড় করে বলেন, রানী সেন, আমি এখানকার—

—ই্যা জানি, এখানকার কলেজের অধ্যাপিকা। ফিলসফি পড়ান।

স্বজাতা কিছু প্রতিধ্বনন কর, যে এক নিঃশ্বাসে সবাইকে চিনে ফেলবে। সবার নামধাম পরিচয় মুগ্ধ করে ফেলবে। এ'দের একজনকেও সে চেনেনা। ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেবকেও সে ইতিপূর্বে দেখেনি, চিনত না। তবে নামটা জানত, বিপুলানন্দ ঘোষ। আর চেনা লোকের মধ্যে পিছনের সারিতে বসে আছেন একজন—যার পরিচয় অরূপ দেয়নি। তার দুটো কারণ চতে পারে। অরূপের ভাষায়, প্রথমতঃ এক নিঃশ্বাসে যেসব নাম বলে গেছে তাঁদের সঙ্গে ওর নাম বলা যায় না; কিন্তু একটি মাত্র লোকের পরিচয় না দিয়ে এভাবে শেষ করাতেও কোন অসৌজন্য প্রকাশ পায়নি। কারণ, দ্বিতীয়তঃ ধরে নেওয়া যায়, স্বজাতা তাকে চেনে। তা চেনে; ম্যানেজার নকুল হুইকে যে এ পরিবেশে দেখবে স্বপ্নেও ভাবেনি। হংস মধ্যে, না বক নয়, হাড়গিলের মত এক কোনার বসে আছে সে, তার গলাবন্ধ কোট গায়ে। বিচিত্র মাফলার গলার।

অরূপ তার পরিচয় পর্ব শেষ করার পর সর্বপ্রথম যিনি কথা বললেন, তাঁকে এতকণ লক্ষ্য হয়নি স্বজাতার। অরূপও তাকে দেখেনি। তিনি বস্তুত কক্ষমধ্যে ছিলেন না। ভিতরের দরজায় নীরবে এসে দাঁড়িয়েছেন এইমাত্র। সেখান থেকেই বলে ওঠেন, আর নাট্যকার যার পরিচয় দিতে ভুলেছে সে হতভাগ্য বৃদ্ধটির নাম প্রসন্ন কুমার বাহু।

অরূপ আসন্ন গ্রহণ করেছিল। আবার উঠে দাঁড়ায়। বলে, আরে

আপনি কখন এসে চূপ্‌টি করে ওখানে দাঁড়িয়েছেন? স্বজাতা দেবী, উনিই বিখ্যাত ব্যারিস্টার পি. কে. বাসু। যদিচ উনি একা আমাদের মনি-বৌদির দাছ কিন্তু সেই স্ববাদে আমরা সবাই ঠেকে সার্বজনীন দাছত্বে বরণ করেছি।

বাসুসাহেব রাণী সেনের পাশে বসতে বসতে বলেন, তা করেছ। এমন কি ছোট খুকি পর্বত আজকাল আমাকে দাছ বলে ডাকছে। স্বজাতার দিকে ফিরে বলেন, ছোট খুকিকে চিনলে তো? ঐ যে তোমাদের স্বজাতার পাঁট করেছে, মিস্ প্রগতি ঘোষ, মনির মেয়ে,—কই তাকে যে দেখি না বড়?

মিসেস্ ঘোষ, অর্থাৎ মনিবৌদি বলেন, ছোটখুকি এখনও আসেনি, ওর আজ প্র্যাকটিকাল ক্লাস ছিল। বাথরুমে আছে এখনই আসবে।

স্বজাতা অবাক হয়ে দেখছিল ভদ্রলোককে। কত বয়স হবে? সস্তর পঁচাত্তর, না আশির কাছাকাছি? চুলগুলো ধবধবে সাদা, পিছনে ফিরানো। টাক পড়েনি কিন্তু। চোখে এক জোড়া রিমলেস পুরু লেন্সের চশমা। গৌফ দাড়ি কামানো। কাল্‌চে নশ্টিরঙের একটা শ্যুট পরেছেন; তিন পীস্ শ্বর্টে। আজকাল যা নাকি বড় একটা কেউ পরেনা। টাই নয়, একটা বোঁ বেঁধেছেন গলায়। কিন্তু সাজ পোষাক নয়, দর্শনীয় যা আছে তাঁর চেহারায়, সেটা ব্যক্তিত্ব। টুকটুকে পাকা বাদশাখান্ আম ঘেন একটি। এতলোকের মধ্যেও তিনি জনতার একাংশ নন, তিনি বিশেষ একজন।

ডি. এম. ঘোষ সাহেব বলেন, আপনার কথা মিস্টার মহাপাত্র অনেক আগেই বলেছিলেন, ঠিকমত যোগাযোগ হয়ে উঠছিল না। বস্তুত স্বজাতা-চরিত্র করবার উপযুক্ত অভিনেত্রীর সন্ধান আমরা এতদিন কিছুতেই করতে পারিনি। কেউ কেউ কলকাতা থেকে প্রফেশনাল আর্টিস্ট আনাবার প্রস্তাবও করেছেন, কিন্তু আমার ঠিক তা পছন্দ হয়নি। আমাদের মধ্যে প্রফেশনাল আর্টিস্ট, মানে...যাকপথেই থেমে যান উনি।

স্বযোগ পেয়ে স্বজাতা বলতে যার, আমি কিন্তু মানে, এতবড় ইম্পর্টেন্ট পাঁট—

আবার নূতন উদ্ভবে শুরু করেন ঘোষ সাহেব, বিলম্বণ। আপনার সঙ্কোচ করার কিছু নেই! আপনি অনেক অভিনয় করেছেন, অনেক হাততালি কুড়িয়েছেন—সবই বলেছেন মিঃ মহাপাত্র।

স্বজাতা অবাক হয়ে অরূপরতনের দিকে তাকায়।

অরূপ হেসে হেসে বলে, ‘মাটির ঘরে’ তজ্জা তো আমি নিজে চোখেই
দেখেছি, ‘দস্তায়’ বিজয়ার পাট অবশ্য আমি নিজে দেখিনি, শুনেছি অনবদ্য
অভিনয় হয়েছিল। কী? অমনভাবে চোখ পাকাচ্ছেন কেন?’ আপনার
সামনে তো আর আপনার প্রশংসা করিনি।

এমন জলজ্যাস্ত মিথ্যার সামনে দাঁড়িয়ে কি বলবে ভেবে পায়না সূজাতা।

পরিচালক রমেন গুহ বলেন, নাটকটা আপনার পড়া আছে তো?

অরূপ বলে, না, শুধু গল্পটা মোটামুটি ঠুকে বলেছি।

—বাইহোক আমরা বরং শুরু করি এবার।

নির্জীবের মত বসে থাকে সূজাতা! রাগে তার কপালের শিরাতটো
দপ্‌দপ্‌ করতে থাকে। অরূপরতন এ কী বিপদে ফেলল তাকে!

রিহার্সাল শুরু হয়ে যায়। প্রথম দৃশ্যে সূজাতার প্রবেশ একেবারে
শেষদিকে। মহড়া শুরু হতেই সবার দৃষ্টি সেদিকে চলে যায়, কলগুঞ্জন
শব্দটা কমে আসে। তুম্মা আঁটা ধরাচূড়া পরা কয়েকজন চা-বিস্কুট-কফি-
শ্রানডুইচ পরিবেশন করতে থাকে। কে জানে এ বন্যাত্রাণের ধরচে, না
নাট্যামোদী ঘোষনাসাহেবের আতিথেয়তা। সূজাতা আচ্ছন্নের মত বসেই থাকে।
হঠাৎ কানে যায় চাপা কণ্ঠস্বর, আপনি আমাকে একটু দেখিয়ে টেকিয়ে দেবেন
ভাই, আমি কিন্তু এর আগে কখনও অভিনয় করিনি।

সূজাতা লক্ষ্য করে দেখে তার পাশের চেয়ারে রাণীদি এসে বসেছেন।
সূজাতা প্রশ্ন করে, আপনি কি পাট করছেন?

—আপনার সতীন, অপর্ণা।

—সতীন? আমি তো শুনেছি আমাকে অবিবাহিতা অবস্থাতেই মরতে
হবে আত্মহত্যা করে?

মুখে ক্রমাল চাপা দিয়ে হেসে ওঠেন রাণীদি। বলেন, অপর্ণা হচ্ছে বসন্তের
স্ত্রী। বসন্তকে চেনেন তো? যার সঙ্গে আপনার ‘ইয়ে’ হয়েছিল।

সূজাতাও চাপা কণ্ঠে বলে, বসন্ত চরিত্রটিকে চিনি; কিন্তু কে সেই পাটটা
করছেন? মানে, কার সঙ্গে আমাকে ইয়ে করতে হবে?

রাণীদির হাসি আর ক্রমালে চাপা থাকেনা। আঁচলটাকে টেনে নিতে
হয় ভদ্রমহিলাকে।

পরিচালক রমেনবাবু সূজাতাকে ডাকেন, এবার আপনার প্রবেশ। ওপাশে
গিরে দাঁড়ান। ওইটে ভিতর দিক। আপনি ভিতর থেকে আসছেন এখন।

নির্দেশমত স্ফাতা ওপাণে গিঁথে দাঁড়ায়। দেখে নকুল হুই দাঁড়িয়ে আছে এক পাশে। পাণ্ডুলিপি হাতে। স্ফাতাকে দেখে এক গাল হাসে। এ নাটোত্তমে নকুল হুইয়ের কঠিন দায়িত্ব। সে এ অভিনয়ের স্মারক। সে নাকি নামকরা প্রম্পটার।

নিজের উপর স্ফাতার প্রগাঢ় বিশ্বাস। মন করলে অসম্ভবকে সে সম্ভব করতে পারে। অরূপরতন তাকে যে বিপদের ভিতর ঠেলে দিয়েছে সেগান থেকে উদ্ধার পাওয়ার দুটি রাস্তা। হয় তাকে প্রথমেই অকুণ্ঠস্বরে স্বীকার করতে হয়, অভিনয় সে কখনও করেনি, অরূপ মিছে কথা বলেছে এবং অভিনয় সে করবে না। অথবা অরূপের মিথ্যার পশরা মাথায় তুলে নিয়ে তাকে দেখিয়ে দিতে হয় সে অসম্ভবকে সম্ভব করার ক্ষমতা রাখে। মুহূর্তমধ্যে মনস্থির করে ফেলে স্ফাতা। সে দ্বিতীয় পন্থাই অবলম্বন করবে।

মহড়ার মাঝখানে একসময় এসে উপস্থিত হল প্রগতি, মনিবোদ্রিয় মেয়ে। বছর আঠারো বয়স। স্ফাতার সঙ্গে এসে আলাপ করে গেল। যেহেতু স্ফাতার পার্ট জানা নেই, তার পরিচালক তার অংশটা মূলতঃ বাদ দিয়েই মহড়া দিলেন। ছুটারবার শুধু ঠেকা দেবার ক্ষুদ্র স্ফাতার ডাক পড়ল। যেখানে বসন্তের সঙ্গে অভিনয় সেখানে তার একটু আড়ম্বর্তা এল বেন। নাট্যকার স্বয়ং যে বসন্তের চরিত্র করছে এটা জানা ছিল না তার।

মহড়া শেষে রমেনবাবু বলেন, নাটকের দ্বিতীয় কপি কতদূর হয়েছে?

রাণীদি একটু সঙ্কোচের সঙ্গে বলেন, প্রথম অঙ্কটা শেষ হয়েছে। আমার আবার পরীক্ষার খাতা এসে গেছে কিনা, তাই বেনী এগোয়নি।

ঘোষসাহেব বলেন, আপনার লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। এদেরই ভুল হয়েছিল আপনাকে গছানো। ওটা আমাকে দিন, কোন কেরানিকে দিয়ে রাতারাতি কপি করিয়ে দেব।

এস. ডি. ও রুদ্রের দিকে ফিরে বলেন, তোমার অফিসে বাঙলা হাতের লেখা ভাল কার?

রুদ্র তৎক্ষণাৎ বলে, আপনি কিছু ভাববেন না স্যার। আমি কপি করিয়ে দেব। একেবারে কার্বন ফেলে একসঙ্গে তিন কপি। হাত বাড়িয়ে নকুল হুইয়ের কাছ থেকে পাণ্ডুলিপিটা গ্রহণ করেন তিনি।

রমেনবাবু বলেন, কিছু স্যার, আজতো ওটা দিতে পারব না। আজ নাটকটা স্ফাতা দেবী নিয়ে যাবেন। সবার আগে তাঁর পড়া দরকার।

সুজাতা হাত বাড়িয়ে নাটকটা নিয়ে বলে, পড়ে নিতে আমার বস্টা ছুরেক লাগবে। ঠিক তাহে আমিই না হয় এক কপি করে দেব। আমি তো বেকার মানুষ। সারাদিনই আমার সময় আছে।

বাহুসাহেব বলেন, এই জন্মেই বলে নারী হচ্ছে শক্তি-স্বরূপা!

ঘোষসাহেব তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করেন, এটা কেমন কথা হল দাছ? আমরা এতগুলি প্রাণী যে প্রাণপাত করে—

বাধা দিয়ে বাস্তব বলেন, কী আশ্চর্য! সেই কথাই তো বলছি আমি! তোমরা পুরুষ মানুষের দল বড় জোর প্রাণ পাত করতে পার, প্রাণ দান করতে পারনা! তোমরা এতগুলি পুরুষ দ্বিতীয় কপিটা করতে কেউই সাহস পেল না। সেটা করলেন অর্ধেক রাণীদেবী অর্ধেক সুজাতা। তোমাকে নাম ধরে ডাকছি বলে কিছু মনে করছ না তো?

সুজাতা জবাব দেবার আগেই রাণীদি বলে ওঠেন, উনি কিছু মনে করছেন না, কিন্তু আমি করছি দাছ। আপনি আমাকেও নাম ধরে ডাকছেন না বলে।

—বেশ বেশ, এবার থেকে তাই ডাকব।

ঘোষসাহেব বলেন, আমি কিন্তু আপনার মূল বক্তব্যটা মেনে নিতে পারিনি, দাছ। রাণীদেবী এবং সুজাতা দেবী অল্পলিপিই করছেন, কিন্তু নাটকটা যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি মহিলা নন, পুরুষ—

—তাতে কিছুই প্রমাণ হয় না। নাট্যকারকে জিজ্ঞাসা করে দেখ। তিনি নিশ্চয় ঐ নাটক লেখার প্রেরণা পেয়েছিলেন কোন একটি মহিলার কাছ থেকেই। নাটকের নায়িকা সুজাতাকে তিনি বাস্তব জীবনে দেখেছেন নিশ্চয়, অন্য কোনও নামে, অথবা অন্য কোন পরিবেশে। নাটকসৃষ্টির মূল প্রেরণা তো জুগিয়েছেন সেই মহিমময়ী নারীই। নাট্যকার তো উপলক্ষ্য মাত্র।

সকলের দৃষ্টি পড়ে নাট্যকারের দিকে। অরূপদত্তন লজ্জা পায়, কারণ পূর্ব মুহূর্তেই সে অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে ছিল সুজাতার দিকে। সুজাতাও তাকিয়ে ছিল নাট্যকারের দিকে।

আগামীকাল ঠিক ছয়টার সময় পুনরায় সমবেত হবার নির্দেশ সমেত সভা ভঙ্গ করা হল। ফেরার পথে অরূপ বলে, আপনার কাছে অপরাধী হয়ে আছি। কি ভাবে কমা চাইব বুঝে উঠতে পারছি না।

সুজাতার রাগ পড়ে গিয়েছিল, কিন্তু সে ভাব গোপন করে বলে, আপনি আমার গলায় ফাঁস পরিয়ে দেবার জন্য রীতিমত ‘আনফেয়ার মীনস’ নিয়েছেন।

অরুণ আর সুজাতা বসে ছিল পিছনের সীটে। গাড়ি চালাচ্ছে বিত্ত। অরুণ যথেষ্ট ব্যবধান রেখে বসেছে। সেখান থেকেই একটু খুঁকে পড়ে বলে, আমি ক্রিমিনাল ম-ইয়ার, কিন্তু ডিকেন্সেই আমি সাধারণতঃ কাজ করি। ফলে কারও গলায় ফাঁস পরিয়ে দেওয়া আমার ধর্ম নয়। দ্বিতীয়তঃ, ফাঁস অনেক জাতের হয়, ফুলের মালাও একজাতের ফাঁস। তৃতীয়তঃ জীবনের দুটি ক্ষেত্রে ‘আনফেয়ার’ বলে কোন কিছু নেই।

সুজাতা চোখ পাকিয়ে বলে, জানি। ঐ ইংরাজী প্রবাদ বাক্যটির শেষ কথা হচ্ছে ‘ওয়ার’, যুদ্ধ! সুতরাং আপনি আমার শত্রুপক্ষ। এ ক্ষেত্রে আপনার তরফে কমা চাইবার তো অবকাশ নেই। আমিও তাকে তাকে থাকব, সুযোগ পেলেই এক লেংগীতে আপনাকে ধরাশায়ী করব!

দুজনেই হো-হো করে হেসে ওঠে।

অরুণই হঠাৎ হাসি থামিয়ে বলে, কিন্তু শুরুতেই প্রবাদ বাক্যটির একেবারে শেষ কথা বলেছি, তাই বা ধরে নিচ্ছেন কেন? আপনি এটা ‘ওয়ার’ বলে ধরে নিয়েছেন এবং তাই ‘রাগ’ করছেন; কিন্তু ‘ওয়ারের’ পূর্বে তো আরও কিছু থাকতে পারে, সেক্ষেত্রে ‘রাগের’ আগেও ‘পূর্ব’ যুক্ত হওয়া উচিত। তখন এটাকে আমার তরফে ক্রাইম বলে মনে হবে না নিশ্চয়ই, ফলে পানিশ্‌মেন্টটাও অন্য ধরনের হবে!

হঠাৎ চমকে ওঠে সুজাতা।

ক্রাইম এ্যাণ্ড পানিশ্‌মেন্ট!

দৃষ্টি চলে যায় সামনের সীটে, স্টিয়ারিং‌তে বসে থাকা নির্বাক বোকা সোকা মানুষটার দিকে। লোকটা কে? আজ আর একমুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি নেই—দ্বিবি মোলারেম করে কামানো। গায়ে পাটভাঙ্গা নতুন সার্ট। আজ ওকে দেখে মনে হচ্ছে না যে ও একেবারে নিঃশব্দ প্রমজাবী। লোকটা কে? বংশবধ ড্রাইভার বিত্ত দাস, না ছদ্মবেশী এজিনিয়ার কোণিক বিজ্ঞ? লোকটার সামনেই এতক্ষণ অরুণের সঙ্গে চাপা রসিকতা করে চলেছিল অমকোচে, কারণ ধরে নিয়েছিল—ও হচ্ছে বিত্ত দাস। হঠাৎ ঐ ‘ক্রাইম এ্যাণ্ড পানিশ্‌মেন্ট’ কথাগুলোর মনে হল লোকটা কি এতক্ষণ ওদের

কথোপকথনের অন্তর্গত ইঙ্গিত সমস্তই অনুধাবন করছিল, আর মনে মনে হাসছিল।

—কই আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন না?

—আপনার বাড়ি এসে গেছে।

পরদিন সকালে ম্যানেজার নকুল হইকে সূজাতা ডেকে পাঠালো। বেঁটে খাটো মানুষটি তার উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া গলাবন্ধ কোট ও মাকড়ার এবং অকৃত সম্পত্তি কোলা গোকজোড়া নিয়ে এসে হাজির হল হাসি হাসি মুখে। সূজাতা বিনা ভূমিকার সরাসরি বলে, বিত্ত দাস লোকটাকে কে এ্যাপয়েন্ট করেছে, আপনি?

—আজ্ঞে না, আমি কেন করব? খোদ মালিকই ওকে চাকরিতে বহাল করেছেন।

—ওর কোন সুপারিশ-পত্র ছিল?

—তা তো জানি না।

—আপনি ওর ড্রাইভিং লাইসেন্সটা দেখেছেন?

—আজ্ঞে ইয়া; পাঁচ বছরের নিদাগ লাইসেন্স।

—আপনি এক কাজ করুন তো। বিত্তর কাছ থেকে তার ড্রাইভিং লাইসেন্সটা চেয়ে নিয়ে এসে আমার হাতে দিন।

—এখনই দিচ্ছি!

—আর শুনুন; আমি দেখতে চেয়েছি একথা ওকে বলবেন না। যদি প্রশ্ন করে ড্রাইভিং লাইসেন্স দিয়ে কি হবে, তাহলে বলবেন—ওর চাকরী বর্তমানে অস্থায়ী, কিন্তু পার্মানেন্ট চাকরিতে ওর নাম সুপারিশ করার আগে ওর ড্রাইভিং লাইসেন্সটা কলকাতার হেড অফিসে দেখাতে হবে। বলবেন, আগরওয়াল ইণ্ডাস্ট্রিসের হেড অফিসের এস্ট্যাবলিশমেন্ট সেকশন অরিজিনাল লাইসেন্সটা দেখতে চেয়েছে, এ্যাটেম্ টু কপিতে হবে না।

—ও যদি বলে, লাইসেন্স ছাড়া ও গাড়ি চালাবে না?

—তাহলে বলবেন, দুদিনের মধ্যেই ওটা আপনি কলকাতা অফিসকে দেখিয়ে এনে ফেরত দেবেন। এ দুদিন গাড়ি গ্যারেজ থেকে বার হবে না। তাহলে আপত্তির কিছু থাকবে না। বুঝেছেন? আমি যে দেখতে চেয়েছি, সে কথা বলবেন না।

—আজ্ঞে ইয়া, বুঝেছি বইকি।

নকুল হই লোকটাকে দেখতে কেমন যেন। কিন্তু লোকটার একটা গুণ আছে অহেতুক কৌতুহল নেই। চাউনিটা একটু অদ্ভুত রকমের। যেন চোখ দ্বিগুণে গিলে খেতে চায়। তবে সে জন্ত বোধ করি ওর দোষ নেই; সেটা ওর সৃষ্টিকর্তার হাতের খুঁত।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই লাইসেন্সটা এনে দিল নকুল হই। সূজাতা সকাল থেকে নাটকটা পড়বার জন্ত বার বার সেটা খুলে বসেছে; কিন্তু একটা পাতাও তার পড়া হয়নি। তার মনে ‘অকাল বসন্ত’ নেই; সে শুধু ভাবছে—লোকটা কে? বিত্ত দাস, না কৌশিক মিত্র? যদি ও নির্বোধ নিরক্ষর বিত্ত দাসই হয় তবে তার গাড়ির ড্যাসবোর্ডে কৌশিক মিত্রের নামাক্ত ‘ক্রাইম এ্যাণ্ড পানিশ্‌মেন্ট’ বইটা আসে কেমন করে? আর অরুণরতনই বা তাকে কৌশিক মিত্র বলে ভুল করবে কেন? দ্বিতীয়তঃ ও যদি কৌশিক মিত্রই হবে তাহলে এমন ছদ্মবেশে সে এসে পঞ্চাশ টাকার ড্রাইভারের চাকরিই বা করবে কেন? রাশিয়ান এঞ্জিনিয়ারের নামটা পৰ্ব্বস্ত সে ‘উল্লেখ্য’ করতে পারে না! কৌশিক মিত্র এঞ্জিনিয়ার! সেও কি এসেছে ঐ রিসার্চের কাগজগুলোর সন্ধানে? নিজে থেকে আসেনি নিশ্চয়। তাকে কেউ এ কাজে নিয়োগ করেছে। কে সে? কে আবার? নিঃসন্দেহে আগরওয়াল! নিজে দূরে সরে আছে, আর একজন দক্ষ এঞ্জিনিয়ারকে পাঠিয়েছে নিরক্ষর মূর্খ একজন ড্রাইভারের ভেতর ধরে। আর সবচেয়ে মজার কথা সূজাতা দিব্যি এ ফাঁদে পা দিয়ে বসেছিল। সে অতি নিশ্চিন্তমনে ঐ বিত্ত দাসের কাছেই তার ‘পরশমণি’ গচ্ছিত রাখতে চেয়েছিল। আচ্ছা, লোকটা রাজী হল না কেন? বোধ হয় লোকটা অতিশয় ধূর্ত। সূজাতা বতটা ভাবছে তার চেয়েও বেশী। লোকটা আশঙ্কা করেছিল, সূজাতা তাকে সন্দেহ করেছে, আর তাই পরখ করে দেখতে চাইছে প্রথম সুষোগেই সেই গোপন রিপোর্টগুলো হাতাবার জন্ত বিত্ত দাস অতি আগ্রহ প্রকাশ করে কিনা। আসলে সূজাতা কিন্তু তা ভাবেনি; সে সরল মনেই বিত্তর কাছে কাগজগুলি লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিল; ভেবেছিল ওর কাছ থেকে সেগুলো খোঁয়া যাবার ভয় কম। কিন্তু বিত্ত দাস নিশ্চয় ভেবেছিল এভাবে ফাঁদ পেতে সূজাতা তাকে পরখ করতে চাইছে। তাই প্রথম প্রস্তাবে সে রাজি হয়নি। অথচ একেবারে প্রত্যাখ্যানও করেনি। সেও একটা টোপ ফেলে দেখতে চেয়েছিল সূজাতা সে-টোপ খায় কিনা। তাই শহর-প্রান্তের গোপন বাগানবাড়িটা

তখনই দেখিয়ে নিরে এল। যদি বাগানবাড়িটার গোপনীয়তার প্রলুব্ধ হয়ে স্বজাতা সেখানেই রিপোর্টটা লুকিয়ে আসতে চায়, তাহলে ঐ বীপান্তর ফেরত মুসলমান দারোগারানের মারফৎ সে খবর পাবেই, এবং তখনই কৌশিকের তৎপরতা শুরু হবে।

অবশ্য এ সব কথা ধরে নিতে হবে যদি বিত্ত দাস আসলে কৌশিক মিত্র হয়। স্বজাতা মনস্থির করে। বিত্ত দাসকে যে সে সন্দেহ করেছে এটা তাকে জানতে দেওয়া হবে না। সবার আগে তার পরিচয়টা নিশ্চিত ভাবে জেনে নেওয়া দরকার।

ড্রাইভিং লাইসেন্সটা নিয়ে সে সোজা চলে এল খানার। গাড়িতে নয়, একখানা সাইকেল রিক্সা করে। সদর খানার বড় দারোগা রমেন গুহ শুকে দেখে অবাক হন। এখানে তিনি ‘অকাল বসন্ত’ নাটকের পরিচালক মন, খড়া-চুড়া-অঁটা জাঁদরেল পুলিশ অফিসার। বলেন, কী ব্যাপার? একেবারে খানায় এসে হাজির?

যে আর কেউ ছিল না। স্বজাতা তবু চারিদিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিরুপেক্ষ বলে, এসেছি একটা অত্যন্ত গোপন এবং জরুরী কাজে। আপনার বেশী সময় নেব না; কিন্তু আমার একটা উপকার করতে হবে—

—বলুন, কী সাহায্য করতে পারি?

ড্যানি-ব্যাগ খুলে স্বজাতা বার করে একটা ড্রাইভিং লাইসেন্স। বলে, এই ড্রাইভিং লাইসেন্সটা হচ্ছে আমাদের ড্রাইভারের। মাত্র দিন কতক হল তাকে আমরা এ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছি। জানেন নিশ্চয়, আমি মিস্টার এম. কে. আগরওয়ালের সঙ্গে একটা ব্যবসাসম্বন্ধে—

—জানি। আপনার বাবা কি একটা আবিষ্কার করেছেন। আগরওয়াল সেই নিয়ে আপনার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে চায়।

—হ্যাঁ; এই ড্রাইভারটিকে মিঃ আগরওয়ালই চাকরি দিয়েছেন। বিশেষ একটি কারণে আমার সন্দেহ হচ্ছে যে, এ ড্রাইভিং লাইসেন্সটা আসলে বিত্ত দাসের নয়—

রমেনবাবু একটু বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, সে আবার কি কথা? কই দেখি লাইসেন্সটা?

সেটা হাতে নিয়ে ভাল করে পরীক্ষা করে রমেন বাবু বলেন, এমন অদ্ভুত ধারণা কেন হল আপনার?

—সে অনেক কথা । আপনি একটু খোঁজ খবর নিয়ে দেখবেন কি যে এই ফটোটা বিত্ত দাসের কিনা, এবং এই লাইসেন্সটা বিত্ত দাসের কিনা ।

রমেন বাবু চোখ থেকে চশমাটা খুলে নিয়ে তার কাচটা মুছতে মুছতে বলেন, আমি আপনার কথা কিছু বুঝতে পারছি না । এই ফটোটা বিত্ত দাসের কিনা, এবং লাইসেন্সটা বিত্ত দাসের কিনা এসবকিছু খোঁজ নেবার কিছু নেই । আপনি বোধহয় বলতে চাইছেন আপনার ড্রাইভার বিত্ত দাস কিনা তাই খোঁজ নিতে, নয় ?

—হ্যাঁ তাই ।

—তা আমি আপনার ড্রাইভারকে তো দেখিনি ; আপনি দেখেছেন । আপনি বলতে পারেন না এটা তার ফটো কিনা ?

—হ্যাঁ, তারই ফটো ।

—তবে আর আপনার প্রশ্নটা থাকছে কি ?

সুজাতা একটু ঘেমে ওঠে ; কি বলবে ভেবে পার না ।

চশমাটা আবার নাকের উপর বসিয়ে রমেন দারোগা বলেন দেখুন সুজাতা দেবী, কোন লোকের আইডেন্টিটি এস্‌ট্যাবলিশ করতে হলে আমরা তার ড্রাইভিং লাইসেন্সের শরণ নিই ! আপনি কি আদালতে হজফ করে বলতে পারবেন যে এই ড্রাইভিং লাইসেন্সে আটকানো ফটোটা যার তিনি আর আপনার ড্রাইভার অভিন্ন ব্যক্তি ?

—হ্যাঁ, বলতে পারব !

—তাহলে আর খোঁজ খবর করার কোন মানে হয় না । আপনার স্বীকৃতির অসুসিদ্ধান্ত—আপনার ড্রাইভারের নাম বিত্ত দাস, এবং এটা তারই ড্রাইভিং লাইসেন্স, এ সহি তারই । ড্রাইভিং লাইসেন্স একটা লোকের আইডেন্টিটি সম্বন্ধে শেষ কথা !

সুজাতা বলে, মিস্টার গুহ, কারেন্সি নোটই একটা মানুষের আর্থিক সঙ্গতির শেষকথা, কিন্তু জাল নোট কি বাজারে পাওয়া যায় না ?

—জাল ? আপনার সম্মুখে এ ড্রাইভিং লাইসেন্সটা জাল ?

—আমি জানি না ! হলেও অবাক হব না ।

—ওটা আর একবার দেখি ?

আলোর সামনে অনেককণ ধরে সেটা পরীক্ষা করে আবার সেটা ফিরিয়ে দেন অভিজ্ঞ দারোগা, বলেন, আমার বোলো বছরের পুলিশের চাকরি আর

আট বছরের দারোগাগিরি যদি বুধা না হয়, তবে আমি বলব এ ড্রাইডিং লাইসেন্সের এক তিলও জাল নয়।

সুজাতা বলে, এরপর আমার কিছু বলা বোধহয় শোভন হচ্ছে না। তবু আপনাকে একটা অনুরোধ করতে পারি ?

—বলুন না। আমি তো আপনাকে সাহায্য করতেই প্রস্তুত।

—আমার সম্ভ্রম হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে এ ফটোটা য়ার, তাঁর নাম ত্রিকোশিক মিত্র। তিনি দু-বছর আগে শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে বি. ই পাশ করেন। তিনি ভাল ক্রিকেট খেলতে পারেন। আপনি কি এ বিষয়ে একটু খোঁজ নিয়ে আমাকে জানাতে পারেন না ?

রমেনবাবু চুপ করে একটু ভেবে নেন, তারপর বলেন, বেশ, তাহলে ড্রাইডিং লাইসেন্সটা জমা রেখে যান।

—কতদিন রাখবেন এটা ?

—কালই ফেরত পাবেন। আমি এটার একটা ফটো-স্ট্যাট কপি করিয়ে কালকেই ফেরত দিতে পারব। শিবপুরের এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ছবিখানা নিয়ে গেলেই বোঝা যাবে। দু-বছরের ব্যাপার, অনেকেই কৌশিককে চিনবে। দিন লাতেক পরেই পাকা খবর দেব।

—এই ফটো তোলাতে বা অগ্রান্ত কারণে আপনার নিশ্চয়ই অনেক খরচ হবে। আপনার কাছে কিছু টাকা রেখে যাই। কত দেব ?

সুজাতা ব্যাগটা খোলে—

—না না। আপনাকে কিছুই দিতে হবে না। এ সব কাজ করাতে বা খরচ লাগে, তা আমি সরকারী তহাবল থেকে পাই।

—কিন্তু এটা তো সরকারী কাজ নয়।

—আপনাকে অতটা ক্রিটিকাল হতে হবে না। সে আমি বুঝব।

অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে সুজাতা উঠে পড়ে।

—নাটকটা পড়েছেন ?

—না। এখনও পড়া হয়নি, এইবার পড়ব।

—বুঝেছি ! বাড়লা নাটক পড়া আপনার ধাতে নয়না, না ? বড় অ'লো অ'লো লাগে। তারচেয়ে ইংরাজি ডিটেকটিভ নভেল অনেক বেশী ইন্টারেস্টিং।

সুজাতা হেসে বলে, একথা কেন বলছেন ?

—আপনার অভূত ত্রৈলোক্য দেখে !

সুজাতা আবার হাসে, জবাব দেয় না। নমস্কার করে বেরিয়ে আসে।

॥ পনের ॥

দিন সাতেক পরের কথা।

এ কয়দিনে সুজাতার মনের মেঘ একেবারে কেটে গেছে। কৌশিক মিত্র আর বিজ্ঞানদাসের বৈতন্য নিয়ে কদিন বেচারি ভাল করে ঘুমাতে পারেনি। বিজ্ঞানদাসকে সে রীতিমত এড়িয়ে এড়িয়ে চলাছিল। বিজ্ঞান তার লাইসেন্স জমা দেওয়ার পর কেমন যেন ঘাবড়ে গিয়েছিল। সেও এ কদিন যেন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। আজ রমেন গুহর সঙ্গে খোলা কথা বলে সুজাতার মনটা হাল্কা হয়ে গেল।

রমেনবাবু হুঁদে দারোগা। অঁটঘাট বেঁধেই কাজ করেছেন তিনি। সমস্তাটাকে তিনি বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করেছেন এবং সব কাগজ পত্র নিয়ে নিজেই চলে এসেছিলেন সুজাতার কাছে। বলেছিলেন, আশ্চর্য ব্যাপার। আমিও তাজব বনে গেছি। আপনি কৌশিক মিত্রের খবর কোথা থেকে পেলেন জানিনা, কিন্তু আপনার ভুল হওয়া খুবই স্বাভাবিক হয়েছিল। কৌশিকের কথা আপনি কার কাছে শুনলেন বলুন তো ?

সুজাতা প্রতি প্রশ্ন করেছিল, আপনি কি জানতে পেরেছেন, তাই বলুন আগে। সে কথা শুনে—

—না না, শোনা কথা নয়, আমি সব কাগজ পত্র নিয়ে এসেছি ; নিজেই দেখে নিন আপনি—

হ্যাঁ, সুজাতার খবর ঠিকই ! দুবছর আগে শিবপুরের বেঙ্গল এজিনিয়ারিও কলেজ থেকে কৌশিক মিত্র নামে একটি ছেলে পাশ করে বেরিয়েছে। ছাত্র ভালো। ফার্স্ট ক্লাস পেরেছিল। কবিতা লিখত কৌশিক। ক্রিকেটও খেলত। তার বাবার নাম শ্রীজগদানন্দ মিত্র, এম. এম্‌সি ; কালী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন। রিটারার করেছেন। এখনও বেঁচে আছেন। থাকেন কালীতেই। তাই বোন আর কেউ নেই কৌশিকের। বিয়ে করেনি। বর্তমানে সে কোথায় আছে সে খবর এখনও পাওয়া যায়নি। কিন্তু শিবপুর এজিনিয়ারিও কলেজের ওর এক সহপাঠির কাছে কৌশিকের একখানা কটো

পাওয়া গেছে। ফটোখানা রমেনবাবু মার্টকীয়ভাবে টেবিলের ওপর রেখে বলেন, এই হ'ল আপনার এক্সিবিট নম্বর ওয়ান!

ফটোটো হাতে নিয়ে সূজাতা অবাক হয়ে যায়। একটি গ্রুপ ফটো। তিনজন ছাত্র। প্রত্যেকেরই কনভোকেসন গাউন পরা। নিচে তিনজনের নাম 'চাইনিস ইংক' কালিতে সুন্দর করে লেখা। প্রত্যেকের নামের পাশেই বি. ই অক্ষর দুটি সযত্নে লেখা। বাঁ দিকের ছেলেটির নাম সুকমল দত্ত, ডান-দিকের ছেলেটির নাম জীবন বসু। মাঝখানে কৌশিক মিত্রের নাম লেখা। অথচ ছবিটা হুবহু বিভাদানের! তফাৎ শুধু এই যে কৌশিক মিত্রের সঙ্গ গৌফ আছে, তার চোখে চশমা এবং কপালে একটা কাটা দাগ। গৌফ আর চশমা একটা মানুষকে সনাক্ত করতে সাহায্য করেনা, বরং ছদ্মবেশ ধারণেই সাহায্য করে; কিন্তু কাটা দাগটা?

সূজাতা অনেকক্ষণ ছবিটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। তারপর বলে, এই ফটো আর ড্রাইভিং লাইসেন্সের ফটো যে এক লোকের নয়, তা কেমন করে বুঝলেন?

—বুঝলাম, দ্বিতীয় অক্সফোর্ডের সূত্র থেকে। এই হচ্ছে (আপনার) এক্সিবিট নম্বর দুই!

সূজাতা দেখে একখানা টাইপ করা ইংরাজি চিঠি। সরকারী হলুদরঙের ছাপা কাগজে টাইপ করা। লিখছেন ও. সি. হাবড়া। এখানকার ও. সি-কে। উপরের রবার স্ট্যাম্পে ছাপ মারা 'একান্ত-গোপনীয়'। চিঠির বিষয়বস্তু:

"আপনার উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তরে জানাইতেছি যে শ্রীবিশ্বনাথ দাস, গুরুদেব বিত্ত দাস আপনার পত্রে উল্লিখিত ঠিকানায় বাস করিত। তাহার পিতা শ্রীরঘুনাথ দাস এখনও জীবিত। সে উদ্বাস্তু, এখানে ঐ ঠিকানায় সে আজ পনের বৎসর বাস করিতেছে। বিশ্বনাথের বয়স আনু্য পঁচিশ-ছাব্বিশ। এখানকার স্থানীয় স্কুলে সে নিচের দিকে দুই এক বৎসর পড়িয়াছে। মোটর ড্রাইভিং জানে। বিভিন্ন স্থানে ড্রাইভার হিসাবে কাজ করিয়াছে। তাহার পিতা রঘুনাথের অবানবন্দী অক্সফোর্ডে জানাইতেছি, বিশ্বনাথের শেষ পত্র সে ভিলাই হইতে পাইয়াছিল। গতমাসে সে পিতাকে মনিঅর্ডার করে নাই। তাহার বর্তমান ঠিকানা সে জানেনা, তবে আপনার শহরে যে আছে এই তাহার বিশ্বাস। আপনার নির্দেশমত বিশ্বনাথের একটি ফটো সংগ্রহ করিয়াছি। এই সঙ্গে পাঠাইলাম। তাহার পিছন দিকে আমার সই আছে। প্রয়োজনবোধে

আপনি তাহার কপি করাইরা যুল আলোকচিত্রটি আমাকে ফেরত ডাকে প্রত্যাৰ্পণ করিবেন, কারণ তাহার পিতাকে উহা প্রত্যাৰ্পণে আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। রঘুনাথের কথামত এ ছবি মাসছয়েক পূৰ্বে ভিলাইয়ে একজন রাশিয়ান ভদ্রলোকের তোলা। এ বিষয়ে আর কোন জ্ঞাতব্য থাকিলে অসংকোচে আমাকে জানাইবেন।

চিঠির সঙ্গে জেমক্লিপ দিয়ে আটকানো একটি ফটো। সেটা উন্টে সূজাতা পিছন দিকটা দেখবার উপক্রম করতেই রমেনবাবু বলেন, আপনি পাকা ডিটেকটিভ-নভেলের পাঠক। সেইটা আমিও পরখ করেছি।

ছোট চৌকা ফটো। প্রকাণ্ড একটা মার্সেডিস্ গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে বিশ্বনাথ দাস। গৌফ নেই, চশমা নেই, কপালে কাটা দাগ নেই—না হলে সে ছবি ছব্বছ কৌশিক মিত্রের।

রমেনবাবু বলেন, আপনি কি শুধু ডিটেকটিভ গল্পই পড়েন, না ইংরাজি নভেলও পড়েন?

—কেন বলুন তো?

—তাহলে প্রশ্ন করতাম, এ্যান্টনি হোপের ‘ডু প্রিন্সনার অফ্ জেণ্ডা’ পড়েছেন কি না।

—পড়েছি। আমি বরং প্রতিপ্রশ্ন করি, আপনি কি বাঙলা উপন্যাস ‘ঝিন্মের বন্দী’ পড়েছেন?

রমেনবাবু বলেন, এবার বলুন, কৌশিকের সন্ধান কেমন করে পেলেন?

সূজাতা বলে, তার কি আর কোন প্রয়োজন আছে?

—আছে কি না আপনি বলতে পারেন। যদি চান, আমি আরও খবর সংগ্রহ করতে পারি। মার্সেডিস্ গাড়িটার নম্বরও পড়া যাচ্ছে। ঐ সূত্র থেকে ভিলাইয়ে খবর করে জানতে পারি কোন রাশিয়ান অফিসারের ড্রাইভার ছিল এই বিশ দাস এবং এ ফটোখানা সত্যিই তাঁর তোলা কি না।

—আমার মনে হচ্ছে তার আর কোন প্রয়োজন নেই। এ প্রকৃতির একটা খেয়াল। ‘বিনিয়োগ প্রথা’ আজ আর নেই, তবু যে করেই হ’ক দুটি ভিন্ন পরিবারের ভিন্ন মাতৃষকে বিধাতা একেবারে একই ছাঁচে ঢেলেছেন। আমার ড্রাইভারকে আমি অহেতুক সন্দেহ করেছিলাম।

—কোন সংশয় নেই তো আপনার?

—এর পর আর সংশয় থাকবে কেমন কবে বলুন?

—তা ঠিক !

রমেনবাবু বিদায় নেবার পর অনেকক্ষণ চুপ করে বসেছিল স্জাতা। কী অদ্ভুত প্রকৃতির খেয়াল ! অরুণরতন খুব স্বাভাবিকভাবেই বিত্ত দাসকে ভুল করেছিল কৌশিক মিত্র বলে। আর তা থেকেই স্জাতার মনে হয়েছিল কৌশিক মিত্র বিত্ত দাসের ছদ্মবেশে ব্যাপির রিসার্চের কাগজগুলির সন্ধানে এসে হাজির হয়েছে ! নিজেকে থেকে আসেনি, মানে আগরওয়ালই তাকে এ কাজে নিযুক্ত করেছে। আগরওয়াল লোকটার অতীত সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পেরেছে এতদিনে। বুঝেছে তার বিবরে মাথা গলানোই ভুল হয়েছিল স্জাতার। এখন অবশ্য বেরিয়ে যাওয়া বড় সহজ নয়। তবু জাল কেটে তাকে বেরিয়ে যেতেই হবে। তা সে যাই হোক, আগরওয়ালই ঐ লোকটাকে এখানে পাঠিয়েছিল, এ ধারণাই হয়েছিল তার। আসলে এ আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে তার কল্পনা প্রসূত।

মনের মেঘ সরে যাবার পর বিত্ত দাসকে আবার ডেকে পাঠিয়েছিল। খবর পেয়ে বিত্ত এসে দাঁড়ায় হাসি হাসি মুখে, বলে, ডাকছিলেন ম্যাডাম ?

—হ্যাঁ, দেখ ভাবছি গাড়ি চালানো শিখব। চুপচাপ বসেই তো আছি সারাদিন, আমাকে ড্রাইভিং শিখিয়ে দাও না ?

অভ্যাসমত বিত্তর ডান হাতটা চলে যায় ঘাড়ের কাছে, বলে, এ আর বেশী কথা কি ? আপনি একটা ‘লার্নার্স লাইসেন্স’ করিয়ে দিন। কাল থেকেই শুরু করে দিতে পারেন। সাত দিনেই শিখে যাবেন। তবে তারপর আমার চাকরিটা থাকবে তো ?

হো-হো করে হেসে উঠেছিল স্জাতা, বলে, থাকবে না ? তখন তো তুমি আমার শুরু হয়ে যাবে। শুরু বিদায় কি লোকে গলায় হাত দিয়ে করে ?

এক গাল হাসলে বিত্ত।

স্জাতা এরপর সেই কাজেই যেতে উঠেছিল। গাড়ি চালানো শিখতে হবে তাকে। সকালে ও সন্ধ্যায় রাস্তায় ভীড় থাকে। দুপুর বেলায় নির্জন রাস্তায় ওরা দুজনে বেরিয়ে পড়ত ফিরাট গাড়িটা নিয়ে।

এই গাড়ি চালানো শিখতে গিয়েই একটা নতুন অহুত্বের সম্মুখীন হল স্জাতা। যেটার কথা ও সন্ধ্যানে নিজের কাছেই স্বীকার করেনি প্রথমটায়। মাঝে মাঝে কেমন যেন অবশ হয়ে যেত ওর দেহ মন। যখন স্টিয়ারিংও ওর ম্যানিকিওর করা নয়ম আঙুলের উপর হঠাৎ বলিষ্ঠ হাতটা

চাপা দিয়ে বিত্ত দাস ঘুরিয়ে দিত চাকাটা! গাড়িটা আচমকা বাক নিত।
বিত্ত দাস চমকে উঠতো, ষ্টিয়ারিং ঠিক থাকে না কেন? ঠিকমতন ঘোরাতে
না পারলে খানায় গিয়ে পড়বেন যে!

সুজাতা চমকে উঠত, মনে হত গাড়ির ষ্টিয়ারিং নয়, বিত্ত আসলে বলতে
চাইছে সুজাতার মনের ষ্টিয়ারিংয়ের কথা। সেই টাই-রডেও কোথায় যেন একটা
নাটু আলগা হয়ে গেছে। মনের উপর সুজাতার যথেষ্ট জোর আছে; কিন্তু সেই
মনটা আজকাল যেন তার ইচ্ছায় ঠিক মত ঘুরছে না। যেন টালমাটাল গাড়ির
ষ্টিয়ারিংটার মত সে নিজের ইচ্ছায় ঘুরতে চাইছে। কিন্তু তার ইচ্ছামত
ঘুরতে দিলে, ঠিকই বলেছে বিত্ত, সুজাতা যে খানায় গিয়ে পড়বে একেবারে।

এ কী হল সুজাতার? এ কী হতে চলেছে?

সতের বছরের কিশোরী মেয়েটি সে নয়! তবু একটা অন্তর্ভূত আবেশে
সে যেন কেমন বিহ্বল হয়ে পড়ছে আজকাল। অত্যন্ত ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে বসতে
হয় দুজনকে, গায়ে গা লাগা অস্বাভাবিক নয়। গাড়ি চালানো শিখতে গেলে
এসব হবেই; কিন্তু—

বিত্ত দাস অসঙ্কোচে ওর ডান পায়ের পাতাটা দুহাত দিয়ে আলতো করে
তুলে বসিয়ে দেয় এ্যাক্সিলেটারে, বলে, চাপ দিন, একটু একটু করে চাপ দিন
—অমন হঠাৎ দিলে হবে না, দাঁড়ান দেখাই—

ওর পায়ের উপর হাত রেখে অল্প অল্প করে চাপ দেওয়া শেখায়! সুজাতার
মনে হয় সে চাপ শুধু এ্যাক্সিলেটারে পড়ছে না। হঠাৎ পা টেনে নিয়ে বলে
—পায়ে হাত দিচ্ছ কেন?

—তাতে কি হয়েছে, আপনি তো বামুন!

—তা হ'ক, তুমি বয়সে বড়! সম্পর্কে এখন তুমি আমার গুরু!

এসব সঙ্কোচ থাকলে সাতদিনে আপনাকে আমি পেখাতে পারব না কিন্তু,
তা আগেই বলে দিচ্ছি!

—সাত দিনে না হয় নাই হল, পায়ে হাত দিওনা তুমি। তাছাড়া আমার
সুড়সুড়ি লাগে।

তড়াক করে নেমে পড়ে বিত্ত, রাগ করে, সরে বসুন।

সুজাতা অবাক হয়ে বলে, কেন কি হল?

—আপনার দ্বারা হবে না! এসব সুড়সুড়ি কাতুকুতুর ভয় বাতের অত
বেশি, তাহের আবার গাড়ি চালানো শিখতে আসা কেন?

সুজাতা চোখ পাকিয়ে বলে, তুমি শেখাতে পারছ না, তাই বল। অন্য কোন ড্রাইভার হলে এতদিনে আমাকে ঠিক শিখিয়ে দিত।

বিশু দাস ওকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে স্টিয়ারিংয়ে বসে, বলে, তাহলে কোন 'মোটর ড্রাইভিং স্কুলে' ভর্তি হন গিয়ে। আমার দ্বারা হবে না।

সুজাতা মুখ টিপে হাসে। বলে কিন্তু গম্ভীর হয়ে, তাই ভর্তি হতে হবে আমাকে। তুমি কিছুই শেখাতে পারছ না। শুধু পায়ে হুড়হুড়ি দিচ্ছ।

বিশু ততক্ষণে গিয়ার বদলে ছ-ছ শব্দে ফিরে চলেছে বাড়ির দিকে। সেও রাগ করে বলে, ড্রাইভিং স্কুলের মাস্টারেও আপনাকে শেখাতে পারবে না। আপনার মাথায় গোবর পোরা।

সুজাতা রাগ দেখিয়ে বলে, দাঁড়াও আগরওয়াল আসুক! তাকে বলে তোমার চাকরি খতম করব আমি! তুমি বলেছ আমার মাথায় গোবর পোরা!

ঘাট করে গাড়িটা বাঁ-দিকে দাঁড়িয়ে পড়ে।

বিশু গাড়ি থামিয়ে বলে, আপনি তো বেশ লোক! এই বলছেন, তুমি আমার বয়সে বড়, তুমি আমার গুরু! তা গুরু কি শিষ্যকে ধমকও দেবে না? তবে আপনি শিখবেন কেমন করে?

—আর শিখে কাজ নেই। নাও চল এখন, বাড়ি চল। খানায় ফেস না গাড়িটা! তোমার কাছে শিখব না আমি!

কিন্তু তার পরদিন দেখা যায় গুরু শিষ্য আবার বসেছে ষেঁষাষেঁষি হয়ে!

বিশু দাস যেন মাণুষ নয়, একটা মেশিন, ভাবে সুজাতা।

হুজনেই যখন স্টিয়ারিং ধরে চালাতে থাকে তখন উৎসাহের আতিশয্যে লোকটা খেয়ালই করেনা যে তার দেহের চাপ পড়ছে সুজাতার গায়ে। তার ডান হাতের কনুই বোধকরি অনুভব করে না অসতর্ক কঠিন স্পর্শে সুজাতার বুকের স্পন্দন, কিন্তু সুজাতার কান গরম হয়ে ওঠে। বিশু তার দিকে ফিরে যখন নির্দেশ দিতে থাকে তখন তার নিঃশ্বাস এনে লাগে সুজাতার আরক্তিম কপোলে, রোস্টেড টোব্যাকোর কড়া গন্ধ এনে আঘাত করে সুজাতার দ্রাণে— সুজাতা যেন অবশ হয়ে যায়। নিকানবিশির পাঠ শেষ হলে যখন বিশু দ্বারের বাইবদ্ধ থেকে মুক্তি পায় সুজাতা, তখন যেন ক্রান্তিতে ভেঙে পড়তে চায় তার দেহমন। সে ক্রান্তি যে শুধুমাত্র গাড়ি চালানো শিখতে যাওয়ার দৈহিক শ্রম এটাই নিভেকে বোঝাতে চায় সুজাতা; কিন্তু মাঝে মাঝে গুরু মনে হয়, মনকে চোখ ঠারছে না তো?

রাত্রে বিছানার ওয়ে স্জাতা রোমছন করতে থাকে সারাদিনের অস্থুতি-
শুলোকে । হঠাৎ মনে পড়ে যেত আগরওয়ারলের প্রথম দিনের সেই অশ্লিল
রসিকতাটা । লেডি চ্যাটার্জি আর তার প্রেমাস্পদ ! ওর মন বিহোহ করে
উঠত, বলত এ অস্তায়, এ চিন্তা অশুচি ; কিন্তু ওর অবচেতন মন হঠাৎ বলে
বসত,—কী ক্ষতি হত হুনিয়ার, যদি বিধাতা ভুল করে বিত্ত দাসকে গড়তেন
কৌশিক মিত্র করে ?

পরদিন সকালে স্জাতা একটি টেলিফোন পেল স্থানীয় পোস্ট অফিস
থেকে । তার প্রেরিত একটি পাঁচশো টাকার ইন্সিওর্ড পার্সেল প্রাপককে
খুঁজে না পাওয়ায় ফেরত এসেছে । স্জাতাকে পোস্ট অফিসে গিয়ে সেই
প্রত্যাখ্যাত ইন্সিওর্ড পার্সেলটা নিয়ে আসতে হবে । সকাল সাড়ে দশটার
মধ্যে গেলেই ভাল হয়, কারণ বীটের পিয়নরা তাকে সনাক্ত করতে পারবে
তাহলে ।

তৎক্ষণাৎ বিত্তকে ডেকে গাড়ি বার করতে বলে স্জাতা । পনের
মিনিটের মধ্যে হাজির হয় ডাকঘরে । ভারপ্রাপ্ত কেরানি ছেলেটি হেসে
বলে, দেখুন আপনার অস্থরোধ আমি অকরে অকরে রেখেছি । ইন্সিওর্ডটা
ফিরে আসামাত্র আপনাকে ফোনে জানিয়েছি ।

—অসংখ্য ধন্যবাদ ! দিন কি কি কাগজে সই করতে হবে ।

—এ ভদ্রলোক ঐ ঠিকানায় থাকেন না বুঝি ?

—না উনি বিলেত চলে গেছেন ! ইন্সিওর্ড করার পরেই সেটা জানতে
পারি আমি ।

মোটামুটি ফেরত নিয়ে গাড়িতে গিয়ে বসে স্জাতা । বিত্ত বলে এখন
কোনদিকে যাবেন ? শিখবেন চালানো ?

স্জাতা বলে, না ! সবার আগে এই খামটার গতি করতে হবে । এটার
মধ্যে কি আছে বলতে পার ?

—কাগজ পত্র হবে বোধহয় ।

—না । এর মধ্যেই আছে সেই পরশ পাথরটা ! যেটার কথা সেদিন
তোমাকে বলেছিলাম ।

—ওরে বাবা ! বিত্ত ভীত দৃষ্টিতে খামটার দিকে তাকিয়ে থাকে ।

—ওরে বাবা কিসের ? বল, এটা এখন কোথায় রাখা যায় ?

—ঐ বাগান বাড়িতেই রেখে দিবে আসুন ।

এবার আর কোন ইতস্তত করে না স্বজাতা। গাড়ি নিয়ে ওরা চলে আসে সেই পড়ো বাড়িটার। কাদের আলি ওদের আশ্রয়ন করে বসায়। আশ্রিত দিনের আলোর লোকটাকে অত ভয়াবহ মনে হল না। তার উপরোধে এক পেরালা চা খেতেও রাজি হল। লোকটা চারের আয়োজন করতে যখন ব্যস্ত তখন বিত্ত দাসের সঙ্গে পরামর্শ করে স্বজাতা বন্ধ খামটা লুকিয়ে রাখল একটা কুলুঙ্গির পিছনে।

বিত্ত বলে, চোরের বাবারও আর সাধা হবে না এটা ওখান থেকে খুঁজে বার করার।

—কিন্তু তুমি চুরি করবে না তো ?

—কি যে বলেন ? ঘাড়টা চুলকাতে শুরু করে আবার।

এক পেরালা চা খেয়ে ওরা আবার রওনা হয়ে পড়ে নিকরদেশে বাতায়।

খোলা রাস্তা দিয়ে ছ-ছ শব্দে গাড়ি ছোটায় স্বজাতা, বিত্ত আলতো করে ধরে থাকে স্টিয়ারিং, বলে—এখন রিভার্স গিয়ারটা একটু প্র্যাকটিস্ হয়ে গেলেই আপনি পরীক্ষা দিতে পারবেন।

সমস্ত দুপুর গাড়ি চালিয়ে ক্লান্ত লাগছিল স্বজাতার। বলে এখানে কিছু খাবার পাওয়া যায় না কোথাও ?

বিত্ত আশে পাশে তাকিয়ে বলে, কি খাবেন বলুন ? মিষ্টি না নোনতা ?

—যা পাওয়া যাবে।

একটা মিষ্টির দোকানের কাছাকাছি গাড়িটা রাখে বিত্ত। বলে, পরসন্ধ্যা দিন।

—পরসন্ধ্যা আমি কেন দেব ? তুমি খাওয়াও !

—বারে ! এই বুঝি আপনার গুরুদক্ষিণার বহর !

শেষপর্যন্ত স্বজাতাই টাকা বার করে দেয়। এক ঠোঙা গরম সিঙাড়া ভাজিয়ে নিয়ে আসে বিত্ত, আর কাঁচা গোলা।

—এত কি হবে ?

—বাঃ ! আমিও আছি যে !

—ও ! তুমিও আছ ? বেশ, খাও তবে। কিন্তু জল কই ?

জলও নিয়ে এসেছে দোকানের একটি ছোকরা চাকর। গাড়ির আশ্রয়স্থান দেখছিল সে। খাবার ও জল খেয়ে স্বজাতা বলল, এবার চা খেতে হয়।

—চায়ের কথাও বলে এসেছি। পান খাবেন ?

—থাক। এই নাও পানের পরস।

—ওটার পরস। আর আপনাকে দিতে হবে না ম্যাডাম। ওটা আমি খাওয়াচ্ছি আপনাকে। জর্দা খান নাকি ?

—সে তো আরও ভাল কথা। না, জর্দা চাই না।

পানটা এনে দিয়ে বিত্ত বলে, পানটা খান, আমি একটু আসছি।

—আবার আসছি কেন ? খাবার হল, চা হল, পান হল, আবার দেয়ী করা কেন ? ও হরি ! তাই তো ! তা সিগারেট খাও তুমি, আমি কিছু মনে করব না।

বিত্ত জোরে জোরে ঘাড়টা চুলকাতে থাকে।

—আরে ধরাও না। যতদিন না ড্রাইভিং লাইসেন্স পাচ্ছি ততদিন আমি তোমার শিষ্য ! তারপর কিন্তু আমার সামনে খেতে পাবে না। তা বলে দিচ্ছি !

বিত্ত আর ইতস্তত না করে পকেট থেকে চেপ্টে খাওয়া একটা চামুনিবারের প্যাকেট বার করে একটা ধরিয়ে ফেল।

—এসব খাওয়া কেন ? স্বাস্থ্যও যায়, পরসাও যায় ! এ দিকে তো সেফ্টি রেকার কেনার পরস নেই !

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বিত্ত বলে, সে যুগ পার হয়ে এসেছি ম্যাডাম, এখন আমি আমার আদমি !

—পকাশ টাকাতেই তুমি আমীর হয়ে গেছ ?

বিচিত্র হেনে বিত্ত বলে, আমি যে পরশমনির খোজ পেয়েছি !

স্বজাতা চম্কে যায় ! হাসিটা কেমন বেন।

। যোল ।

অতি প্রত্যুষে, সূর্যোদয়ের আগেই স্বজাতা এসে বসেছিল নদীর ধারে চিহ্নিত স্মৃতিস্মারক বটগাছটার নিচে এষ্টা পাথরের উপর। পূর্ব আকাশটা লালে লাল হয়ে উঠেছে। নদীর ওপারে বিস্তৃত গ্রামটার উপর এক চাপ ধোঁয়ার মেঘস্তূপ, ধোঁয়া না কুশাশা ? অসংখ্য পাখি ডাকছে এখানে ওখানে। খেজুর রস পাড়তে এসেছে একজন গাঁয়ের বাচ্চ। নদীর বাঁধ

বরাবর খেজুর গাছের সারি। তাতে কলসি বাঁধা। লোকটা একে একে সঞ্চিত খেজুর রস সংগ্রহ করছে একটা হাঁড়িতে। আর বারে বারে আড় চোখে তাকিয়ে দেখছে নির্জন নদীতীরের ঐ একলা বসে থাকা মেয়েটার দিকে। একটা গরুর গাড়ি চলে গেল শহরতলীর দিকে। তার তৈল-ভষিত চাকার আর্তনাদ অনেকক্ষণ শোনা গেল। টাপর তোলা, ঢাকা দেওয়া গো-গাড়ি। গাড়োয়ান কানমাথা ঢেকেছে ফেট্টা বেঁধে। বেশ হিম হিম লাগছে সকালের হাওয়া। সূজাতা ঘোমটার আকারে শালটা মাথার উপর তুলে দেয়। কানটা ঢাকে।

হাতখড়িটা একবার দেখে। না, এখনও সাড়ে ছয়টা বাজেনি। এই গাছের তলায় আজ সকাল সাড়ে ছয়টার সময় তাকে অপেক্ষা করতে বলেছেন বৃদ্ধ ব্যারিস্টার পি. কে. বাহু। অদ্ভুত মানুষ ঐ বাহুসাহেব। তাঁরই দ্বারস্থ হয়েছিল শেষ পর্যন্ত। নাটকের মাঝখানে কয়েকটা সীনে তার অভিনয় নেই। তাই সুযোগ বুঝে বাহুসাহেবকে জনাস্থিকে বলেছিল, আপনাকে কয়েকটা কথা প্রাইভেটলি বলতে চাই, মানে আমার ব্যক্তিগত কথা। জানেন বোধহয়, আমার কোন অভিভাবক নেই, আমার বাবা সম্প্রতি মারা গেছেন—

বাহুসাহেব নিম্নশ্বরে বলেছিলেন, আই নো, বেশ ওঘরে এস।

রিহার্সালের ঘর ছেড়ে ওরা উঠে আসেন পাশের একটি ছোট ঘরে। বাহুসাহেব দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বলেন, বল কী গোপনীয় কথা বলতে চাও।

—দেখুন, আমি বোধহয় একটা গভীর ষড়যন্ত্রের মধ্যে পড়েছি। ঘটনাচক্রে কতকগুলো অত্যন্ত মূল্যবান কাগজ—

—জানি! এবং সম্ভবত তুমি যতটা জান, তার চেয়েও আমি কিছু বেশী জানি।—এক কথায় তাকে খামিয়ে দিয়েছিলেন বৃদ্ধ।

—আপনি সব কথা জানেন? তবে তো অনেক সহজ হয়ে গেল আমার পক্ষে। কিন্তু আপনি আমার চেয়ে কী বেশী জানেন?

—তুমি এ জেলার রাজনীতিতে একটা প্রধান ভূমিকা নিয়েছ, তা কি তুমি জান?

—রাজনীতিতে?

—হ্যাঁ! আগামী ইলেকশানে তোমার যে একটা প্রকাণ্ড ভূমিকা রয়েছে এ খবর কি তুমি রাখ?

স্বজাতা অবাক হয়ে বলে, এসব কী বলছেন আপনি !

—অর্থাৎ তুমি জান না। জানবার দরকারও নেই। কিন্তু আমি তো তোমাকে কোন সাহায্য করতে পারব না স্বজাতা। আমি প্র্যাকটিশ ছেড়ে দিয়েছি আজ পনের বছর। আমি অধব, বৃদ্ধ। আর তাছাড়া আমি কর্মজীবনে ছিলাম ক্রিমিনাল ল-ইয়ার। ঐ একটা খেলাই জানি আমি—টাগ অব-ওয়ার !

—টাগ-অব-ওয়ার। মানে ?

—দড়ি টানাটানি ! আমি ছিলাম খুনের মামলার পেশালিস্ট। অর্থাৎ পাবলিক প্রসিকিউটার ফাঁসির দড়িটা টেনে আমার মক্কেলের গলায় পরিবে দেবার আগ্রাণ চেঁটা করতেন, আর আমি তান মারতাম তার বিপরীত দিকে। এই একটি দড়ি টানাটানির খেলাই খেলে গেছি দীর্ঘ চল্লিশবছর। আমি তো তোমার কোন উপকারে লাগব না। তোমার প্রয়োজন একজন এ-ক্লাশ সলিসিটারের। আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি, তুমি এখনই তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা কর। ক'লকাতায়। ইন্সিডিয়েটল ! আই মীন, কাল সকালের প্রথম ট্রেনেই !

—এতই জরুরী ?

—এতই জরুরী ! তুমি জান না, আমি জানি কী প্রচণ্ড রিস্ক নিয়ে তুমি চলেছ প্রতি মুহূর্তে। যে কোন মিনিটে তুমি খুন হয়ে যেতে পার।

—খুন ! কী বলছেন আপনি ? —ভয়ে সাদা হয়ে গিয়েছিল স্বজাতা।

বাহুসাহেব গুর হাতটা তুলে নেন। আন্তে আন্তে সেই নরম হাতের উপর বলিরেখাক্রি়ত হাত বুলিয়ে দিতে থাকেন। তারপর গম্ভীরভাবে বলেন, অন্য কোন মেয়ে হলে একথা বলতুম না। কিন্তু তোমার কথা আমি সমস্তই শুনাছি। আমার মনে হয়েছিল তুমি 'স্টে-ব্রাইট-টিল'। যে মেয়ে আগরওয়ার আর মহাপাত্রের মত দুই বোকার মাঝখানে মাথা ঠিক রেখে দাবার চাল দিতে পারে, তার তো এ কথার ভয়ে সাদা হয়ে যাওয়ার কথা নয় স্বজাতা।

স্বজাতা মুহূর্তে আত্মসংবরণ করে। কি একটা কথা বলতে যায়, তার আগেই একজন আদালী ভেজানো দরজাটা কঁক করে সেলাম করে। বাহুসাহেব বিরক্ত হয়ে তার দিকে তাকিয়ে বলেন, দেখছ দরজাটা বন্ধ করে রেখেছি, যাও, পরে এস !

লোকটা আবার একটা লম্বা সেলাম করে বলে, গোস্বাকি মাণ করবেন
হজুর, আমি খবর দিতে এসেছিলাম, সেই ফুলটা ফুটেছে—

চমকে ওঠেন বাহুসাহেব, বলেন, কতক্ষণ ?

—অনেকক্ষণ হজুর, দরজা বন্ধ ছিল বলে—

—তুমি একটা বন্ধু! চল চল, এস সূজাতা—

সূজাতা কিছুই বুঝতে পারে না। নির্দেশমত প্রায় ছুটেই বেরিয়ে
এসেছিল বাইরে। টর্চের আলোর লোকটা পথ দেখিয়ে নিয়ে এল বাগানের
একবারে অন্তপ্রান্তে। সেখানে চার পাঁচজন লোক টর্চ জ্বলে কি দেখছে।
বাহুসাহেবকে দেখে সবাই সরে গেল। দামি স্যুটটার প্রতি কোন কক্ষণ
না করে বাহুসাহেব মাটির উপরেই হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন। একটা
নিচু ডালের সাদা ফুলের দিকে তাকিয়েই বললেন—এ ছি ছি! দেরি
হয়ে গেল! তুমি আগে ডাকলে না কেন শ্রীমন্ত!

—দরজা বন্ধ ছিল যে হজুর!

—দরজা তো ছিটকিনি দেওয়া ছিল না, আর থাকলে ভেঙে ঢুকলে
না কেন? এই নিয়ে তিনবার মিস্ করলাম।

লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ান বাহুসাহেব।

সূজাতা অবাক হয়ে বলে, ব্যাপারটা কি?

বাহুসাহেব টর্চের আলোটা ফেলেন ঐ গাছটার উপর, বলেন, কি ফুল
জান?

—না।

—এর নাম নাগচম্পা! ইংরাজি নাম নাইট-কুইন, ‘রাতে-রানী’! তীব্র
গন্ধ এর লোকে বলে কিছুটা বিষাক্ত! ফুলগুলো কিছু বোঁটা থেকে হয় না,
হয় পাতা থেকে, এই দেখ! ঠিক সাপের ফনার মত একটা ফনা বেরিয়ে আসে
পাতা থেকে, তারই মাথায় ধরে ফুলটা। সাধারণতঃ ফোটে সন্ধ্যাবেলায়।
এক রাতেই এর সমস্ত মৌরভ বিলিয়ে দিয়ে ঝরে যায় সকালে। সংক্ষিপ্ত জীবন
ওর, কিন্তু যে রাতে নাগচম্পা ফুটেবে সে রাতে সেই হচ্ছে বাগানের রানী। আর
কোন ফুলের গন্ধ একে ছাপিয়ে যেতে পারবে না। পাচ্ছ? গন্ধ পাচ্ছ?

সূজাতা অদ্ভুত বৃহৎ একটা মৌরভ পায়, বলে, আশ্চর্য ফুল তো!

—হ্যাঁ, কিন্তু ওর আসল বৈশিষ্ট্যটার কথা এখনও বলিনি। ঐ ফুলের
কুঁড় থেকে ফুল ফুটেতে সময় লাগে মাত্র পনের থেকে বিশ মিনিট। ঠিক সে

সময় যদি উপস্থিত থাক লিটারালি দেখতে পাবে কুঁড়ির পাপড়িগুলি ধর ধর করে কাপছে। তোমার চোখের সামনেই মাত্র কয়েক মিনিটে ধর ধর করে কাপতে কাপতে ফুলটা ফুটবে। অদ্ভুত সে দৃশ্য! এ গাছে এবার নিম্নে তিনবার ফুটল ফুলটা, অথচ ঐ বুদ্ধের দোষে—

লাঠিটা তুলে তিনি মালিকে ছদ্ম ভাড়া করলেন।

ভীড়ের মাঝে কে একজন বললে, একটা গাছে কটা ফুল হয় আর?

সুজাতা টর্চের আলোর দেখে লোকটা বিস্ম দাস। সব কজনই গাড়ির ভাইভার। বাসু-সাহেব চলতে শুরু করেছিলেন, এ প্রশ্নে হঠাৎ থেমে পড়ে জবাব দেন, তার একটা নিখুঁত হিসাব আছে। সে হিসাবের একটি কম বা একটি বেশি ফুলও কোন গাছে ফোটে না। তবে সে হিসাব যে বেটা জানে তার পাত্তাই পাওয়া যায় না! সে লুকিয়ে বসে আছে ঐখানে।

হাতের লাঠিটা তুলে তারায় ভরা নৈশ আকাশের দিকে নির্দেশ করেন বুদ্ধ।

টর্চের আলোর বাড়ির দিকে ফিরে আসার পথে সুজাতা বলে, সেই কাগজ-গুলো—

বাধা দিয়ে বাসুসাহেব বলেন, এখানে আর একটি কথা নয়। চল রিহার্সালে যাই আমরা। কত ভোরে ওঠ তুমি?

সুজাতা প্রশ্নটা ঠিক মত বুঝতে পারে না, বলে, কী বলছেন?

—তুমি আলি রাইসার তো? না হলে আজ এ্যালার্ম দিয়ে শোবে। কাল ভোর সাড়ে ছয়টার সময় নদীর ধারে কুরি নামা বটগাছটার তলায় আমার দেখা পাবে।

—এমন অদ্ভুত স্থান-কাল?

—কারণ পাত্রটাও যে অদ্ভুত! স্থান কাল তো পাত্রের উপযুক্ত হবে, না কি বল? চিরটা কাল ক্রিমিনোলজি নিয়ে কেটেছে আমার। ফলে আমার ‘রান্দেরু’ তো এমন একটা বিচিত্র কিছুই হবে। চল এবার ও ঘরে যাই।

তাই এই সাতসকালে এই নদীর ধারে এসে বসে আছে সুজাতা। বাসু সাহেব কিন্তু সূর্যের মত পাখুয়ালি উপস্থিত হলেন। ছয়টা পচিশ মিনিটে একটা পুরানো মডেল সিট্রন এসে দাঁড়াল নদীর ধারে। বাসুসাহেব নিজেই গাড়ি চালিয়ে এসেছেন। গাড়িটা রেখে লাঠি ঠুক ঠুক করতে করতে গাছতলায় এসে পৌছাতে তাঁর আরও মিনিট পাঁচেক লাগল।

: শুভমনিং ইয়াং লেডি! এস আমরা একটু পায়চারি করি।

বাসুসাহেবের ডান হাতে লাঠি, বাঁ হাতটা ধরল স্জাতা।

চট করে খেয়ে পড়েন বাসুসাহেব : জোস্ট এ মিনিট ! হাত ধরলে কেন ?

: আজ্ঞে ? —স্জাতা খতমত খেয়ে যাব।

: মানে, যদি মনে করে থাক বুড়োটার হাত না ধরলে খানায় পড়ে মরবে, তাহলে আমি ধন্যবাদের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করব ; আর যদি ‘উইনসাম ম্যারোর’ মতো হাত ধরে আমার সঙ্গে চলতে চাও—

স্জাতা ঠুঁর বলিরেখাক্ত হাতটা ধরে হেসে বলে, আপনি বুড়ো কে বললে ?

বুদ্ধ পকেট থেকে একখানা বন্ধ খাম বার করে স্জাতার হাতে দিয়ে বলেন, আজ সকাল দশটা কুড়ির ট্রেনে কলকাতা চলে যাও। এই তোমার পরিচয় পত্র। জীমূতবাহন সাহেবের পরিচয় পত্রটার আর প্রয়োজন হবে না—

: সে কথাও জানেন আপনি ?

বুদ্ধ হাসলেন শুধু। আবার দু এক পা চলার পর বলেন, তোমাকে একটা কৈফিয়ৎ দেওয়ার আছে। এমন জায়গায় এমন সময়ে কেন দেখা করলাম। একটা কারণ তোমাকে যতশীঘ্র সম্ভব কলকাতা পাঠাতে চাই। আর একটা কারণ, আমি জানাতে চাই না যে আমি তোমাকে সাহায্য করছি। প্রতিদিন এ সময়ে এখানে আমার সাক্ষাত পাবে। প্রাতঃভ্রমণ আমার রুটিন বাঁধা কাজ। ঘটনাচক্রে তোমার বেড়াতে আসাও অসম্ভব নয় কিছু। তারপর বেড়াতে বেড়াতে আজকের ‘ওয়েদার’ নিয়ে আমরা যদি দুটো কথা বলাবলি করি তাহলে লোকে বলতে পারবে না আমরা মৎলব ভাঁজছি, তাই নয় ?

: বুঝলাম। আমি বেশ বুঝতে পারছি, আপনি আমার সম্বন্ধে অনেক খবর রাখেন। আচ্ছা আমার ড্রাইভার বিত্ত দাস লোকটা কে আপনি জানেন ?

: জানি। বর্তমানে যে তোমার গুরুদেব। তার কাছে ড্রাইভিং শিখছ তুমি।

স্জাতার বিশ্বাস ক্রমেই বাড়ছে, বলে, সে তো বর্তমানে। অতীতে লোকটা কি করত ?

: তাও জানি। কিন্তু তা তোমাকে তো জানাতে পারব না !

ধমকে দাঁড়িয়ে পড়ে স্জাতা, বলে—কেন ?

: কারণ তুমি ছাড়াও হয়তো আমার আরও মকেল আছে। তাহলে কেও

পরামর্শ দিই আমি। তাদের গোপন কথাও আমি তোমার কাছে প্রকাশ করে বলতে পারি না!

: লোকটা নিরক্ষর রিফুজি একজন?

বাহুসাহেব জবাব দিলেন, ঐটা কি পাখি বলত? জান না? ওটা একটা মাইগ্রোটারী বার্ড। শীতকালে এদেশে আসে, গরু দেশ—

বাধা দিয়ে সূজাতা বলে, ঠিক আছে বিত্তর কথা আর আপনাকে জিজ্ঞাসা করব না। ভেবেছিলাম গরু রহস্যের কিনারা করে ফেলেছি; আজ আপনার কথার সন্দেহ হচ্ছে বোধহয় ভুল করেছি কিছু! আবার ভাল করে ভেবে দেখব। কিন্তু আমার কাছে যে কাগজপত্রগুলো আছে—

—না সূজাতা। সে সহজেও আমি কোন আলোচনা করব না। ওটা তোমার টপ্ সিক্রেট! একমাত্র তোমার মলিসিটারের হাতে, যার নামে ঐ চিঠি লিখে দিলাম, তাঁর হাতে ঐ কাগজগুলো নিশ্চিত মনে জমা দিতে পার। তবে একটা কথা। যেখানে সেটা লুকিয়েছ সেখান থেকে কাগজগুলো বার করার আগে একবার ভাল করে দেখে নিও চারিদিক! সম্ভব হলে আজই কাগজগুলো নিয়ে যাও। আজই জমা করে দিয়ে এস।

—মিস্টার ঘোষ কি আমাকে কোন সাহায্য করতে পারেন না?

—কে বিপুল? না! তার এসব ব্যাপারে মাথা গলানো ঠিক নয়। অস্তুত এই সময়ে। সে চাকরি করে, এটা এখন রাজনীতির ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাহুসাহেব গাড়ি করে শুকে অনেকটা আগিয়ে দিয়ে গেলেন। রাস্তার ধারে এক জায়গায় নামিয়ে দেওয়ার সময় বললেন সৌজন্য বলে, তোমাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া আমার কর্তব্য; কিন্তু সর্ব্ব্ব বল, তোমাকে এখানেই নামিয়ে দেওয়া উচিত। আশা করি আমাকে আনুশ্রিভালরাস্ মনে করবে না।

সূজাতা বাড়ি এসে পৌঁচাল সকাল সাড়ে সাতটার মধ্যেই। তাকে দেখতে পাওয়া মাত্র বনোয়ারিলাল নিবেদন করে—নকুলবাবু এই সাত সকালেই দু-দুবার এসে খোঁজ করে গেছেন। বলেছেন, যেমসাহেব ফিরে আসা মাত্র তাঁকে খবর দিতে।

খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ এসে হাজির হল নকুল হই, তার সেই পেটেন্ট গলাবন্ধ কোট পরে। চোখ পিটু পিটু করে বলে, মালিক ক'লকাতা থেকে

কাল রাতে ট্রাঙ্ক কল করেছিলেন। বলেছিলেন আজ সন্ধ্যায় তিনি আসবেন। সন্ধ্যা ছ'টার মে'লে। আগনাকে তৈরী থাকতে বলেছেন; কাল ক'লকাতা যেতে হবে পেটেন্ট নেওয়ার কাজে।

—ও আচ্ছা!

সুজাতা একটু বিচলিত হয়ে পড়ে। আগরওয়াল ট্রাঙ্ক কল করে জানিয়েছে যে সে পেটেন্ট নিতে প্রস্তুত। কেমন করে প্রস্তুত হল সে? কাগজ পত্রগুলো তো এখনও সুজাতারই কাছে আছে। আগরওয়াল তো তার নাগাল পায়নি। তাহলে কেমন করে সে পেটেন্ট নেবে? তা সে যাই হোক, কিন্তু আগরওয়ালের এ নির্দেশ অগ্রাহ্য করে সুজাতা যদি আজই কলকাতা চলে যায়, তাহলে আগরওয়ালের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করেই যেতে হয়। আগরওয়ালকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই—কিন্তু সে যদি সত্যিই অকৃতভাবে এ গুপ্তধনের সন্ধান পেয়ে থাকে তাহলে সুজাতা তার এক কান্না কড়িও পাবে না। এ ক্ষেত্রে তার কী করণীয় সে বিষয়ে একজনই তাকে পরামর্শ দিতে পারেন। তিনি তীক্ষ্ণবী বাহুসাহেব। এতক্ষণে তিনি নিশ্চয় গিয়ে পৌঁচেছেন বাড়িতে। সুজাতা স্থির করে ম্যাভিস্টেট-সাহেবের বাড়লোয় ফোন করে বাহুসাহেবের নির্দেশ নেবে। আগরওয়ালের আদেশ অগ্রাহ্য করেও কি সে ক'লকাতা যাবে দশটার ট্রেনে?

ঘরে এসে ফোনটা তুলে নেবার আগেই সেটা ঝন্ঝন্ করে বেজে ওঠে।

—হ্যালো? সাড়া দেয় সুজাতা।

—সুজাতা, দেবী? আমি মিসেস্ রায়চৌধুরী কথা বলছি; চিনতে পারছেন?

—হ্যাঁ হ্যাঁ; কি খবর বলুন।

মিসেস্ রায়চৌধুরী হচ্ছেন স্থানীয় পি. ডাব্লু ডি-র ডিভিসানাল এন্টিনিয়ার স্ক্রুভ রায়চৌধুরীর স্ত্রী। রিহার্সালে আলাপ হয়েছিল কদিন আগে। ডক্টর-মহিলা খুব বকবক করতে পারেন। রীতিমত গল্পবাজ।

—ওহুন, সেদিন আপনি ওর কাছে কৌশিক মিত্রের খোঁজ করেছিলেন মনে আছে?

—আছে। মিস্টার রায়চৌধুরী তো বলবেন তিনি অনেক দিন আগে পাশ করেছেন। কৌশিক মিত্রকে চেনেন না।

—কিন্তু কৌশিক মিত্রকে কেন খুঁজছেন বলুন তো?

স্বজাতা হেসে বলে, আপনি সে কথা জানতে চাইছেন কেন বলুন তো ?

—আমি আনন্দ করছি ! কোশিকের সঙ্গে আপনার একটা সম্বন্ধ উঠেছে । তাই নয় ?

এসব বাজে গল্প এখন মোটেই ভাল লাগছিল না স্বজাতার ; কিন্তু তার-পরের কথাটাতে সে চমকে ওঠে । মিসেস্ রায়চৌধুরী বলেন, কোশিকের একজন বন্ধু আজ এসেছে । আমাদের এখানেই আছে । কথা বলবেন ?

—কোশিকের ক্লাস ফ্রেণ্ড ?

—হ্যাঁ । ঘনিষ্ঠ বন্ধু ।

—কি নাম বলুন তো ?

—কিশোর ডালমিয়া ।

—তাকে ফোনটা দিতে পারেন ?

—কথা বলুন না ।

একটু পরেই ও প্রান্তের টেলিফোন হস্তান্তরিত হল বোঝা যায় । এবার পুরুষালি গলার একজন বলেন : কিশোর ডালমিয়া বলছি ; আপনার কথা বোঁদর কাছে শুনেছি । কোশিককে আপনি খুঁজছেন কেন বলুন তো ?

স্বজাতা একটু ইতস্তত করে বলে, ধরুন তার কাছে আমি কিছু টাকা পাই !

—বিশ্বাস করে না । পরের টাকা মেয়ে দেবার মত লোক নয় আমার বন্ধু ।

—আপনি কি ওর সঙ্গে একই বছরে পাশ করেন ?

—হ্যাঁ ।

—সুকমল দত্ত আর জীবন বসুও আপনাদের ব্যাচের ?

—নাম দুটি আজ প্রথম শুনলাম !

স্বজাতা আবার ঘাবড়ে যায় । এ আবার কি কথা ? কিশোর ডালমিয়া বলছে সে কোশিকের ক্লাস ফ্রেণ্ড ; কিন্তু কোশিক ষাটের সঙ্গে কনভোকেশনে গ্রুপ ফটো তুলেছিল তাদের ও চেনে না !

—আচ্ছা, কোশিকের চোখে কি চশমা আছে ?

—ছয় মাস আগেও ছিল না । এখন আছে কি না জানি না !

—গৌফ ?

—কি ব্যাপার বলুন তো ? কোশিক কি আজকাল গৌফ রাখছে ? তা রাখে রাখুক, এত খবর আপনি জানতেই বা চাইছেন কেন ? কোশিক যদি টাকা ধার নিয়ে থাকে তবে গৌফ থাক না থাক—

বাধা দিয়ে স্ফাতা বলে, আপনি কতদিন এখানে থাকছেন ?

—আজই দশটার গাড়িতে চলে যাব।

—আচ্ছা আমি এখনই যাচ্ছি। সাক্ষাতে কথা হবে !

স্ফাতা যেমন ছিল নেমে আসে। গাড়ি বার করতে বলে। বিশ্বনাথ তৈরীই ছিল। এগিয়ে এসে বলে, কে ড্রাইভ করবে ? আপনি না আমি ?

—আমিই চালাব। তুমি এই পাশে বস।

বিশ্বনাথকে পাশে বসিয়ে স্ফাতা এল-মার্ক গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে যায়। এ সুযোগ সে ছাড়তে পারে না। যেমন করেই হ'ক, আজ বিত্ত-কৌশিক রহস্যের যবনিকাপাত করতে হবে। বাসুনাহেবের কথাগুলো শুনে সে আবার বিচলিত হয়ে পড়েছিল—কী যেন ইঙ্গিত ছিল তাঁর সতর্ক গোপনের পিছনে। গাড়িটাকে রাসচৌধুরীর বাড়ির সামনে রেখে স্ফাতা এগিয়ে যায়। কলিং বেল বাজাতে হল না, তার আগেই দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন মিসেস্ রায় চৌধুরী : আসুন আসুন।

স্ফাতাকে বাইরের ঘরে বসিয়ে ভদ্রমহিলা কিশোর ডালমিয়াকে ডেকে আনেন।

বছর ছাব্বিশ-সাতাশ বয়সের এক ভদ্রলোক এগিয়ে এসে নমস্কার করেন, বলেন, কী ব্যাপার বলুন তো ?

স্ফাতা কোন সৌজন্যের ধার দিয়েও গেল না। সরাসরি প্রশ্ন করে, কৌশিক যিত্র এখন কোথায় আছে জানেন ?

—না, অনেকদিন তার কোন খবর পাইনি।

—আপনার সঙ্গেই পাশ করেছিল ?

—হ্যাঁ, ও ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিল আমাদের বছর। অনেক দিন বেকার ছিল। আমারই চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত—

—বলুন, কি বলছিলেন ?

—না, সত্য গোপন করে কি হবে ? সে কিছু দিন কলকাতার ট্যাক্সি চালাত !

—ট্যাক্সি চালাত ? একজন গ্রাজুয়েট এঞ্জিনিয়ার ?

—হ্যাঁ তাই। আমি বড়লোকের ছেলে, বাবার বসনেদ আছে। তাই করে যাচ্ছি। অথচ আমার অনেক বন্ধু আজও বেকার। অনেকের অসহ্য অত্যন্ত শোচনীয়। এক বন্ধু সুইসাইড করেছে, একজন বিপথে গিয়ে ফেল

খাটছে। কৌশিক যে ট্যান্ডি চালাবে এতে আর আশ্চর্য কি? দেশের বা
হাল হচ্ছে, এতে পরের বছর এঞ্জিনিয়াররা ট্যান্ডি ছেড়ে রিক্শা চালাবে!

সুজাতা স্তম্ভিত হয়ে যায়।

—কৌশিক সম্বন্ধে আপনার এত কৌতূহল কেন বলুন তো?

কিন্তু সে কথার জবাব না দিয়ে সুজাতা এক নিঃশ্বাসে বলে যায়, আপনার
বন্ধুর গৌফ ছিল না? চশমা ছিল না? কপালে একটা কাটা দাগ ছিল না?

—না ছিল না, কিন্তু এসব কথা কেন উঠছে?

মিসেস্ রায়চৌধুরী বলেন, কৌশিকের বিয়ের প্রস্তাব এখন উঠেছে তখন
সে কোথায় কাজ করছে তা কি আপনি জানেন না?

এবার সুজাতা মুখ তুলে তাকায়। মিসেস্ রায়চৌধুরীকে বলে, না
কৌশিকের বিয়ের কোন প্রস্তাব শুঠে নি। সে আমাদের এখানেই কাজ করে,
এই আগরওয়াল ইণ্ডাস্ট্রিতেই—

—সে কি! তবে তো তাকে আপনি দেখেছেন?

—হ্যাঁ দেখেছি বই কি! দাঁড়ান তাকে ডেকে আনি।

হঠাৎ ঝড়ের বেগে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় সুজাতা।

কিশোর মিসেস্ রায়চৌধুরীকে বলে, বৌদি ঠর কি মাথায় গুণ্ডগোল
আছে?

—আগে তো তা মনে হয় নি; কিন্তু এখন মনে হচ্ছে—

কথাটা তাঁর শেষ হয় না। তার আগেই সুজাতা প্রবেশ করে। তার
দৃঢ় মুষ্টিতে ধরা আছে বিশ্বনাথ দাসের হাতখানা। পর্দা সরিয়ে ঘবে ঢুকে
সুজাতা অতি নাটকীয় ভঙ্গিতে পরিচয় করিয়ে দেয়—ইনি মিস্টার কিশোর
ডালমিয়া, কন্ট্রাক্টর, আর ইনি কৌশিক মিত্র, আমাদের আগরওয়াল
ইণ্ডাস্ট্রিসের—কি যেন কৌশিক? আমার আবার ঠিক ডেসিগ্‌নেশানটা মনে
থাকে না!

বিশ্বনাথ বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে থাকে।

কিশোর এগিয়ে এসে বলে, কৌশিক! তুই এখানে?

মিসেস্ রায়চৌধুরী বলেন, বহুন কৌশিকবাবু।

—কি রে? তুই যে স্টাচু হয়ে গেলি? এখানে চাকরি করছিস?
কতদিন? আগরওয়াল ইণ্ডাস্ট্রিসে ঢুকেছিস? বস, দাঁড়িয়ে কেন?

বিশ্ব দাস নর, কৌশিক মিত্রকে অতঃপর বসতে হয় গদি-খাটা মোকার।

না, সোফা তো নয়, বেন সী-স ! তার একপ্রান্তে কোশিক বসে মাত্র অপর
প্রান্তে বসে সূজাতা তড়াক করে দাঁড়িয়ে ওঠে ।

হঠাৎ ঝড়ের বেগে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় সূজাতা ।

—কী হ'ল ? উনি অমন করে কোথায় গেলেন ?

পর মুহূর্তেই বাইরে পার্ক করা গাড়িটা গর্জন করে ওঠে । - এক পাইপ
ধোঁয়া ছেড়ে এল-মার্ক ফিরাট গাড়িটা ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যায় সোফা রাস্তা
বেয়ে ।

॥ সতের ॥

ছি ছি ছি, কী লজ্জা ! কী অপরিমিত লজ্জা ! বুদ্ধিমতী বলে যে
অভিমানটা ছিল ওর, সেটার আর চিহ্ন মাত্র রইল না । একেবারে বীদর নাচ
নাচিয়েছে তাকে নিয়ে । ভাবতে বসে এখন মনে হচ্ছে, ই্যা ভুলই তো হয়েছে
তার । প্রচণ্ড ভুল, আকাশচুম্বী ভ্রান্তি । 'হিমালয়ান রাগার' এ ভুল
হয়েছে রমেনবাবুর রিপোর্ট থেকে । সদর থানার ও. সি. রমেন গুহ যে
কাগজপত্রগুলো নিয়ে এসেছিলেন তাতে বিস্তারিত সন্দেহ করার আর কোন
কারণ ছিল না । বিশ্বনাথ দাস আর কোশিক মিত্র যে দুজন ভিন্ন লোক,
তাদের মধ্যে যোগসূত্র শুধু তাদের আকৃতিগত সাদৃশ্য, এটুকু নিঃসন্দেহচিত্তে
মনে নিয়েছিল সূজাতা । কে যে কেমন করে রমেনবাবুকে এভাবে ধোঁকা
দিতে পারল তা অবশ্য এখনও আন্দাজ করতে পারেনি ; কিন্তু এখন বেশ
বোঝা যাচ্ছে রমেনবাবুর সমস্ত তথ্যই ভুল । কোশিক অবশ্য অদ্ভুত অভিনয়
করে গেছে ; কিন্তু তা সত্ত্বেও যুক্তি-নির্ভর চিন্তাধারায় সূজাতার উচিত ছিল
তার চালাকিটা ধরে ফেলা । ঘটনাচক্রে ভগবান তাকে সেটা বুঝবার সুযোগ
দিয়েছিলেন । সেই 'ক্রাইম এ্যাণ্ড পানিশ্‌মেন্ট' বইখানা !

বিশু দাস আর কোশিক মিত্র দুজন সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ, তাদের জন্মস্থান
ভিন্ন, কার্যক্ষেত্র ভিন্ন, তাদের শিক্ষার-দীক্ষার আশ্রয় ভিন্ন ফরাক । তারা
কেউ কাউকে চেনেনা । তবু দুজনের আকৃতিগত সাদৃশ্য নাকি বিশ্বাসকর ।
অরূপরতন, যে নাকি কোশিকের সঙ্গে একমাঠে ক্রিকেট খেলেছে, সে বিস্তারিত

ভুল করে কৌশিক বলে ভাবে। এ পর্যন্ত অসঙ্গতি কিছু নেই। যাহূবে যাহূবে এমন আকৃতিগত মিল বাস্তবে সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না, কিন্তু প্রকৃতির একটা অদ্ভুত খেয়াল বলে এটা মেনে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু!

ই্যা, এতবড় একটা প্রকাণ্ড ‘কিন্তু’ ওর নজরে পড়ল না কেন? যে গাড়ি কৌশিক মিত্র কোনদিন চড়েনি, এবং যে গাড়ি বি দাস চানায় তার ড্যাসবোর্ডের ড্রয়ারে কেমন করে আবিষ্কৃত হল এমন একখানি ইংরাজী বই যা বিত্ত দাসের কাছে থাকা অযৌক্তিক। এবং সবচেয়ে বড় কথা, যার প্রথম পাতায় নাম লেখা আছে কৌশিক মিত্রের?

রমেনবাবু বলেছিলেন, ড্রাইভিং লাইসেন্স একটা লোকের সনাক্তকরণের একেবারে শেষ কথা। ভুল বলেছিলেন। সেদিন বাস্তবসাহেব বলেছিলেন, না ড্রাইভিং লাইসেন্স নয়, ফিঙ্গার প্রিন্টই হচ্ছে একটা যাহূবের ব্যক্তিগত সনাক্তকরণের শেষ কথা। তিনিও ভুল বলেছিলেন। ‘এ ম্যান ইন্ নোন বাই দ্য বুকস্ হি কিপস্’। একটা যাহূষকে চিনতে পারবে যখন তার সঙ্কলিত বইগুলি উন্টে পাল্টে দেখে। অজানা অচেনা একটা যাহূবের বইয়ের আলমারি ঘেঁটে দেখে, তুমি বলতে পারবে সে বিজ্ঞানের ছাত্র না কলাবিদ্যার, সে ডাক্তার, এঞ্জিনিয়ার, না আইনজীবী। তুমি বলে দিতে পারবে গান-বাজনায় তার সখ আছে কিনা, কণ্টাক্ট-ব্রাজ খেলায় তার নেশা আছে কিনা, ক্রিকেট-সিনেমা শিল্প-যাত্রাবিজ্ঞা কোনদিকে তার ঝোঁক। বইগুলো ঘাঁটলেই অদেখা অচেনা যাহূষটাকে চিনে ফেলতে পারবে তুমি।

ফিঙ্গার-গাড়ির গোপে যেমন পকেট এডিসোন ইংরাজ বইটা সন্দেহাতীত প্রমাণ রাখতে চেয়েছিল সে গাড়ির ড্রাইভারের। আর মূর্খ সূজাতা সে কথা খেয়ালই করল না।

কিন্তু কেন? এ ভুল সে করল কেন? এই জলজ্যান্ত প্রমাণটা তার নজরে পড়ল না কী জন্যে? জীমূতবাহনকে চিনতে সে ভুল করেনি, আগরওয়ালকে চিনতেও তার দেরি হয়নি, তাহলে—?

ই্যা, মনের অগোচরে পাপ নেই। স্বীকার করতে বাধ্য হব সূজাতা এ তার অবচেতন মনের কামনায়। তার চেহের মনকে সে খুঁতে দেয়নি! বিছানায় শুয়ে সে রাজে সে না বলোছল,—কী কাত হত ভগবান যদি বিত্ত দাসকে কৌশিক মিত্র করে গড়ে তুলতেন? বিত্ত দাস নিঃসন্দেহে তার কুমারী মনে রেখাপাত করেছিল, কিন্তু লোভ ছাটালি সে হতে চায়নি; সে মনে মনে

চেয়েছিল বিত্ত দাস পঞ্চাশ টাকা মাইনের ড্রাইভার নয়—ভদ্র শিক্ষিত অভাবগ্রস্ত একজন এজিনিয়ার! সম্মানে সেটা চায় নি মনের গভীরে এ কামনা তার জেগেছিল,—আর তাই এতবড় প্রমাণটা সে নজরে আনেনি!

কিন্তু এ কী হল? কৌশিক তাঁকে ধোঁকা দিয়ে তার সব কিছু চুরি করে নিয়ে গেল যে! রায়চৌধুরীর বাড়ি থেকে সে সোজা চলে গিয়েছিল সেই পড়ে বাগান বাড়িটার। কাদেরআলির কাছ থেকে চাবি নিয়ে খুলেছিল সেই ভাঙ্গা ঘরটা। পাগলের মতো ছুটে গিয়ে আঁতি পাঁতি করে খুঁজেছিল চিহ্নিত কুলুজিটা। যা আশঙ্কা করেছে, তাই! খুঁলাই শুধু লেগেছিল তার শাড়িতে। মোটা ভারি খামটা ওখানে নেই!

আচ্ছন্নের মত অনেকক্ষণ বসে ছিল চুপ করে। তারপর কখন কি করে বাড়ি ফিরে এসেছে তা আর খেয়াল নেই। যখন আত্মস্থ হল তখন সে নিজেকে আবিষ্কার করে কাঁটাতারে ঘেরা কম্পাউণ্ডে তার দ্বিতল ঘরে। গাড়িটা তাহলে নিরাপদে ড্রাইভ করে নিয়ে আসতে পেরেছে! ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে দশটা বাজতে পনের মিনিট। মনে পড়ে যায় বাসুসাহেবের কথা। খেলা অবশ্য শেষ হয়ে গেছে, তার ট্রাম্প-কার্ডটা বেহাত হয়ে গেছে, তবু হারজিত নির্ধারিত হয়ে যাবার পরেও খেলার শেষ মিনিট পর্যন্ত তাকে ছুরি তিরি পাণিয়ে যেতে হবে। বাসুসাহেবকে ফোন করে জানাতে চাইল শেষ পরিস্থিতি। টেলিফোনটা তুলে নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাড়লোর নম্বরটা চাইল।

—হ্যালো, দিস্ ইস্ ডি. এম.'স বাড়লো।

—আমি সূজাতা বলছি।

—বলুন সূজাতাদি, আমি প্রণতি, মাকে ডেকে দেব?

—না। দাওকে। বল জরুরী দরকার।

—দাও? ওমা তিনি তো নেই। একটু আগে চলে গেলেন যে!

• —চলে গেলেন? কোথায়?

—দশটা কুড়ির গাড়িতে। কলকাতায়।

—ও আচ্ছা তবে থাক!

টেলিফোনটা নামিয়ে রাখে সূজাতা। স্তম্ভিত হয়ে যায় সে। বাসু-সাহেব ঐ দশটা কুড়ির গাড়িতে ক'লকাতা গেছেন? কেন? কই তিনি তো সূজাতাকে একথা ঘুণাকরও বলেন নি! তবে কি—? ঐ অশীতিপর বৃদ্ধ! কিন্তু এ ছাড়া আর কী কৈফিয়ৎ হতে পারে? বিত্ত ড্রাইভার

যেমন অতি-নির্বোধ মেজে বলেছিল, পরশ পাথর গচ্ছিত রাখবার সাহস তার নেই, এবং তৎক্ষণাৎ যেমন সাজেস্ট করেছিল, পড়ো ভাঙা বাড়িটার সেটা লুকিয়ে রাখতে, ঐ অশীতিপর বৃদ্ধও তেমনি অতি-নির্লোভ মেজে বলেছিলেন, এ সবকিছু তিনি কোন আলোচনাই করতে চান না, ওটা স্বজাতার 'টপ-সিক্রেট', এবং তৎক্ষণাৎ সেই একই নিঃশ্বাসে পরামর্শ দিয়ে ছিলেন যে স্বজাতা যেন কাউকে না জানিয়ে আজ দশটা হুড়ির গাড়িতে কাগজগুলো নিয়ে কলকাতা যায় !

—উঃ। কী শয়তান !

কিন্তু ঐ মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধের এ দুর্মতি হল কেন ? কে যেন বলেছিলেন, 'যখন পুণ্য-সঞ্চয় করবে, তখন মনে রেখ কালই তোমার মৃত্যু হতে পারে, এখনই যা পার পুণ্য অর্জন করে নাও ; আর যখন মর্থ সঞ্চয় করবে তখন মনে ক'র তুমি অজর, অমর !' মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ঐ অশীতিপর বৃদ্ধও কি আজ ভেবেছিলেন—তিনি অজর, অমর। টাকার নিকষে কি কোন সোনাই পাকা নয় ? অথচ উনিই না বলেছিলেন, তুমি 'স্টে-ব্রাইট ষ্টীল' ! হ্যাঁ, তাও যেমন বলেছিলেন, তেমনি একথাও বলেছিলেন জীবনের চল্লিশটা বছর তিনি ডুবে ছিলেন অপরাধ বিজ্ঞান নিয়ে। ক্রিমিনোলজিতেই তাঁর প্যাশান ! আজ এই ট্রেনে ঐ কাগজগুলো নিয়ে কলকাতা যাবার চেষ্টা করলে কি আকস্মিক মৃত্যু হত স্বজাতার ? চলন্ত ট্রেন থেকে হঠাৎ পড়ে যাওয়া, বা ঐ ধরনের কিছু ? তাই হত, বাসুমাহেব তো ন্পষ্টই বলেছিলেন, যে কোন মিনিটে তুমি খুন হয়ে যেতে পার !

সেই মুহূর্তে যদি সেই রাশভারি মানী বৃদ্ধটি এসে দাঁড়াতেন ওর দোর গোড়ায়, স্বজাতা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে প্রথমেই ঠাস্ করে একটা চড় বসিয়ে দিত তাঁর গালে।

অথচ কী আশ্চর্য ! এবার বিন্দুমাত্র সন্দেহ হয়নি স্বজাতার আগর-ওয়ালকে চিনতে তার ভুল হয়নি। মৃত্যুর আগেই যখন সে বুঝতে পেরেছিল বাপির মৃত্যু আসন্ন, তখনই সে পাঁচশ টাকার ইন্সিওরড পার্সেলটা পাঠিয়ে দিয়েছিল গড় ঠিকানার একজন যাত্রাবের উদ্দেশ্যে। জানত, পাঞ্জাব থেকে সে পার্সেল ফিরে আসতে অন্তত একমাস সময় লাগবে। মৃত্যুপথযাত্রী ডক্টর চ্যাটার্জীকে প্রাণ খুলে সেবা পর্যন্ত করতে পারছিল না, বেচারি। সর্বদা তাকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হচ্ছিল ঐ কাগজগুলোর উপর। বাপির মৃত্যুর

পর থেকে স্বজাতার উপর অতন্ত্র পাহারার আয়োজন করেছিল আগরওয়াল। ইন্দির সর্দার সর্বদা তাকে চোখে চোখে রাখে, কিন্তু সে আগরওয়ালকে বুঝির বুকে হারিয়ে দিয়েছিল। বাপির জীবিতাবস্থাতেই সে মনগড়া এক নাম ঠিকানায় ঐ ইন্সটিটিউট পাসপোর্ট পাঠিয়ে দিয়েছিল। নিশ্চিত জানত মাস খানেকের মধ্যে সেটা ফেরত আসবে প্রেরকের কাছে। জীমূতবাহনকে চিনতেও সে ভুল করেনি। দেশহিতৈষীটির সাম্প্রতিক রূপ সে আন্দাজে বুঝে নিয়েছিল। বিত্তর ব্যাপারে তার ভুল হয়েছে; কিন্তু নিরঙ্কুশ ভুল নয়। মাঝে মাঝেই তার মনে সন্দেহ জেগেছে, খোঁজ খবরও নিয়েছে সেই মত।

কিন্তু শুভকেশ বলিরেপাক্তিত বৃদ্ধ বাহুসাহেবকে সে সর্বাঙ্গতঃকরণে বিশ্বাস করে ছিল। তাহলে মানুষ চিনতে স্বজাতারও ভুল হয়?

হঠাৎ ধীরে ধীরে করাঘাতের শব্দ হতে শুন্ল রুদ্ধ দরজায়। বাইরে থেকে কেউ টোকা দিচ্ছে। স্বজাতা উঠে বসে। গায়ের আঁচলটা ঠিক করে নেয়। তারপর এগিয়ে এসে দ্বার খুলে দেয়।

খোলা দরজার ওপারে দাঁড়িয়ে আছে না বিত্ত দাস নয়। নির্লজ্জ বেহায়া সেই মানুষটা—কৌশিক মিত্র।

—কি চাই? রুদ্ধস্বরে প্রশ্ন করে স্বজাতা।

—অনেক কথা আছে। ঘরের ভিতর চল—

—বেরিয়ে যাও বলছি!

বেহারার মত লোকটা পাশ কাটিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ে। বলে, তোমার রাগ করবার যথেষ্ট কারণ আছে মানি, কিন্তু আমার বক্তব্যটাও শোন—

তুমি আমাকে ‘তুমি’ বলছ কোন অধিকারে?

—তুমিও তো আমাকে ‘তুমি’ বলছ স্বজাতা!

—তুমি আমার ড্রাইভার, মাইনে করা চাকর!

—ছিলাম। এখন আর নই!

—তুমি যাবে কি না?

—আমার সব কথা না শুনলে যাব না।

প্রচণ্ড রাগে হঠাৎ ওর গালে ঠাস্ করে একটা চড় ঘেরে বসে স্বজাতা। হাতটা টন্ টন্ করে ওঠে ওর। পাঁচটা আঙ্গুলের দাগ বসে যায় কৌশিকের

গালে। উদ্ভেজনায়, রাগে, হুঃখে স্ফূর্তা হাঁপাতে থাকে। কিন্তু আশ্চর্য, একচুলও বিচলিত হয় না লোকটা। এর পরেও বলে, তুমি কাঁপছ স্ফূর্তা, থর থর করে কাঁপছ! আমার কি মনে হচ্ছে জান? নাগচম্পা ফুল ফুটেছে! চোখের উপর দেখতে পাচ্ছি দলগুলো খুলে যাচ্ছে। পাগড়িগুলো থর থর করে কাঁপছে!

আচ্ছা, ও কি পাগল? কিন্তু স্ফূর্তার রাগ তখনও একভিলও পড়েনি, বললে—বিশ্বাসঘাতক! ম্পাই! আই হেট য়ু! বেরিয়ে যাও বলছি!

মূহু হেসে কৌশিক বলে, বাসু দাছ বলেছিলেন, নাগচম্পার সৌরভে বিষ থাকে! তোমার নিঃশ্বাসেও তাই পাচ্ছি আমি।

কৌশিকের ল্যাকামি দেখে একেবারে জলে উঠল স্ফূর্তা। বললে, চাকর দিয়ে গলাধাক্কা না দিলে তুমি যাবেনা, না? বনোয়ারীলাল।

এত চীৎকার করে স্ফূর্তা ডেকেছিল যে কৌশিক আর অপেক্ষা করে না; নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। চোকাঠের ওপারে গিয়ে বারান্দার এক নজর দেখে নেয়, তারপর ঘুর দাঁড়িয়ে বলে, তোমাকে মিথ্যা পরিচয় দিয়েছিলাম, কিন্তু তোমার কাছে আর কোন অপরাধ আমি করিনি। বিশ্বাসঘাতকতা আমি করিনি। এটা রাখ! নকুল কিন্তু জানে পরশপাথরটা পোস্টাশিস থেকে তুমি ফেরত পেয়েছ!

চাদরের তলা থেকে বন্ধ একটা গালা মোহর করা খাম বার করে স্ফূর্তার হাতে দেয়।

ঠিক তখনই বনোয়ারীলাল এসে দাঁড়ায়।

কৌশিক ধীর পদে বেরিয়ে যায়।

স্ফূর্তা বনোয়ারীলালকে বলে, ম্যানেজারবাবুকে সেলাম দাও।

বনোয়ারীলাল নেমে যেতেই বন্ধ খামটা সে লুকিয়ে ফেলে বিছানার তলায়। অল্প পরে নকুল হই এসে দাঁড়ায়।

স্ফূর্তা বলে, বিশ্ব দাস আজ থেকে আমার গাড়ি আর চালাবে না। অন্য কোন গাড়ির ভিউটিতে ওকে বদলি করে দিন।

—বদলি করতে হবে না। বিশ্বর চাকরি গেছে।

—চাকরি গেছে! কেন? কার হুকুমে?

—কাল রাতে মালিক যখন কোন করেছিলেন, তখনই বলেছেন।

আজই বরখাস্তের চিঠি ওকে দেওয়া হবে। একমাসের আগাম মাইনেও পাবে সে।

—কেন? ওর চাকরি গেল কেন?

—কেন, তা তো জানি না। এই রকমই হকুম হয়েছে।

—ও আচ্ছা, আপনি যেতে পারেন।

আবার যে সব গুলিয়ে যাচ্ছে সূজাতার। এতো তার হিসাবের মধ্যে ছিল না! বিষ্ণু দাস আগরওয়াল নিযুক্ত স্পাই, কিন্তু সে যে সূজাতার কাছে ধরা পড়ে গেছে, কাল রাত্রে কলকাতায় বসে আগরওয়াল তো তা জানত না। তাহলে এমন একটা নির্দেশ সে পাঠালো কেন? দরজাটা বন্ধ করে বিছানার তলা থেকে খামটা বার করে দেখে। আশ্চর্য! পোস্টাল-শীল তো অটুট আছে। কৌশিক তো সেটা হাতে পেয়েও খুলে পড়েনি, কপি করে নেয়নি। তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে? তবে কি কৌশিক আগরওয়াল নিযুক্ত স্পাই নয়, অন্য কারও লোক? আগরওয়াল কি সেকথা জানতে পেয়েই তাকে তাড়াচ্ছে? তাহলে কৌশিক কার চর? কেন সে এসেছিল? রিসার্চ-পেপারগুলো চুরি করতেই যদি সে এসে থাকে তাহলে পরশপাথর হাতে পেয়েও স্বজ্ঞানে ক্যাপার মতো সেটা অবজ্ঞাভরে ওকে ফেরত দিয়ে গেল কেন? তাছাড়া বিশ্বনাথ দাসের জাল ড্রাইভিং লাইসেন্সই বা সে পেল কোথা থেকে? রমেনবাবুও এমন সব ভুল খবর পেলেন কোন সূত্রে? এতক্ষণে রাগটা অনেক পড়ে গেছে। ডান হাতটা চোখের সামনে তুলে ধরে। লাল হয়ে গেছে হাতের পাঞ্জাটা! চড়টা আচম্কা বড় জোরে মেরে বসেছিল! হঠাৎ ওর মনে পড়ে গেল একটা কথা! এত দুঃখেও হাসি পেল তার। কদিন আগে সে না বলেছিল, ভগবান, বিষ্ণু দাসকে তুমি কৌশিক মিত্র করে গড়লেনা কেন?

ভগবান তার প্রার্থনা শুনেছেন।

বনোয়ারিলাল এসে বলে, আজ তাহলে তো আপনার কলকাতা যাওয়া হচ্ছে না?

—না। ইয়ারে বিষ্ণুবাবু কোথায় গেল?

—ওর ঘরে আছে। মালপত্র বেঁধে নিচ্ছে। ওর চাকরি তো খতম হয়ে গেল। ওকে ডেকে দেব?

—না থাক, আমিই যাচ্ছি।

বন্ধ খামটা রাউজের ভিতর ভরে নিয়ে সূজাতা পারে পারে নেমে যায়।

মেজানাইন ঘরের দরজাটা হাট করে খোলা। ওকে আসতে দেখে কৌশিক অবাক হল না, হাসল, বললে—এও জানতাম আমি সূজাতা! বাহুসাহেব বলেছিলেন, সংক্ষিপ্ত জীবন ওর, কিন্তু যে রাত্রে নাগচম্পা ফোটে সে রাত্রে সেই হচ্ছে বাগানের রাণী! ওর ইংরোজ নাম নাইট-কুইন! তার কণিক সৌরভ সে চেপে রাখতে পারে না! ‘পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি আপন গন্ধে মম, কল্লুরীমৃগ সম!’

সূজাতা জবাব দেয় না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

—বস সূজাতা! খাটিয়ার উপর সতরঞ্চিটা বিছিয়ে দেয়।

তবু বসে না সূজাতা, দাঁড়িয়েই থাকে। মুখ তোলেন না, তবু বলে, তখন কী বলতে চাইছিলে?

—তখন যা বলতে চাইছিলাম, এখন ভেবে দেখছি, সে কথা বলার প্রয়োজন নেই। আমি তো চলেই যাচ্ছি! সংক্ষিপ্ত সময় আমার।

—কিন্তু আমি এখন কি করব?

—সে কথা কি আমার ভাববার?

এতক্ষণে মুখ তুলে তাকায় সূজাতা। বলে, তোমার নয়? তবে কার?

—কিন্তু তুমি তো আমাকে বিশ্বাস করতে পারবে না?

ঠোট দুটি কৈপে উঠল সূজাতার, দৃষ্টি হল নত, বললে, আমাকে ক্ষমা কর কৌশিক! কিন্তু এভাবে আমাকে একা ফেলে রেখে যেও না!

—এত কাণ্ডের পরও কি তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারবে?

—তোমাকে ছাড়া আর কাকে বিশ্বাস করব এ সময়ে! আমার বাপি ছিলেন এঞ্জিনিয়ার, তুমিও তাই। আর কিছু না হ'ক তোমার প্রফেশনাল এটিকেটের উপর—

—ও! প্রফেশনাল এটিকেট! নিজেই খাটিয়ার বসে পড়ে এবার। বলে, বেশ, এক চাকরি গেছে, দোশ্‌রা চাকরি নিচ্ছি! তোমাকে সাহায্য করব। আমার প্রফেশনাল এটিকেটের দোহাই পেড়েছ যখন। বল, কি জিজ্ঞাস্তা আছে তোমার?

—এখানে চাকরি নিয়ে ছদ্মবেশে এভাবে কেন এসেছিলে?

মান হেসে কৌশিক বলে, অন্তত তোমার পরশ পাথর চুরি করতে নয়।

—সে তো জানিই। যেহেতু হাতে পেয়েও সেটা কেঁরত দিয়েছ, তবে কেন এসেছিলে?

—আমাকে এখানে পাঠিয়েছিল এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ ! স্পেশাল কাজে ।
ময়ূরকেতন আগরওয়ালের ব্যবসারে অনেক গোপন রক্স আছে । তার ছিঃ
অন্বেষণ করতে । তাই আমার কাছে এমন একটি ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে
বিশ্বনাথ দাস যার লাইসেন্স । সেটা জাল হলেও জাল নয় !

—এখানকার ও সি. রমেন শুহ তোমার পরিচয় জানতেন ?

—জানতেন ; তিনি আমার কাজটার কথাও জানতেন । পাছে তুমি
আমার পরিচয় জানবার জন্ত ব্যগ্র হয়ে ওঠ, এবং সেই ক্ষেত্রে আমার কাছে
বাধা সৃষ্টি হয়, আগরওয়াল সন্দ্বিষ্ট হয়ে ওঠে, তাই আমাকে দুখানা ফটো
তোলাতে হয়েছিল । একখানা মার্সেডিস্ বেগন্স্ গাড়ির সামনে, একখানা
কনভোকেশন গাউন পরে । দুটোই আমার ফটো । তুলেছিলেন রমেনবাবু
তার নিজের ক্যামেরায় । হাবড়া থানার ও. সি-র চিঠিটাও জাল । সবই
করতে হয়েছে তোমার কৌতুহল নিবৃত্ত করতে । আর কি জানতে চাও বল ?

—যে কাজে তুমি এসেছিলে তা কি সাফল্য যুগিত হয়েছে ?

—ই্যা এবং না ! এবং তাতেই ঘটনাচক্রে তোমার সমস্তার সমাধানটাও
হয়েছে ।

—আমার কী সমস্যা এবং কী তার সমাধান ?

—আমার অসুস্থত্বের ফলে আমি জানতে পেরেছি, ময়ূরকেতন
আগরওয়াল ডক্টর চ্যাটার্জির ঐ আবিষ্কারের কতটা জানতে পেরেছে, এবং
কেন সে পেটেন্ট নিতে পারছে না, অর্থাৎ কতটা সে জানে না ।

সুজাতা কৌতুহলা হয়ে বলে, আমাকে বুঝিয়ে দাও তো ।

—আগরওয়াল তোমার বাবার আবিষ্কারের ব্যাপারটার বিন্দু-বিসর্গও
জানে না । তোমার বাবা তাকে কিছুই বলে যান নি । তাঁর মনঃগুপ্তি ছিল
অসাধারণ !

—তা কেমন করে হবে ? তাহলে আগরওয়াল কেমন করে সেগুলো হাতে
কলমে তৈরি করছে ?

—কে বলল তোমাকে ?

—দেখছি চোখের উপর । বাজারের তুলনার অনেক সস্তায়—

—তুল দেখছ সুজাতা । সস্তায় মোটেই বানাচ্ছে না । আমার হিসাব
অসুস্থায়ী প্রতিশত হলো-ব্লকে তার লোকসান যাচ্ছে সাড়ে বেরানিশ টাকা ।
যানে, তার দৈনিক লোকসানের পরিমাণ বারো-তেরশ' টাকা !

—হতেই পারে না। সে রীতিমত হিসাব করে আমার লভ্যাংশ আমাকে দিয়ে যাচ্ছে—

—কতটাকা এ পর্যন্ত সে এভাবে দিয়েছে সুজাতা ?

—তা তিন চার হাজার টাকা হবে !

কৌশিক হেসে বলে, সবটা শোন আগে। লাভ তার সত্যিই হচ্ছে না। খাতা কলমে সে লাভ দেখাচ্ছে, তোমাকে লভ্যাংশও দিচ্ছে। এই লোকসান সে দুভাবে পুষিয়ে নিচ্ছে। প্রথমতঃ তোমার এবং জীমূতবাহনের মনে সে বিশ্বাসউৎপাদন করিয়েছে যেতোমার বাবার আবিষ্কারের প্রাকটিক্যাল দিকটা তার জানা। এতে জীমূতবাহন থমকে গেছেন এবং তুমিও ওর গুণী কেটে বেরিয়ে যেতে ভরসা পাচ্ছ না। তুমি প্রায় নিমরাঙ্গি হয়ে পড়েছ কাগজগুলো তার হাতে তুলে দিয়ে চুক্তিবদ্ধ হতে। কাগজগুলো হাতে পেলে এসব লোকসান কোথায় তলিয়ে যাবে। এ ছাড়াও বিত্তীয় একটি পন্থায় সে আর এক ভাবে লাভ করছিল, সেটা বেআইনি লাভ। বস্তুত সেইটে আবিষ্কার করাই ছিল আমার কাজ। তোমার বাবার আবিষ্কারের গোপনীয়তার অজুহাতে আগরওয়াল তার ফ্যাকটারির চারিধারে উঁচু কাঁটা তারের বেড়া তুলেছে। বাইরের লোকের অবাধ প্রবেশ বন্ধ হয়ে গেছে এতে তার চোরাই ব্যবসার সুযোগ চতুর্গুণ বেড়ে গেছে—

—কিসের চোরাই ব্যবসা ?

—হলো—ব্লক বানাতে মাটি লাগে। তাই বাইরে থেকে এতদিন গঙ্গামাটি আনা হচ্ছিল। এখন ফ্যাকটারির ভিতরেই পুকুর কাটা হচ্ছে। সে মাটি লব্ধসমক্ষে গুঁড়ো করা হচ্ছে। চালুনিতে ছাঁকা হচ্ছে—বাইরের লোক দেখতে পাচ্ছে না। যারা দেখছে, তারাও ও নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না; তারা জানে ও মাটি ঐ নতুন হ'লো—ব্লক তৈরীর কাজে লাগছে। আসলে রাতের অন্ধকারে ঐ মিহি-মাটি চলে যায় আগরওয়াল হলোব্লক কারখানা থেকে আগরওয়াল স্টকিস্টের এলাকায়। মাঝরাত্রে ঐ দু অংশের মাঝখানে দরজাটা নিঃশব্দে খুলে যায়। ইন্দির সর্দারের অধীনে কয়েক জন বিশ্বস্ত কর্মী সিমেন্ট বোরার মুখ খোলে আর নতুন করে সেলাই করে। হোলসেল ডীলার স্বয়ংকেন্দ্র আগরওয়াল নামে লক্ষ বোরা সিমেন্ট বিক্রি করে থাকেন। সিন্ডার-ব্লকের দৈনিক বারো শ'টাকা লোকসান কোথায় তলিয়ে যায়, লাভের অঙ্ক কুলে ফেঁপে ওঠে !

—তাজ্জব কাণ্ড ।

—তাজ্জব ? না সূজাতা, যে পর্যন্ত তোমাকে বলেছি তার মধ্যে তাজ্জব কাণ্ড কিছু নেই। সারা দেশে এটাই তো স্বাভাবিক আজকের দিনে। ওষুধের ল্যাবরেটরীতে, ইনজেকসনের এ্যাম্পুলে, বেবিফুডের কারখানায় আজ নির্বিচারে ভেজাল চলছে। চালে কাঁকর, ঘিয়ে ডালডা, সরবের তেলে শেয়াল কাঁটার বীজ—এতে কেউ অবাক হয় না! আমল তাজ্জব করা খবর তো এইবার বলব।

—আরও বলবে !

—হ্যাঁ বলব বইকি ! তারপর অল্প হেসে বলে, সূজাতা, একটু আগে তুমি আমাকে একটা চড় মেরেছিলে ; কিন্তু তাতে আমার গালে কোন ব্যথা লাগেনি। কেন জান ? তার আগেই গালে আমি আর একটা বড় রকম চড় খেয়েছিলাম। গালে আমার সাড় ছিল না।

সূজাতা প্রশ্ন করতেও ভুলে যায়।

কৌশিক য়ান হাসে, হেসেই বলে, একদিন আমাকে বলেছিলে তুমি নাকি একটা পরশপাথর পেয়েছ, সেটা নিয়ে তুমি কি করবে জানতে চেয়েছিলে। উত্তরে নির্বোধ বিত্তু-ড্রাইভার বলেছিল সেটা ফেলে দিতে। পরশ পাথরের বোধহয় তাই নিয়তি। আজ যদি তুমি এঞ্জিনিয়ার কৌশিক মিত্রকে ঠিক ঐ প্রশ্নটি কর, তাহলে সেও ঐ একই কথা বলবে !

—কেন কৌশিক ? বিহ্বল ভাবে প্রশ্ন করে সূজাতা।

—সু:নছ বোধহয় ড্রাইভার হিসাবে আমার চাকরি গেছে। কেন, নিশ্চয় আন্দাজ করতে পেরেছে। আগরওয়াল জানতে পেরেছে আমার পরিচয়—জীমূতবাহনের রেকমেণ্ডেশনে আমি পুলিশের চর, ওর বাহের ভিতর ঢুকে পড়েছি। এটা তাজ্জব করা খবর নয়। তাজ্জব করা খবর এই যে ডিটেকটিভ হিসাবেও আমার চাকরিটা রইল না। তার কারণটা আন্দাজ করতে পার ?

—না, কেন ?

—কারণ ইতিমধ্যে শ্রীল শ্রীযুক্ত ময়ূরকেতন আগরওয়াল ডাক্তার আলিকে ডাঙ্গ করে আবার শ্রীল শ্রীযুক্ত জীমূতবাহন মহাপাত্রকে সমর্থন করতে শুরু করেছে। যে মুহূর্তে আমি হাতে নাতে ধরলাম যে আগরওয়াল সিমেন্টে গঙ্গা-মাটির ভেজাল মেশাচ্ছে, সেই দিনই আমার প্রতি আদেশ হল—সব

ব্যাপারটা চেপে যেতে। কেন? না আগরওয়ালের সঙ্গে ইতিমধ্যে জীমুতবাহনের নির্বাচনী আঁতাত হয়ে গেছে। সহজ সৰ্ত্তে। আগরওয়াল তাঃ আলিকে ত্যাগ করে জীমুতবাহনকে সমর্থন করবেন এবং জীমুতবাহন গঙ্গামাটির তদন্তটা চাপা দিয়ে দেবেন!

—কিন্তু গুপ্তচর হিসাবে তোমাকে তো জীমুতবাহন নিয়োগ করেন নি, তোমার চাকরি যাবে কেন?

—তুমি বুদ্ধিমতী, কিন্তু এবার বোধহয় তুমি ছেঁচেমানুষের মত কথা বললে সূজাতা!

—তাই বোধহয় বললাম। কি জানি, ঠিক বুঝতে পারছি না!

॥ আঠারো ॥

মনে আছে গল্পটার এই অংশে স্কুমার বাবুকে বাধা দিয়ে বলেছিলাম, আপনিই কি কোশিককে পাঠিয়ে ছিলেন আগরওয়ালের কাছে?

উনি হেসে বলেন, হ্যাঁ। পাপ কার্যটা আমারই! আর সেইজন্যই তখন বলছিলাম কোশিকের কৃতকর্মের অন্য পরোক্ষ ভাবে আমিও আংশিক ভাবে দায়ী।

—কি ব্যাপার বলুন তো, যদি আমার প্রশ্ন করা অবশ্য অসঙ্গত না হয়।

স্কুমারবাবু বলেন, আপনিও সরকারী চাকুরে, আপনার কাছেও যদি মনের দুঃখ চেপে রাখতে হয় তবে বাঁচি কেমন করে বলুন। আপনি ভুলভুল, জানেন নিশ্চয় আমাদের জীবনের ট্রাজেডি। আজ এদল সরকার গঠন করেছে, নির্দেশমত আমরা চলেছি এপথে। হঠাৎ কাল এরা হল ক্ষমতাসূত, গদিতে বসল ওরা। হুকুম দিল, এবার ও পথে চল। এতদিন যেসব দেশদ্রোহীর প্রতিটি পদক্ষেপ আমরা লক্ষ্য করছিলাম, গোপন ফাইলে বাবতীর কার্যকলাপ টুকে রাখছিলাম, হঠাৎ একদিন জানতে পারি তাঁরা দেশদ্রোহী নন দেশসেবক। তাঁদেরই একজন এসে বসেন গদিতে, বলেন—ফাইলগুলো নিয়ে এস তো! কী করব আমরা ভেবে পাই না। যাদের নির্দেশে সে ফাইলগুলো খোলা হয়েছিল তাঁরা আর কোন সাহায্য করতে পারেন না। তাঁরা তখন বিরোধবলে গিয়ে বসেছেন। বস্তুত হয়ত তখন তাঁদের নামেই ফাইল খুলছি আমরা, তাঁরা হয়ে গেছেন দেশদ্রোহী!

বললাম, আমি এ ব্যাপারটা জানি—কৌশিক কেমন ভাবে ওই কাজে জড়িয়ে পড়ল সেইটুকু শুধু বলুন।

সুকুমারবাবু যা বললেন, তার মর্মার্থ এই রকম।

মাস দেড়েক আগে বর্তমানে ক্ষমতাসীল রাজনৈতিক দলের মতে একজন পরম দেশহিতৈষী (নাম বলা চলে না, কারণ তিনি এখনও ক্ষমতাসীন) সুকুমারবাবুকে টেলিফোন করে জানতে চাইলেন, আগরওয়ালের বিষয়ে তাঁরা কতদূর কি করছেন। সুকুমারবাবু স্বতই ঘাবড়ে যান। তাঁর যতদূর জানা ছিল ঐ আগরওয়াল ব্যক্তিটি বরাবর এই অত্যন্ত উপরতলার হোমরা-চোমরা ব্যক্তিকে নির্বাচনী-মদৎ জুগিয়ে এসেছেন। বরাবর পার্টি ফাণ্ডে মোটা টাকা দিয়েছেন। এমন কি দুজনের দু'কিছু কিছু কিছু যৌথ কারবারও আছে। অর্থাৎ আগরওয়াল যে দীর্ঘদিন ধরে অসতৃপায়ে অর্থ উপার্জন করে যাচ্ছে একথা ঐ দেশহিতৈষীও জানেন, পুলিশ বিভাগও জানেন। কেউই এ বিষয়ে মাথা ঘামায়নি।

কিন্তু সেকথা তো বলা চলে না। সুকুমার গুপ্ত ফলে আমতা আমতা করেছিলেন। প্রত্যুত্তরে তাঁকে ধমক খেতে হয়েছিল : লোকটা একনম্বরের ব্র্যাকমার্কেটিয়ার। আপনারা সব জানেন, অথচ কিছুই করছেন না।

সুকুমার বাবু বলেছিলেন, আমার ধারণা ছিল—

—আমরা তাকে শেলটার দিচ্ছি ; এটো তো ? এইসব ভ্রান্ত ধারণা বলে আপনারা নিজেরাও ডুবছেন, আমাদেরও ডোবাচ্ছেন। লোকের কথায় যে আর কান পাতা যাচ্ছে না। আপনাদের কি ? বাঁধা চাকরি, বাঁধা মাইনে বাঁধা পেনসন ! আমাদের তো তা নয়। আমাদের জনগণের আস্থাভাজ হতে হয়। ইলেকটরেটের কাছে আমাদের কৈফিয়ৎ দিতে হয়। যাই হোক এতদিন যা করেছেন, করেছেন ; এবার দয়া করে একটু তৎপর হবেন কি ?

অল্পকণ কথাবার্তা বলেই বুঝতে পারেন, আগরওয়াল এবার আর ঝুঁবে লাপোর্ট করছে না। অথবা সে টালমাটাল করছে। অগত্যা তাঁকে কাজ করা প্রয়োজন। ঠিক কি জাতীয় চার্জ তা তিনি বুঝিয়ে বলেন নি। অর্থাৎ চার্জটা স্পেসিফিক নয়, লোকটা স্পেসিফিক। ইনকামট্যাক্সই হক, ব্র্যাক মার্কেটই হক বা ঐ জাতীয় একটা কিছু হলেই হল। মোট কথা আগরওয়ালকে ফাঁসাতে হবে।

তা ফাঁসাবেন। কর্তার ইচ্ছার কর্ম। ইদানিং কালে আগরওয়াল এ

হুঃসাহসী হয়ে উঠেছে যে, তাঁকে ফাঁসানো খুব কঠিন হবে না। প্রয়োজন ছিল ওর ব্যাহ মধ্যে একজন অত্যন্ত দক্ষ, সূচত্বর চরকে প্রেরণ করা। ওর কাঁটাতারে ঘেরা কারখানার ভিতর সুকুমারবাবুর একজন নিজস্ব লোককে সর্বপ্রথমে ঢুকিয়ে দিতে হবে। গণেশ পাণ্ডে নামে একজন প্রমিত নেতা ও এলাকার খুব প্রতিপত্তিশালী; কিন্তু সে হচ্ছে বিপক্ষ রাজনৈতিক দলের লোক। তার কাছ থেকে কোন খবর পাওয়া যাবে না। বড় কতাই অবস্থা বললেন উপযুক্ত একটি লোককে জোগান দিলে ব্যাহের ভিতর ঢুকিয়ে দেবার দায়িত্বটা তিনি নিতে পারেন। ঘটনাচক্রেই বলতে হয়, ঠিক ঐ সময়েই কোশিকের সঙ্গে সুকুমারবাবুর সাক্ষাত পরিচয় হয়ে গেল অদ্ভুতভাবে।

আসি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বলেন কি? তার আগে শুকে চিনতেন না?

—না। সেই প্রথম সাক্ষাত।

—আর সেই অজ্ঞাতকুলনীলকে এমন একটা কাজে লাগিয়ে দিলেন?

—হ্যাঁ দিলাম! গল্পটা শুুন তাহলে:

একটা অত্যন্ত গোপন এবং জরুরী তদন্ত সেরে উত্তরবঙ্গ থেকে গুপ্ত সাহেব ট্রেনে করে কলকাতা এসে পৌঁছালেন। যে ট্রেনে তাঁর ফেরার কথা ছিল তার আগের ট্রেনে ফিরেছেন। স্টেশানে সরকারি গাড়ি ছিল না; টেলিফোন করে সরকারি গাড়ি আনাতে গেলে দেরী হয়ে যাবে। উনি একটা ট্যাক্সি নিলেন। বাক্স বিছানা উঠল পিছনের কেরিয়ারে। ওর হাতব্যাগটা, যাতে মূল্যবান দলিলপত্র ইত্যাদি রয়েছে সেটা রাখলেন পিছনের সীটের উপরের খোপে। আদালি রামদীন বসল ড্রাইভারের পাশে। অল্পবয়সী বাঙালী ড্রাইভার, প্রশ্ন করল—কোথায় যাবেন স্যার?

খড়া চূড়া পরা ছিল না গুপ্তসাহেবের। গোপন তদন্তে গিয়েছিলেন। গুপ্তসাহেব বলেন, রাইটার্স বিল্ডিংস।

গাড়ি কোন রাস্তা দিয়ে এল তা ঠিক মনে করতে পারেন না গুপ্তসাহেব। তিনি তন্ময় হয়ে চিন্তা করেছিলেন ঐ কেসটার বিষয়ে। স্বর্ণ-আইন ঘটিত কেস। চাকর্য্যকর খবর সংগ্রহ করে এনেছেন তিনি।

অফিসে পৌঁছে আদালীকে বললেন, মালপত্র তাঁর ঘরে নিয়ে যেতে; নিজে সোজা চলে গেলেন আই. জি-র ঘরে! প্রাথমিক সংবাদটা তাঁকে যৌথিক না জানিয়ে তাঁর স্বত্তি হচ্ছিল না। আই. জি-র ঘরের সামনে গিয়ে শোনেন,

সেখানে একটা কনকারেজ চলছে। প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে তিনি আই জি-র সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেলেন। কথাবার্তা বলে আরও আধঘণ্টা পরে নিজের ঘরে ফিরে এসে দেখেন মালপত্র আগলে রামদীন পাহারা দিচ্ছে।

—আমার ব্যাগটা ?

—সেটাতো আপনার হাতেই ছিল স্যার !

—সেকি ? কই না তো ?

—হ্যাঁ স্যার, আমি বাক্সবিছানা নামালাম, আপনি ব্যাগটা হাতে নিয়ে বড় সাহেবের ঘরের দিকে চলে গেলেন।

গুপ্তসাহেব তখনই দৌড়ালেন আই. জি-র ঘরে। বুখা আশা। সেখানে নেই। গুপ্তসাহেবের স্পষ্ট মনেও আছে ব্যাগহাতে তিনি প্রথমবার আই. জি-র ঘরে যাননি। একমাত্র সম্ভাবনা, আর সম্ভাবনা কেন, সেটাই নিশ্চিত ঘটেছে—ব্যাগটা ট্যাক্সি থেকে আদৌ নামানোই হয় নি। সর্বনাশ! ব্যাগের মধ্যে মূল কাগজপত্র প্রমাণ ছাড়াও ছিল একটা স্যাম্পল। অর্থাৎ একটি নিংটে সোনার বার। অসুত হাজার পাঁচক টাকা দাম হবে। পাঁচ হাজার টাকাটা বড় কথা নয়, সে খেসারৎ না হয় দেওয়া যায় ; কিন্তু এইমাত্র আই. জি.-কে তদন্তের যে ফলাফল গোপনিক জানিয়ে এলেন তার কাগজপত্রও যে খোয়া গেল ঐ সঙ্গে ! কী কৈফিয়ৎ দেবেন ? রামদীনকে দায়ী করা চলে না, তার দোষ নেই। ব্যাগটা বরাবর ঠাঁর হাতেই ছিল। খেজুরিয়া-ঘাটে উনি কুলিকে বইতে দেন নি। রামদীন ব্যাগটা নিতে চেয়েছিল, তাকেও দেন নি। রামদীন ধারণাই করতে পারেনি যে ব্যাগটা না-নিয়েই উনি নেমে গেছেন। ট্যাক্সির নম্বরটা মনে নেই। ড্রাইভারের চেহারাটা আবছা মনে আছে। বাঙালি, অল্পবয়স, হাফ-সার্ট পরা। না কি বুশ-সার্ট ? চশমা ছিল কি ? নাঃ, আর দশটা ঐ বয়সী ছেলের সঙ্গে দাড় করিয়ে দিলে উনি তাকে সনাক্ত করতে পারবেন না। ভাল করে তার দিকে তাকিয়ে দেখেনই নি। লালবাজার কন্ট্রোলরুমে এখনই খবর দেওয়া দরকার ; কিন্তু তাহলে পুলিশ মহলে এ কেলেকারি জানাজানি হতে আর যুহূর্ত বিলম্ব হবে না। ঘরে ঘরে ফিস্ফিসানি শুরু হচ্ছে বাবে। অসতর্ক অকর্মণ্য বলে এতদিন যে সব অধঃস্তন অফিসারকে গালাগাল দিয়েছেন তারা এখনি ছুটে আসবে সহানুভূতি জানাতে। সোনার বারটা থাকায় ওটা ফিরে পাওয়ার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। বারটা গলিয়ে কেজলে ধরে কার বাবার সাধ্য ? কী করবেন, কার

সঙ্গে পরামর্শ করবেন কিছুই স্থির করতে পারেন না। মুখটি চুন করে রামদীন দাঁড়িয়ে আছে হুকুমের অপেক্ষায় ॥ নিজের ঘরের মধ্যেই অশান্ত পায়চারি করতে করতে ভাবছেন, কী করা উচিত! হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল। বিরক্ত হয়ে সেটা তুলে নিয়ে বলেন, গুপ্ত স্পিকিং!

ইংরাজীতে প্রশ্ন করল ও-প্রান্তবাসী, আপনি কি আজ সকাল দশটার সময় শেরালদহে একটা ট্যাক্সিতে উঠেছিলেন?

নিমজ্জমান ব্যক্তি যে অধীর আগ্রহে ভেসে যাওয়া কাঠের গুঁড়ির দিকে হাত বাড়ায়, সেই ভাবে বলে ওঠেন, ই্যা, কেন বলুন তো? কে আপনি?

—আপনি কি গাড়িতে কিছু ফেলে গেছেন?

—ই্যা ই্যা, একটা কালোরঙের এট্যাচি কেস; আমার নাম লেখা কার্ড আছে তাতে। কে আপনি?

—আমি সেই ট্যাক্সির ড্রাইভার! আমি অনেকদূর থেকে ফোন করছি তো। আপনার মাল ঠিক আছে।

—আপনার ট্যাক্সির নম্বর কত?

লোকটা হেসে বলে, অত বাস্তব হবেন না স্যার। সোনার বারটা গায়ের করার ইচ্ছে থাকলে যেচে ফোন করতাম না। শুধুন, আপনি রাইটার্স বিল্ডিংয়ের মেইন গেটে আধঘণ্টা পরে নেমে আসুন। আপনার চেহারা আমার মনে আছে। হাতে হাতে ব্যাগটা ফেরত দিতে চাই।

—আপনার নাম কি? ট্যাক্সির নম্বর কত?

আবার হেসে উঠল লোকটা। বললে, একটা পাবলিক টেলিফোন বুথ থেকে আপনাকে ফোন করছি। যদি বলি আমার নাম বিশ্বনাথ দাস এবং আমার ট্যাক্সির নম্বর W. B. T 420, আপনি আমাকে ধরতে পারবেন? এক্সচেঞ্জকে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখুন না? লালবাজার কন্ট্রোলরুমে ফোন করে দেখুন, আমাকে ধরতে পারেন কিনা!

বলেই লাইনটা কেটে দিল!

আধঘণ্টা সবুজ করার মত মনের অবস্থা ছিল না, তখনই নেমে এলেন নিচে। আধঘণ্টা পায়চারি করলেন রাস্তায়। তারপর একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়ালো, যে'ন গেটে। গাড়িটা পার্ক করে ব্যাগ হাতে ছেলোটো নেমে এল। গুঁর হাতে ব্যাগটা দিয়ে বললে, তালো লাগান নি কেন? নিল, মাল মিল!

তিনটাকা পচানকই নয়! পরমা দেবেন। টালিগঞ্জ থেকে মিটারে উঠেছে
তিনটাকা আশি, আর পনের নয়! একটা টেলিফোন কল বাবদ!

উনি ছেলেটির হাত ধরে বলেছিলেন, তোমার নাম বিশ্বনাথ দাস নয়,
কি নাম তোমার?

—কৌশিক মিত্র।

—তুমি আমার সঙ্গে উপরে এস।

—খামোকা খেজুরে আলাপ করে কি হবে আর? আমি মেহনতি মানুষ।
আপনার মত সরকারী চাকুরে নই। আয়ায় সময়ের দায় আছে।

—তা হ'ক। এস তুমি। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ছেলেটি শেষপর্যন্ত উঠে এল লিফ্টে করে। ওর ঘরে
তাকে বসিয়ে বলেন, এই ব্যাগের ভিতরে কি আছে তুমি জান?

হো হো করে হেসে ওঠে কৌশিক, বলে, ও হো, তাই জন্তে উপরে নিয়ে
এসেছেন? ধরুন, ধরুন, রাঘব বোয়ালটাকে ধরুন। আমি ওয়ার্ড-অফ-
অনার দিচ্ছি এ কথা প্রকাশ পাবে না।

—তুমি কাগজ পত্রগুলো সব দেখেছ?

—হ্যাঁ, দেখেছি।

—আর কেউ দেখেছে?

—না।

—তুমি এসব পড়ে বুঝতে পেরেছ?

—তা কিছু কিছু পেরেছি বৈকি।

—কতদূর লেখাপড়া শিখেছ তুমি?

কি মনে হয় আপনার?

—আমার কি মনে হয় সে প্রশ্ন অবাস্তব। কতদূর লেখাপড়া
শিখেছ বল।

—আমি বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির বি এন্সি এবং কলকাতার বি. ই।

—ব. এন্সি, বি. ই? তুমি পাশ করা এঞ্জিনিয়ার?

কৌশিক হেসে বলে, শুধু যেমন তেমন পাশ করা নয় আর, ফার্স্ট ক্লাস
পেরেছিলাম, দুবারই!

সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন গুপ্তসাহেব, বিশ্বাস করা কঠিন! বলেন, দেখি
তোমার ড্রাইভিং লাইসেন্স।

কৌশিক হেসে বললে, পুলিশে চাকরি করতে করতে যাকুবজানকে কেবল অবিশ্বাস করতেই শিখেছেন স্তার ? নিন, দেখুন।

ড্রাইডিং লাইসেন্সে কৌশিক মিত্রের নামের পাশে লিখা আছে বি. এন্স.সি ; বি. ই

—আপনি ট্যান্সি-ড্রাইভারী করছেন কেন ?

আবার হো হো করে হেসে ওঠে কৌশিক।

—হাসছেন কেন ?

—এতদিন ভেবেছিলাম, বুথাই দু'দুটো ডিগ্রি নিয়েছি। এমন দেখছি একবারে বুথাই হয়নি। ঐ ডিগ্রির কল্যাণে 'তুমি' থেকে 'আপনি' হয়ে গেলাম কিনা !

আপনি তুমির বিড়ম্বনা এড়িয়ে ইংরাজিতে প্রশ্ন করেন গুপ্তসাহেব, সুবিধামত চাকরি পেলে আপনি করতে রাজি আছেন ?

—সুবিধামত মানে ? পুলিশের চাকরি তো ? ও আমার ধাতে মইবে না। তারচেয়ে এই বেশ আছে।

গুপ্তসাহেব তৎক্ষণাৎ মনস্থির করে ফেললেন। এই ছেলেকেই তিনি পাঠাবেন আগরওয়ালের চক্রবাহের ভিতর। পারলে এই পাববে সপ্তরথীর আক্রমণ তুচ্ছ করে সে ব্যাহের ভিতর ঢুক পড়তে ! ও সিভিল এঞ্জিনিয়ার। সিমেন্ট আর লোহার কারবারে ময়ূরকেতন আগরওয়াল কিছু কালোবাজারী খেল দেখাচ্ছে কিনা ওর চেয়ে তা অন্য কোন ডিটেকটিভ ভাল বুঝবে না। ছেলেটি পড়াশুনার খুবই ভাল ছিল, অত্যন্ত বুদ্ধিমান, এবং সবচেয়ে বড় কথা ছেলেটি অত্যন্ত সৎ। আগরওয়ালের ব্যাপারে ওর সবচেয়ে ভয় ছিল, আগরওয়াল ঘুরে আস্তে ওঁকে কাবু করে ফেলবে। ময়ূরকেতন আগরওয়াল যে দীর্ঘদিন ধরে কালোবাজার করে চলেছে এটা তাঁর ভালভাবেই জানা ছিল, জীমূতবাহনের পৃষ্ঠপোষকতায় ইদানিং সে অত্যন্ত বেপরোয়া হয়ে পড়েছে এটাও জানতেন। সুতরাং তদন্তকারী অফিসার যে সহজেই সাক্ষ্যমণ্ডিত হবে এটাও জানতেন তিনি ; জানতেন না যেটা সেটা হচ্ছে শেষ মুহূর্তে আগরওয়াল তদন্তকারী অফিসারের মুখবন্ধ করতে কি পরিমাণ অর্থ ঘুস হিসাবে দিতে চাইবে। ওর মনে হল এই ছীরের টুকরো ছেলেটিকে কিনবার মূলধন বোধহয় আগরওয়ালের কুবেরের ভাগ্যেও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

গুপ্ত সাহেব সব কথা ওঁকে খুলে বলেন।

ছেলেটা এক কথায় রাজি হয়ে গেল ! বলেই নিজেকে সংশোধন করেন
আবার । বলেন, না এক কথায় রাজি হয়নি, একটি সর্ত আরোপ করেছিল সে
বলে আবার চুপ করে গেলেন ।

আমি প্রশ্ন করেছিলাম, কী সর্ত আরোপ করেছিল কৌশিক ?

একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুকুমার গুপ্ত বলেন, আমার সমস্ত কথা শুনে ছেলেটি
বললে, বেশ, এ চাকরি নিতে আমি রাজি আছি । কিন্তু একটি সর্তে !

—কী তোমার সর্ত বল ?

—আমি যখন তদন্ত শেষ করে প্রত্যক্ষ প্রমাণ সমেত আমার রিপোর্ট পেশ
করব তখন আপনি বা আপনার কোন উপরওয়ালার কাছে
ঘুষ গেয়ে সেটা চেপে যাবেন না তো ?

আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম, বললাম, এই কথা বললে কৌশিক ? ইন
সো মেনি ওয়ার্ডস ?

স্নান হেসে গুপ্ত সাহেব বলেন, হ্যাঁ ! যেন ঠাস করে একটা চড় মারল
আমাকে ! আর এখানেই আমার গল্পের ট্রাজেডি নরেনাবু, আমি ছেলেটির
হাত দুটি ধরে বলেছিলাম, আই একসেপ্ট !

তখনও ব্যাপারটা ঠিক জানতাম না আমি, তাই বলি, কিন্তু সেটা
আপনার ট্রাজেডি হতে যাবে কেন ?

গুপ্তসাহেব অনেকক্ষণ চুপ করে থাকেন । আমার দিকে না তাকিয়ে বলেন,
কৌশিক যেদিন তার রিপোর্ট দাখল করল, তারপর দিনই আমার উপর
হুকুম হল সমস্ত ব্যাপারটা চেপে ধেতে !

—আপনার উপরওয়ালার হুকুম ?

—না ! পুলিশ-বিভাগের অর্ডার নয় । রাজনৈতিক চাপ ! ক্ষমতাসীন
পার্টির উপর-মহলের যে কর্তাব্যক্তির নির্দেশে এ তদন্ত শুরু করেছিলাম, তাঁরই
হুকুম এল, আর তদন্তের প্রয়োজন নেই ।

কিন্তু খুনের মামলার সে জড়িয়ে পড়ল কি করে ? খুন সত্যিই ও করেছে ?

—সেইটাই আমি আজও জানি না ! হাজতে তার সঙ্গে দেখা করতে
গিয়েছিলাম একজন উদীয়মান উকিলকে নিয়ে । তাঁকে ওকালতনামা দিতে
রাজি হল না । বললে, ও ডিফেন্স দিতে চায় না !

—গিল্টি প্রীড করবে ?

—না তাও করবে না । তাকে বলেছিলাম, আমার বিশ্বাস তুমি ঘটনা

চক্রে জড়িয়ে পড়েছ, তুমি মিস্টার অরুণরতন মহাপাত্রকে ওকালতনামা দেও। আমি কথা দিচ্ছি, আপ্রাণ চেষ্টা করব যাতে তুমি বেকসুর হয়ে বেরিয়ে আসতে পার। জবাবে কি বলল জানেন? বললে, আপনার কথার মূল্য কি? চাকরি গ্রহণ করবার সময়েও তো আপনি আমাকে কথা দিয়েছিলেন, সে কথা রাখতে পেরেছেন?

শেষ দিকে গলাটা ধরে এল গুপ্তসাহেবের! বললেন, এতবড় অপমান আমি জীবনে হইনি। সাতআটটা মাসের আমার রোজগারের উপর নির্ভরশীল, না হলে আমি রিটাইন করতাম নরেনবাবু!

কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে পড়ি।

কথার মোড় ঘোরাতে তাড়াতাড়ি বলি, যাক ওকথা। গল্পটা শেষ করুন।

—গল্প তো আর নেই। কাহিনীর যে এখানেই শেষ।

আমি বলি, সে কি? কৌশিক কাকে খুন করল, কেন খুন করল, অথবা কেমন করে খুনের মামলায় জড়িয়ে পড়ল সে গল্প তো বলবেন?

—বলব, কিন্তু সেটাতো কাহিনী নয়। এ পর্যন্ত হল ঘটনা; যাকে বলে ফ্যাক্ট। এর পর তো শুধু এভিডেন্স! ফ্যাক্ট ধরে যদি চলতে চান তাহলে একটা মস্ত বড় মিসিং লিংক বাদ দিয়ে একেবারে অকুস্থলে হাজির হতে হবে। খুন হয়েছে খবর পেয়ে সদর থানার নড় দাঙ্গোগা রমেন গুহ যখন তদন্ত করতে এল।

—কোথায় এল, কখন এল, খুনই বা হল কে?

—খবর নিয়ে এসেছিল কাদের আলি শেখ। আগরওয়ালের বাগানবাড়ির চৌকিদার। সাতই নভেম্বর রাত্রি দশটার সে একখানা সাইকেলে চেপে থানায় আসে এবং খবর দেয়—

—দাঁড়ান, দাঁড়ান, সাতই নভেম্বর মানে কবে হল? আগে আপনি তারিখ বলেন নি; যেদিন সকালে কৌশিকের চাকরি গেল—

—হ্যাঁ, সেইদিনই রাত্রে। রমেন গুহ জোপে করে তখনই হাজির হয়েছিল অকুস্থলে, অর্থাৎ সেই ভাঙা পড়ো বাগান বাড়িটায়। রমেন সেখানে পৌছায় রাত দশটা পঁচিশে। কাদের আলির মুখে আগরওয়াল খুন হয়েছে শুনে—

আগরওয়াল। সে তো ছিল কলকাতায়।

—হ্যাঁ তাই ছিল। তাহলে স্বজাতার স্টেটমেন্ট থেকে খানিকটা আগে বলে নিই। কৌশিকের পরামর্শমত সেদিনই সন্ধ্যায় স্বজাতা ওখান থেকে

পালাবার চেষ্টা করে। কথা ছিল সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টার মেলে আগরওয়াল আসবে। ওরা স্থির করে সেই ট্রেনেই পালাবে ওরা। কৌশিককে তার আগেই বিদায় করা হয়েছে। একটি ড্রাইভার সঙ্গে নিয়ে সূজাতা স্টেশনে বিকেল নাগাদ বেরিয়ে পড়ে। নকুলকে বলে যায় সে সময়মত স্টেশনে যাবে এবং সন্ধ্যা ছটা পনেরোর ট্রেন এ্যাটেণ্ড করবে, আগরওয়ালকে রিসিভ করতে। এদিকে কৌশিকের সঙ্গে তার কথা হয়েছিল যে, ট্রেন বখন স্টেশনে ঢুকবে তখন সূজাতা একেবারে ইঞ্জিনের কাছে দাঁড়িয়ে থাকবে। টিকিট কাটবে কৌশিক। গাড়ি স্টেশনে প্রবেশ করা মাত্র ওরা দুজনে তাতে চড়ে বসবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা হয়নি। ট্রেনটা স্টেশনে আসে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার। সূজাতা সওয়া ছয়টার সময় স্টেশনে পৌঁছায় ;—গিয়ে শোনে গাড়ি সেদিন সত্তর মিনিট লেট। দূর থেকে সে কৌশিককে দেখতে পেয়েছিল, ইচ্ছে করেই কথাবার্তা বলেনি, অনেকক্ষণ মেয়েদের ওয়েটিং রুমে বসেছিল চুপ করে। হঠাৎ দেখে আগরওয়াল দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে তাকে ডাকছে। সূজাতা খুব অবাক হয়ে যায়। আগরওয়াল জানায় সে শেষমুহুর্তে মত বদলে কলকাতা থেকে সরাসরি গাড়িতেই এসেছে। সূজাতা স্টেশনে এসেছে শুনে সে সোজা চলে এসেছে তাকে নিয়ে যেতে। নকুলও তার সঙ্গে ছিল। কথা বলতে বলতে ট্রেনটা এসে যায়। ওরা স্টেশান থেকে বেরিয়ে আসে। কৌশিক যে দূর থেকে এই নূতন পরিস্থিতি লক্ষ্য করেছে তা সূজাতা বুঝতে পারে ; কিন্তু বাধ্য হয়ে সে আগরওয়ালের সঙ্গে ফিরে যায়। তারপর কেন যে ওরা সবাই বাড়ি না গিয়ে বাগানবাড়িতে এল সে রহস্য এখনও ঠিক পরিষ্কার হয়নি।

আমি প্রশ্ন করি, সেই কাগজগুলো কোথায় ছিল ?

—সূজাতা একেবারে খালি হাতে স্টেশনে এসেছিল, যাতে ইন্দির সর্দার অথবা নকুল ছই সন্দেহ না করে ; কিন্তু তার ব্রাউসের ভিতর ছিল সেই বন্ধ খামটা!

—তারপর ?

—তারপর আবার এভিডেন্স। কাদের আলির মুখে আগরওয়াল খুন হয়েছে শুনে রমেন বাওয়ার পথে ডাক্তার অতুল সান্যালকেও উঠিয়ে নিয়ে যায়। ওরা গিয়ে দেখতে পায় আগরওয়াল ঘরের চৌকাঠের উপর খুন হয়ে পড়ে আছে। রক্তে ভেসে গেছে জায়গাটা। কৌশিক, নকুল আর সূজাতা তিনখানা

চেয়ারে বসে আছে বাইরের বারান্দায়। ডাঃ সান্তাল প্রথমেই আগরওয়ালের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পরীক্ষা করেন। পরমুহূর্তেই, বলেন শেষ হয়ে গেছে।

ডাক্তারের ঘোষণার অবস্থা প্রয়োজন ছিল না। রমেন তার আগেই বুঝতে পেরেছিল অনেকক্ষণ মৃত্যু হয়েছে আগরওয়ালের। লোকটা উবুড় হয়ে পড়ে আছে। তার বাঁ হাতটা ছড়ানো, ডান হাতের মৃঠোর একটা রিডলভার। পিঠের পিছন দিকে যেখানে গুলিটা বিঁধেছে সেখান থেকে রক্তের একটা ধারা নেমে এসে জমাট বেঁধেছে।

রমেন গুহ প্রশ্ন করে, ঘরের জিনিষপত্রে বা মৃতদেহে কেউ হাত দিয়েছিল?

কৌশিক বলে, বেঁচে আছে কিনা দেখবার জন্মে আমি একবার নাড়ি দেখেছিলাম। বেঁচে নেই বুঝতে পারার পর আমরা ঠুকে কার কেউ স্পর্শ করিনি। ঘরের কোন জিনিষপত্রেও কেউ হাত দেয়নি।

—ঠুকে মৃত অবস্থায় কে প্রথম দেখেছিলেন?

উত্তর দিতে একটু বিলম্ব হয়। নকুলই শেষ পর্যন্ত বলে, সে সময়ে আমরা তিনজনই উপস্থিত ছিলাম।

—অর্থাৎ আগরওয়ালকে গুলিবিদ্ধ হতে আপনারা তিনজনেই দেখেছেন কেউ জবাব দেয় না। মৌন সম্মতিই তাদের স্বীকৃতি।

রমেন একটু ইতস্তত করে। কে গুলি করেছিল এই প্রশ্নটা সরাসরি পেশ করা ঠিক হবে কিনা বুঝে উঠতে পারে না। তারপর স্থির করে ঐ চরম প্রশ্নটা একেবারে প্রথমাবস্থায় পেশ করা বোধহয় ঠিক হবে না। কথাবার্তা শুনের আর একটু সহজ করে নেওয়া দরকার। ওর আশঙ্কা হয়, তিন জনের স্টেটমেন্ট তিন রকম হবে। ওরা কোন স্বীকারোক্তি দেওয়ার আগে ওদের জানিয়ে দেওয়া দরকার যে প্রয়োজনবোধে ওদের এ কথা আদালতে সে পেশ করবে এভিডেন্স হিসাবে। এ সাবধানবাণী উচ্চারণ না করলে এ স্বীকারোক্তির কোন মূল্য থাকবেনা আদালতে। অথচ যে মুহূর্তে ও এই সাবধানবাণী উচ্চারণ করবে, অমনি ওরা সাবধান হয়ে যাবে। তাই এ পর্যায়ে সে আরও কিছুটা স্বাভাবিক কথোপকথন চালিয়ে যেতে চাইল। কৌশিককে বলে, আপনি কখন এখানে এসেছিলেন?

—যদি দেখিনি, আন্দাজ নটার সময়।

—কেমন করে আসেন?

—সাইকেলে চেপে ।

—কেন এসেছিলেন এত রাতে ?

—সুজাতার খোঁজে । আমি খবর পেয়েছিলাম, সুজাতাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখানে ধরে আনা হয়েছে ।

রমেন এবার সুজাতার দিকে ফিরে বলে, একথা সত্যি ? আপনাকে এখানে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধরে আনা হয়েছিল ?

পাথরের স্মৃতির মত বসেছিল সুজাতা । বললে—আমি কোন কথা বলব না । আমার সলিসিটোরের সঙ্গে কথা না বলে আমি একটা প্রশ্নেরও জবাব দেব না ।

রমেন চম্কে ওঠে । বুঝতে পারে, অবস্থা ক্রমশঃ জটিলতর হয়ে যাচ্ছে । ওরা দুজনেও যদি এমনি আবদার ধরে বসে তাহলে কিছুই জানা যাবে না । নকুল ছইয়ের দিকে ফিরে বলে, আপনি বলেছিলেন, মৃত্যুসময়ে আপনারা তিন জনেই উপস্থিত ছিলেন । কে ঠেকে গুলি করেছে ?

নকুল একটু নড়ে চড়ে বলে, আজ্ঞে গুলি ঠেকে কেউই করেনি । রিভলভারটা মালিকের হাতেই ছিল ।

—অর্থাৎ আপনি বলতে চান আগরওয়াল আত্মহত্যা করেছে ?

—আজ্ঞে না, তা ঠিক বলতে চাই না । আচ্ছা, আমাকে সবটা শুধিয়ে বলতে দিন । আমি এখানে সন্ধ্যা নাগাদ এসেছিলাম মালিকের সঙ্গে একই গাড়িতে । উনিই চালাচ্ছিলেন । গাড়িতে সুজাতা দেবীও ছিলেন । তারপর সুজাতা দেবী আর মালিক এই ঘরে চলে এসে কীসব কথাবার্তা বলতে থাকেন । খানিক পরে মালিক আমাকে ডেকে বললেন গাড়ি থেকে ছইস্কির বোতলটা নামিয়ে আনতে । গাড়ির ভিতর বেতের বুড়িতে একটা মদের বোতল ছিল ছজুর, মালিক সেটা কলকাতা থেকেই এনেছিলেন । কিন্তু সেটা আনতে গিয়ে দেখি অসাবধানে সেটা ভেঙে গেছে । মালিক আমাকে একটা একশ টাকার নোট দিয়ে বললেন লক্ষ্মীসাহার দোকান থেকে এক বোতল ছইস্কি কিনে আনতে । আমি সাইকেলে চেপে চলে গেলাম শহরের দিকে । খানিক দূর যেতেই, বুঝেছেন, সাইকেলটা গেল পাংচার হয়ে । ফলে অনেকটা রাস্তা আমাকে হেঁটেই যেতে হল সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে । তারপর মদের বোতলটা কিনে, সাইকেল মেরামত করিয়ে ফিরে আসতে আমার বেশ দেরী হয়ে গেল । ঠিক নটা বায়ে মিনিটে আমি এখানে ফিরে আসি—

বাধা দিবে রমেন বলে, রাত ঠিক নটা বারো কেমন করে জানলেন ?

—আজ্ঞে সাইকেলটা পাংচার হয়ে বাওয়ার আমার খুব দেবী হয়েছিল। আমার মালিক ছিলেন খুব রাগী মানুষ। তাই সাইকেল থেকে নেমেই আমি ঘড়ি দেখেছিলাম টার্চের আলোয়, বুঝে নিতে কতটা দেবী হয়েছে। সাইকেলটা গাবগাছের গায়ে লাগাতে গিয়ে দেখি আরও একখানা সাইকেল সে গাছের গায়ে লাগানো আছে। এখানে কাদের আলি ছাড়া আর কেউ থাকে না। কাদেরের সাইকেল নেই। তাই আর একখানি সাইকেল দেখে আমার কেমন সন্দেহ হল। সরাসরি মালিকের ঘরে না গিয়ে আমি আউটহাউসের দিকে গেলাম। বদরকে জিজ্ঞাসা করতে গিয়েছিলাম কে এসেছে। কিন্তু অতদূর পৌছানোর আগেই হঠাৎ ও ঘর থেকে স্ফাতা দেবী একবার চিংকার করে উঠলেন। আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ি। পিছন ফিরে ঘরের খোলা দরজার ভিতর দিয়ে দেখতে পেলাম, মালিকের সঙ্গে কার ঘেন ধস্তাধস্তি হচ্ছে। লোকটাকে ঠিক তখনই আমি চিনতে পারিনি, তখনও সাইকেলটা আমার হাতে ধরা ছিল। সেটা গাছের গায়ে ঠেকিয়ে রাখছি, হঠাৎ একটা গুলির আওয়াজ শুনলাম। ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখি মালিক দরজার উপর উবু হয়ে পড়ে আছেন। আর সেই লোকটা ঝুঁকে পড়ে দেখছে। সাইকেলটা ফেলে আমি তখনই এখানে ছুটে এলাম। এসে দেখি কো—, মানে ঐ বিত্ত ডাইভার দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে, তার জামা কাপড় ছিঁড়ে গেছে, চুলগুলো উন্মোখা। আমি তখনই বুঝতে পারলাম বিত্তর সঙ্গেই মালিকের ধস্তাধস্তি হচ্ছিল।

রমেন দারোগা তীক্ষ্ণ মর্মভেদী দৃষ্টিতে নকুলের দিকে তাকিয়ে বলে,—ওর নাম যে কৌশিক মিত্র তা আপনি জানেন না বলতে চান ?

তাড়াতাড়ি একটা ঢোক গিলে নকুল বলে, আজ্ঞে না, তা বলব কেন ? আমিও শুনেছি ওর নাম কৌশিক মিত্র !

—আপনি যখন এখানে এসে পৌছালেন তখন রিভলভারটা কার হাতে ছিল ?

—মালিকের মুঠায় ধরা ছিল, ঠিক এখন যেমন আছে।

নকুল যখন তার বক্তব্য বলে যাচ্ছে তখন স্ফাতা আর কৌশিক ঝড় নিখাসে শুনছিল তার কথা। তারা কোন কথা বলেনি।

রমেন স্ফাতার দিকে ফিরে বলে, আপনি তখন কোথায় ছিলেন ?

পাথরের মূর্তির মত ভাবলেশহীন মুখে স্জাতা বলে, আপনাকে আগেই বলেছি, যে আমার উকিলের সঙ্গে কথা না বলে আমি কোন স্বীকারোক্তি করব না।

কৌশিক হঠাৎ স্জাতার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলে, স্জাতা প্রীস্, তুমি যখন উপস্থিত ছিলে তখন যা দেখেছ তা বল।

স্জাতা জবাব দেয় না। মুখটা ঘুরিয়ে নেয়।

রমেন তখন কৌশিকের দিকে ফিরে বলে, বেশ, তাহলে আপনিই বলুন, নকুলবাবু যা বললেন, তা সব সত্যি ?

কৌশিক তৎক্ষণাৎ বলে, তা আমি কেমন করে জানব ? তিনি যদ কিনতে শহরে গিয়েছিলেন কিনা, তাঁর সাইকেল পাঞ্চার হয়েছিল কিনা—

—না, তা বলছি না আমি। আচ্ছা, আপনি, বরং বলুন আগরওয়াল কিভাবে গুলিবিদ্ধ হল।

—বেশ বলছি। আন্দাজ নয়টার সময় আমি এখানে আসি—

রমেন বাধা দিয়ে বলে, একটু দাঁড়ান। আমার বোধহয় এই সময়ে জানিয়ে দেওয়া কর্তব্য যে আপনি এখন যা বলছেন, প্রয়োজনবোধে আমরা তা আপনার বিরুদ্ধে আদালতে এভিডেন্স হিসাবে ব্যবহার করব। আপনি ইচ্ছা করলে স্জাতা দেবীর মত কোন কথা বলতে অস্বীকারও করতে পারেন।

কৌশিক এক মুহূর্তও চিন্তা না করে সঙ্গে সঙ্গে বলে, তার প্রয়োজন নেই মিষ্টার গুহ। সত্যিই যা ঘটেছে তাই আমি বলছি এবং বরাবরই তাই বলব। প্রয়োজনবোধে আমার এই স্বীকারোক্তি আপনি আমার বিরুদ্ধেও ব্যবহার করতে পারেন। ই্যা, যা বলছিলাম, আমি আন্দাজ নয়টার সময় এখানে আসি একটা সাইকেলে চেপে। সাইকেলটা রাখতে রাখতেই শুনতে পেলাম স্জাতার একটা আর্ত চিৎকার। দরজাটা খোলাই ছিল। আমি ছুটে এসে দেখি স্জাতা খাটের উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে, আর আগরওয়াল তার কাঁধ দুটো ধরে তাকে চিৎ করে দেবার চেষ্টা করছে।

একটু ইতস্তত করে আবার বলে, আমি জানতাম একটি অত্যন্ত মূল্যবান দলিল স্জাতার ব্রাউসের ভিতর লুকানো ছিল, বস্তুত এখনও আছে। আমি বুঝতে পারলাম, আগরওয়াল হয় সেটা হস্তগত করবার চেষ্টা করছে, অথবা স্জাতাকে, ওয়েল—, যাই হোক আমি ঘরে ঢুকতেই আগরওয়াল ওকে ছেড়ে আমার দিকে ফিরে দাঁড়াল। আমি তখন ঠিক দরজার উপর। আমি তার

উপর কাঁপিয়ে পড়বার আগেই আগরওয়াল টেবিলের উপর থেকে তুলে নিল একটা রিডলবার। তার ডানহাতে। আমরা দুজনে কতক্ষণ ক্ষতাবস্থি করেছি জানিনা, তবে সারাক্ষণই আমি ওর ডানহাতের কজিটা আমার বাঁ হাতে ধরে রেখেছিলাম। আগরওয়াল সমস্ত শক্তিতে অস্ত্রটা আমার দিকে ফেরাতে চাইছিল। আমরা দুজনে জড়াজড়ি অবস্থায় বারান্দার দিকে চলছিলাম। দরজার চৌকাঠে হৌচট খেয়ে আমরা দুজনেই একসঙ্গে পড়ে যাই। তখনও আমরা আলিঙ্গনবদ্ধ অবস্থায় ছিলাম। ঠিক পড়বার সঙ্গে সঙ্গে রিডলবারটা ফায়ার হয়ে যায়। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আগরওয়ালের আলিঙ্গন শিথিল হয়ে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে দেখি আগরওয়াল গুলিবিদ্ধ। ঠিক তখনই নকুলবাবু এসে পড়েন! নকুলবাবুই ঐ মুসলমান দারোয়ানটিকে তারপর থানার পাঠিয়ে দেন।

রমেন হঠাৎ সূজাতার দিকে ফিরে বলে, আপনি কি কিছুই বলবেন না?

—না!

ইতিমধ্যে রমেনের ব্যবস্থামত একজন ক্যামেরাম্যানও এসে গিয়েছিল। ক্যামবাল্‌বের ঝলকানি উঠল বার কয়েক! তারপর মৃতদেহ সরাবার ব্যবস্থা হল। ঘরটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তল্লাস করে এবং ঘরে তালি লাগিয়ে বাইরে এসে রমেন বলে, নকুলবাবু আপনি আমাকে না জানিয়ে শহরের বাইরে যাবেন না।

এরপর কোশিকের দিকে ফিরে বলে, আপনাকে আমার সঙ্গে থানায় যেতে হবে। আর সূজাতা দেবী, আপনি যখন আমার সঙ্গে কোনরকম সহযোগিতা করতে রাজী নন, তখন আপনাকেও আমার সঙ্গে থানায় যেতে হবে। আমি অত্যন্ত দুঃখিত, কিন্তু এও বলব, এ উৎপাত আপনি নিজেই ডেকে এনেছেন। ভাল কথা, আপনার উকিলের নামটা যদি বলেন, তাহলে আমি তাঁকে একটা খবর দিতে পারি।

—ধন্যবাদ। আমার সলিসিটর মিঃ পি. কে. বাহু, কিন্তু তিনি বর্তমানে কলকাতায়। ফলে, আপনি দয়া করে মিঃ এ. আর. মহাপাত্রকে একটা সংবাদ দেবেন।

কোশিক এই সময় বলে, রমেনবাবু, আপনি যদি অনুমতি করেন, আমি একটি কথা সূজাতা দেবীকে বলতে চাই।

—সর্বসমক্ষে ?

—নিশ্চয়ই ! গোপন পরামর্শ কিছু নয়—

—বেশ, বলুন ।

কৌশিক স্জাতার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলে, স্জাতা, একটু আগে, আই মীন, রমেনবাবুরা এসে পৌছাবার আগে, আমি তোমাকে নকুলবাবুর সামনেই বলেছিলাম—যা ঘটেছে আমরা তিনজনেই তা অকপটে স্বীকার করব । আমরা তিনজনেই তাতে রাজি হয়েছিলাম । এখন হঠাৎ তুমি বৈতে দাঁড়াচ্ছ কেন ?

স্জাতা জবাব দেয় না ।

—তুমি বুঝতে পারছ না, তুমি যে ভাবে সত্য গোপন করছ তাতে কেসটা আমার বিরুদ্ধে কি বিশিভাবে টার্ন নিচ্ছে ?

চকিতে স্জাতা উঠে দাঁড়ায়, বলে—তোমার বিরুদ্ধে ?

—নয় ? রমেনবাবু মনে করতে পারেন যে নকুলবাবু এবং আমি যা বলেছি, তা বোধহয় সত্যকথা নয়, মানে—

আবার বসে পড়ে স্জাতা । ঠোট দিয়ে দাঁতটা কামড়ে কি যেন ভাবেন, তারপর বলে, আমি সব কথা বলব—

রমেন তৎক্ষণাৎ বলে, কিন্তু মনে রাখবেন স্জাতা দেবী, আপনি যা বলছেন তা স্বেচ্ছায় বলছেন, এবং আপনার এই বক্তব্য প্রয়োজনবোধে আমরা আদালতে আপনার বিরুদ্ধেও এভিডেন্স হিসাবে দাখিল করতে পারি ।

—সে কথা তো আপনি ইতিপূর্বেই বলেছেন ।

—আপনাকে তখন বলিনি । এখন বিশেষ করে আপনাকেই বলছি ।

—বেশ । শুনুন, নকুলবাবু ও কৌশিকবাবু যা বললেন তা সব সত্য ।

—আপনি তখন এ ঘরের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ?

—ছিলাম ।

—আপনাকে কি ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখানে ধরে আনা হয়েছিল ?

—ঠিক ও কথাটা বলা উচিত হবে না । আসবার সময় প্রথমটা আমি স্বেচ্ছায় গাড়িতে উঠেছিলাম-। তবে ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে এখানে আটকে রাখা হয়েছিল একথা সত্য ।

—স্বেচ্ছায় আপনি এখানে এসেছেন বলছেন । কেন এসেছিলেন ?

—স্টেশানে মিঃ আগরওয়াল আর নকুলবাবুর সঙ্গে আমার যখন দেখা

হয় তখন আমার কাছে একটা মূল্যবান কাগজ ছিল। আমি ভেবেছিলাম আগরওয়াল সে কথা জানেনা। পাছে সে কোন সন্দেহ করে তাই তার সঙ্গে গাড়িতে বাড়ি ফিরে আসতে রাজি হয়েছিলাম। কিন্তু গাড়ি কারখানার দিকে না গিয়ে যখন এ দিকে আসতে চাইল, তখন আমি প্রতিবাদ করি। আমার প্রতিবাদ শোনা হয়নি।

—বেশ, কৌশিকবাবু আর মিঃ আগরওয়াল যখন ধস্তাধস্তি করছিলেন তখন আপনি কোথায় ছিলেন ?

—এইখানে। খাটের এ পাশে।

—কৌশিকবাবু রিভলভারটা আগরওয়ালের হাত থেকে ছিনিয়ে নেন নি ?

—না !

—হুজনে ধস্তাধস্তি করতে করতে এই চৌকাঠে বাধা পেয়ে একসঙ্গে পড়ে যায় ?

—হ্যাঁ।

—এবং তখনই গুলিটা ছুটে যায় ?

—হ্যাঁ।

—ধন্যবাদ ! আর কিছু প্রশ্ন আমি করব না। আপনাকে তাহলে আমি এয়ারেস্ট কবছি না। কিন্তু আমাকে না জানিয়ে আপনি শহর ত্যাগ করবেন না। আপনি বাড়ি যেতে পারেন। আপনার গাড়িটা আছেই।

সুজাতা তার রাউসের ভিতর থেকে গালা-মোহর করা একটা খাম বার করে সেটা রমেনের দিকে বাড়িয়ে ধরে বলে, এই খামটা আপনি রাখুন, এবং শীল করা একটি খাম পেয়েছেন বলে আমাকে একটা রসিদ দিন। এটা এখন আমার কাছে থাকা নিরাপদ নয়। তাছাড়া এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে এই খামটার একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে। এটাও হয়তো এভিডেন্স হিসাবে আপনার দরকার হবে। এর ভিতর—

—জানি সুজাতা দেবী। ওটা আমিই রাখছি। রসিদও লিখে দিচ্ছি, কিন্তু আমার আর একটা প্রশ্নের জবাব দেবেন ?

—বলুন।

—আপনারা তিনজনেই বা বললেন তাতে দাঁড়াচ্ছে এটা নিছক একটা দুর্ঘটনা। সে ক্ষেত্রে প্রথমটার আপনি সমস্ত সত্যি কথা বলতে অস্বীকার করেছিলেন কেন ? দ্বিতীয়ত এইমাত্র আপনি বললেন, এই ‘হত্যাকাণ্ডের’

সঙ্গে খামটার সম্পর্ক নিবিড়। হত্যাকাণ্ড কেন স্ফূর্তি দেবী? আপনি তো প্রত্যক্ষদর্শী যে এটা হত্যাকাণ্ড নয়, অ্যাকসিডেন্ট।

স্ফূর্তি একটু ভেবে নিয়ে বলে, আপনার ছ'টো প্রশ্নেরই কৈফিয়ৎ আমি দেব। ঠিক এই জন্যই আমি উকিলের উপস্থিতি ছাড়া কোন কথা বলতে চাইনি। আমি জানি, যে এ রকম একটা রক্তাক্ত দৃশ্যের পরে আমি এখনও স্বাভাবিক হতে পারিনি। আপনাকে কোন এজাহার দিতে গেলে উন্টোপান্টা শব্দ ব্যবহার করে বলব, ঠিক এখনই যেমন 'দুর্ঘটনা' কথাটা বলতে 'হত্যাকাণ্ড' বলে ফেলেছি। তাই আমি বলেছিলাম, আমার সলিসিটরের উপস্থিতি ভিন্ন কোন কথা আমি বলব না।

—আপনি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, বলেছিল ছ'দে দারোগা রমেন গুহ।

॥ উনিশ ॥

বাসুসাহেব তাঁর প্রশস্ত ড্রইংরুমে অস্থিরভাবে পদচারণ করে চলেছেন। হাত দুটি পিছনে। তাঁর গায়ে একটা গরম কাপড়ের ড্রেসিং গাউন। স্ফূর্তি আর অরূপরতন বসে আছে সামনের দুটি সোফায়। পদচারণ করতে করতে হঠাৎ খেমে পড়ে বাসুসাহেব বলেন, আমি অত্যন্ত দুঃখিত স্ফূর্তি; কিন্তু আমি তোমাকে কী সাহায্য করতে পারি? তুমি তো আমার পরামর্শ মত চললে না। তোমাকে আমি বারে বারে বললাম, কাগজগুলো নিয়ে সেদিন দশটার গাড়িতে কলকাতা যেতে, এমন কি আমি নিজেও এই বুড়ো বয়সে তোমার জন্তে ক'লকাতা দৌড়লাম। কিন্তু না এখানকার স্টেশানে, না ক'লকাতার কোথাও তোমার দেখা পেলাম না। ফিরে এসে এখন শুনিছ তুমি আদৌ সে ট্রেনে যাওনি।

স্ফূর্তি আচ্ছরের মত চুপ করে বসে থাকে।

অরূপ বলে, কিন্তু স্ফূর্তি দেবী তো সমস্ত কথা আপনাকে বলেছেন। তাঁর কৈফিয়ৎটাও আপনি বিচার করে দেখুন। এখন আপনি যদি কৌশিকের ডিফেন্সটা হাতে নিতে রাজি না হন—

—কিন্তু তাই বা নেব কেমন করে? স্ফূর্তি তো এখনও আমাকে সমস্ত

কথা খুলে বলছে না। ‘নট শু হোল টুথ।’ কোথাও কিছু একটা সে গোপন করছে !

সুজাতা মাথা নেড়ে বলে, না, আমি সমস্ত কথাই আপনাকে খোলাখুলি বলেছি, কোন সত্য গোপন করিনি।

—কিন্তু আমি যে তোমাদের স্টেটমেন্টে অনেক ফাঁক দেখতে পাচ্ছি।

—কি ফাঁক ?

—অনেক ফাঁক ! প্রথমতঃ কৌশিকের জামা ও কাপড় দুটাই ছিঁড়ে গেছে। অথচ আগরওয়ালের বেশবাসে মারামারির তো কোনও চিহ্ন ছিল না ! কেন ?

সুজাতা কৈফিয়তের ভঙ্গিতে বলে—ওঁর গায়ে গরম স্ফাট ছিল, তাই টানাটানিতে ছিঁড়ে যাবার।

—কিন্তু তার ব্যাকব্রাশ করা চুলটাও কেমন করে পরিপাটি থাকল ?

সুজাতা চুপ করে থাকে।

বান্ধুসাহেব আবার কয়েকবার পাশচারি করে এসে বলেন, মারামারি করল আগরওয়াল, অথচ চশমাটা ভেঙে গেল নকুলের, যে নাকি মারামারির ধারে কাছে ছিল না—

—ওটা ঘটেছে অনেক আগে। নকুলবাবু মদ কিনতে যাবার আগে, তখন একদফা ধস্তাধস্তি হয়েছিল। আমার সঙ্গে নকুলবাবুর। সে যখন আমাকে জোর করে গাড়ি থেকে নামাচ্ছিল—

—কিন্তু সে কথা তো তুমি এতক্ষণ বলনি !

সুজাতা আবার চুপ করে যায়।

অরূপ বলে, একটি মহিলা দু'তিনজন পুরুষমহুষের কাছ থেকে কি ভাবে শালীনতা রক্ষা করেছিল তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা—

বাধা দিয়ে বান্ধুসাহেব বলে ওঠেন—দেন গো টু সায়ওয়ান এল্ল। ডাক্তারের কাছে রোগী যখন উপসর্গ লুকাতে চায়, আর উকিলের কাছে মকেল লুকায় সত্য ঘটনা তখন সেটা শিবের অসাধ্য !

সুজাতা আবার বলে, বিশ্বাস করুন, সব কথাই বলেছি আমি ! লুকাইনি কিছুই।

আবার কিছুক্ষণ নীরব পদচারণা করে বান্ধুসাহেব টেবিল থেকে পাইপটা

তুলে নেন, তাতে তামাক ভরতে ভরতে বলেন, স্টেশান থেকে রওনা হওয়ার পর ঘটনাগুলো পর পর বলে যাও তো—

—সেদিনই তো বলেছি।

—আবার বল। আমি দেখতে চাই সেদিনের স্টেটমেন্টের সঙ্গে কোন অসঙ্গতি হচ্ছে কিনা।

সুজাতা আবার বলতে থাকে সেদিনকার অভিজ্ঞতার কথা :

স্টেশানে আগরওয়াল এবং নকুলের আকস্মিক আবির্ভাবে সে প্রথমটায় খুব বিচলিত হয়ে পড়ে। তবু তৎক্ষণাৎ সে নিজেকে সামলে নেয়। ওর তখন ধারণা হয়েছিল, আগরওয়াল জানতে পারেনি যে সে পালাবার মতলবেই স্টেশানে এসেছিল, এবং তার ব্লাউসের ভিতর কাগজগুলো আছে। সেটা যে ওর ভুল ধারণা এটা প্রথম বুঝতে পারে বাগানবাড়িতে পৌঁছে। তখন সে বুঝতে পারে, যে সকালবেলা সে যখন মেজানইন ঘরে কৌশিকের সঙ্গে পরামর্শ এঁটেছে তখন নকুল হুই আড়ালে দাঁড়িয়ে থেকে সবটাই জানতে পারে। আগরওয়ালও নিশ্চয় নকুলের কাছ থেকে ব্যাপারটা জানতে পেরে স্টেশানে ছুটে এসেছিল—

বাহুসাহেব বলেন, আগরওয়াল কি ভেবেছিল, তুমি কি ভেবেছিলে এসব আমি শুনতে চাই না। ঘটনা যা ঘটেছিল তাই শুধু পর পর বলে যাও।

সুজাতা আবার শুরু করে তার কাহিনী :

গাড়িতে সে পিছনের সীটে বসে। নকুল সামনের আসনে। গাড়ি চালাচ্ছিল আগরওয়াল। সুজাতা লক্ষ্য করেছিল, পিছনে সীটের উপর একটা ফলের বুড়ি ও একটা চামড়ার ব্যাগ ছিল। ফলের বুড়ি থেকে একটা মদের বোতলের মাথাও দেখা যাচ্ছিল। গাড়িটা কারখানার দিকে না গিয়ে বাগানবাড়ির পথের দিকে মোড় নিতেই সুজাতা বলেছিল, একি, কোথায় যাচ্ছেন ?

আগরওয়াল বলেছিল, ঘাবড়াচ্ছে কেন ? এদিকে একটা কাজ আছে সেটা সেরে এখনই আমরা ফিরে আসব।

—জাস্ট এ মিনিট। আন্ডাজ কটার সময় তোমরা রওনা হয়েছিলে ?

—যদি তো দেখিনি। সন্ধ্যে নাগাদ।

—তখনও মেল ট্রেনটা আসেনি ?

—না এসেছিল। ট্রেনটা তখন এসেছিল, কিন্তু ছাড়েনি। প্ল্যাটফর্মেই দাঁড়িয়ে ছিল।

—ঠিক মনে আছে তোমার ?

—হ্যাঁ ; কারণ নকুলবাবুকে টিকিট কালেক্টার আটকে ছিল। তার কাছে প্ল্যাটফর্ম টিকিট ছিল না। গেটের টিকিট কালেক্টার বলেছিল, আপনি যে এই মেল ট্রেনে নামেন নি তার প্রমাণ কি ? তখন মিস্টার আগরওয়াল এগিয়ে যান। রেলের লোকটি আগরওয়ালকে চিনত। তাই নকুলকে ছেড়ে দেয়।

—বেশ। তারপর ?

সুজাতা আবার শুরু করে :

গেটটা হাট করে খোলা ছিল। গাড়িটা মোজা কম্পাউণ্ডের ভিতরে ঢুকে পড়ে। বারান্দায় একটা পেট্রোলিয়াম জলছিল। গাড়ি দামাতে দেখে একটা লোক আগিয়ে আসে। সে গুগানকার একজন মুসলমান চৌকিদার। আগরওয়াল গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ায়, সুজাতাকে বলে, নেমে এস।

নিমন্ত্রণ পোড়ো বাড়িটার দিকে তাকিয়ে সুজাতার গা ছমছম করে ওঠে, বলে—আমি নেবে কি করব ? আপনার কি কাজ আছে সেয়ে ভাড়াভাড়া আসুন !

আগরওয়াল পিছন দিকের দরজাটা খুলে চঠাৎ সুজাতার হাতটা চেপে ধরে, বলে, নেমে এস সুজাতা, কথা আছে।

কেমন যেন রোখ চেপে যায় সুজাতার। আগরওয়াল ইতিপূর্বে কখনও এভাবে তার গায়ে হাত দেয়নি। ততক্ষণে সে বুঝতে পেরেছে স্বদের কোন বদ মতলব আছে। হাতটা জোর করে ছাড়িয়ে নিতে যায়, বলে—কী অসভ্যতা করছেন ! হাত ছাড়ুন।

আগরওয়াল সরে দাঁড়ায়, এবং তৎক্ষণাৎ নকুল আর ঐ মুসলমান লোকটা এসে ওর দু হাত ধরে। জোর করে ওকে টেনে নানায়। প্রথমটা সুজাতা দৈহিক বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল ; কিন্তু তিনজন পুরুষ মানুষের বিরুদ্ধে সে কিছুই করতে পারেনি। ঐ সময়েই সুজাতার হাতের ধাক্কা লেগে নকুলের চশমাটা ভেঙে যায়। কাদের আলি সুজাতার মুখটা একটা গামছা দিয়ে বেঁধে ফেলে এবং পাঁজাকোলা করে ওকে ঘরের ভিতর নিয়ে যায়। হাত দুটোও ওর বেঁধে দেয়। ঘরের খাটে ওকে শুইয়ে দিয়ে নকুল ও কাদের আগরওয়ালের ইজিতে ঘর ছেড়ে চলে যায়।

আগরওয়াল একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে এসে ওর মুখোমুখি বসে। তখনও হাত ও মুখ বাঁধা। আগরওয়াল ধীরে-স্থিরে একটি সিগার ধরায়; একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলে, শুনেছি তুমি ভাল থিয়েটার করতে পার, অভিনেতা হিসাবে আমার কৃতিত্বটাও কম নয়, কি বল?

জবাব দেবার কোন উপায় ছিল না স্জাতার।

আগরওয়াল বলে, প্রেমালাপ এক তরফা হয় না। ইচ্ছে করছে তোমার মুখের বাঁধনটা খুলে দিতে। দেব? তুমি চিৎকার করবে না তো? দেখ, চিৎকার করলে কোন লাভ নেই। আধমাইলের মধ্যে কোন বসতি নেই। তবে চেষ্টামেচিতে আমার মুডটা নষ্ট হয়ে যাবে। শুধু শুধু চেষ্টামেচি কর না, কেমন লক্ষ্মীটি!

বলে সে এগিয়ে আসে। ওর মুখের বাঁধনটা খুলে দেয়। হাতটা বাঁধাই থাকে।

কথা বলতে পেরে স্জাতা প্রথমেই বলেছিল, আমাকে এভাবে ধরে এনেছেন কেন? কী চান আপনি?

বিচিত্র হেসে আগরওয়াল বলেছিল, এতদিন তোমার কাছে একটি জিনিসই চাইছিলাম, যা তোমার ব্লাউসের মধ্যে লুকানো আছে; কিন্তু আজ তার চেয়েও বেশি কিছু চাইছি! বেণীর সঙ্গে মাথা!

স্জাতার হাত পা হিম হয়ে আসে।

আগরওয়াল আবার বলে, মুখের বাঁধন খুলে দেবার পর তুমি চিৎকার করনি, সুতরাং আমার দিক থেকে আরও কিছু 'গুড্ জেস্চার' দেখানো উচিত, কি বল?

এবারও জবাব দেয় না স্জাতা।

—ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন স্ত্রীলোকের গারে হাত দেবার মত সাহস আমার নেই—এ অপবাদ আমাকে কেউই দেবে না। সুতরাং হাত বাঁধা অবস্থায় তোমার ব্লাউসের বোতাম খুলে খামটা আমি বের করে নিতে পারি। তা আমি নেব না। আমি আশা করব, তুমি স্বৈচ্ছায় আমাকে ওটা হাতে তুলে দেবে!

আগরওয়াল উঠে গিয়ে দরজায় ছিটকানিটা তুলে দেয়। পকেট থেকে একটা মোড়োড রিভলভার বার করে সেটা টেবিলে রাখে। তারপর এগিয়ে এসে স্জাতার হাতের বাঁধনটা খুলে দেয়, বলে খামটা নিজেই বার করে দাও!

স্বজাতা কোন আপত্তি করেনি। খামটা বার করে আগরওয়ালের দিকে ছুঁড়ে দেয়। সেটাকে টেবিলের উপর রেখে আগরওয়াল বলে, তুমি বুদ্ধিমতী। দুটো দাবী ছিল আমার। একটা মিটিয়েছ তুমি। দ্বিতীয়টাও বেচ্চার মিটিয়ে দেবে আশা করি।

স্বজাতা বলে, বার জন্তে আমাকে আটকে রেখেছিলেন তা তো পেয়েই গেলেন, আবার কেন আটকে রেখেছেন আমাকে ?

—তারপর ? ওটা আমি হজম করব কেমন করে ? ছাড়া পেলেই তো তুমি সোজা পুলিশে যাবে ?

—আমি কথা দিচ্ছি, আমি পুলিশে যাব না।

—তোমার কথার গ্যারান্টি কি ?

—কি গ্যারান্টি দিতে পারি বলুন ?

—তোমার সামনে এখন দুটো রাস্তা খোলা আছে। হু-ভাবে তুমি গ্যারান্টি দিতে পার আমাকে যে তুমি পুলিশে যাবে না। এক, তুমি আমাকে বিবাহ করতে রাজি হবে। দুই, তুমি এখানে আজ রাত্রেই আত্মহত্যা করবে। ভেবে দেখার সময় আমি দিচ্ছি।

স্বজাতার হাত পা হিম হয়ে আসে। এমন দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে এমন সংক্ষেপে প্রস্তাব দুটি আগরওয়াল পেশ করেছে তার সামনে যে স্বজাতা বুঝতে পারে এছাড়া তৃতীয় কোন পথ ওর সামনে খোলা নেই। আগরওয়াল দরজার ছিটকানিটা খুলে নকুলকে ডাকে। বলে, গাড়িতে হুইকি আর সোডার বোতল আছে, নিয়ে আসতে।

একটু পরে নকুল ফিরে এসে বলে, হুইকির বোতলটা ভেঙ্গে গেছে। আগরওয়াল তখন একটা একশ টাকার নোট নকুলকে দিয়ে বলে এক বোতল হুইকি কিনে আনতে। নকুল অবশ্য একবার আপত্তি জানিয়ে বলেছিল, আমার চশমাটা ভেঙ্গে গেছে, কাদের-জালি গেলে হয় না ? আগরওয়াল ধমক দিয়ে বলেছিল, কাদের গেলে মূর্গীটা রাখবে কে ? তুমি ?

অগত্যা নকুলই তার সাইকেল নিয়ে মদ কিনতে বেরিয়ে যায়।

নকুল চলে যাবার পর আগরওয়াল আবার এসে বসেছিল তার চেয়ারে। দরজাটা সে আবার বন্ধ করে দিয়ে আসে। স্বজাতাকে সে প্রশ্ন করে তুমি মনস্থির করেছ স্বজাতা ?

অস্বস্ত মেয়ে ঐ স্বজাতা। অসম্ভব তার মনের বল। দাঁতে দাঁত দিয়ে

বলেছিল, কিন্তু আমি বিয়ে করতে রাজী হলেই বা আপনি গ্যারান্টি পাবেন কেমন করে? কালই তো আমি আবার গররাজি হতে পারি?

—তা পার। বিয়ে করতে রাজি হওয়াটা কোন গ্যারান্টি নয়। সেই কথাটা পাকা করতে আজ রাতে তোমাকে আমার সঙ্গে এখানে রাজিবাস করতে হবে। জীবনে অনেক মেয়েমানুষের সঙ্গে এক বিছানায় শুয়েছি। আমি বেশ বুঝতে পারব, যা দিলে, তা খেঁচায় দিলে না বাধ্য হয়ে দিলে।

—আর যদি আমি তাতে রাজী না হই?

—তার বিকল্প ব্যবস্থাও করে রেখেছি। দেখবে? বলে জানালার বাইরে মুখ বাড়িয়ে কাদের-আলিকে চীৎকার করে ডাকে। এই সুযোগে সুজাতা উঠে দাঁড়ায়। যে টেবিলটার উপর রিভলভারটা পড়ে আছে সেটা ওর কাছ থেকে হাত তিনেক দূরে। রিভলভার সে জীবনে কখনও ছোঁড়েনি কিন্তু সুজাতা জানত সেটা ছোঁড়ার দরকার হবে না। কোনক্রমে ওটা হাতে তুলে নিয়ে আগরওয়ালের সামনে উত্তত করে ধরলেই সে পথ ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে। এক পা শুদিকে অগ্রসর হবার আগেই আগরওয়াল ঘুরে দাঁড়ায়। সে বুঝতে পারেনি সুজাতার উদ্দেশ্য, সহজ ভাবেই বলে, বস, উঠে দাঁড়ালে কেন?

সুজাতা আবার বসে পড়ে।

কাদেরআলি এসে দাঁড়ায় খোলা দরজার সামনে।

আগরওয়াল বলে, গর্ত খুঁড়ে রেখেছ?

লোকটা ভাবলেনহীন মুখে বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ।

—সেবার সেই এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েটার বেলায় যে কাণ্ড হয়েছিল সে রকম কিছু হবে না তো?

লোকটা সলজ্জে জবাব দেয়, আজ্ঞে না, সেবার টাইম বড় কম হয়ে গিয়েল, তাই শ্রালে টেনে তুলেছিল। এবার মানুষভর গাড়া বানিয়েছি।

আগরওয়াল হেসে বলে, বেশ করেছ, ওটা বুঁজিয়ে দাও। ওর আর দরকার হবে না।

—দরকার হবে নি? তবে লাস কোথায় যাবে?

—সে তোমাকে ভাবতে হবে না, বলে, এ পকেট ও পকেট হাতড়ে বলে, এঃ সিগার ফুরিয়ে গেছে। নকুল কি চলে গেছে নাকি?

কাদের বলে, তিনি তো অনেকক্ষণ চলে গেছেন আজ্ঞে।

—তবে তুমি যাও। শহর তুক্ বেতে হবে না! নটাও বাজে নি, সোনাভাঙার মুদি দোকানটা খোলা আছে এখনও। কাঁচি ছাড়া আর কি পাবে না। ভাই নিয়ে এস তিন প্যাকেট। মাংসটা গলে যাবে না তো?

—আজ্ঞে না। আগুনটা টেনে দিয়ে যাচ্ছি। কাঠের আগুনে গুমে গুমে সেক হবে ভাল।

—আজ রাতেই গর্তটা বন্ধ করে রেখ।

যে আজ্ঞে, বলে লোকটা চলে যায়।

দরজাটা হাট করে খোলাই থাকে।

আগরওয়াল তার চেয়ারে বসে এসে আবার বসে। বলে, দেখলে তো, দুর্ভাগ্য ব্যবসাই করা আছে।

দুর্জয় সাহস মেয়েটার। এর পরেও বলে, লাস যখন যাঁটা চাপা দেবার ব্যবসাই আছে, তখন আর আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে কেন? হত্যাও তো করতে পারেন।

আগরওয়াল হো হো করে হেসে ওঠে। বলে, এমন অবস্থায় পড়লে আমি কিন্তু তোমার মত মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারতাম না।

—আপনি আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন না যে?

—হত্যা আত্মহত্যা কোনটাই করতে হবে না। তুমি যখন খেছার আমার সঙ্গে এখানে—

—কিন্তু তারপর যে আপনিই আমাকে হত্যা করবেন না তার গ্যারান্টি কি?

—গর্তটা তো বুজিয়ে ফেলতেই বললাম। তোমাকে আমি নিজে হাতে মারতে পারব না।

—নিজের হাতে কি এর আগে কাউকে হত্যা করেন নি?

—টেপ-রেকর্ডার যখন তোমার কাছে নেই তখন আর অস্বীকার করে লাভ কি? ঐ যে খাটে বসে আছে ঐ খানেই বছর খানেক আগে আর একটি এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে—

—চুপ করুন আপনি।

—হ্যাঁ আজকের দিনে সেসব কথা না তোলাই ভাল! তুমি তো আর তার মত অবুঝ এক গুঁয়ে নও, তুমি যখন খেছার—

—চুপ করুন।

—বেশ চুপ করলাম। তাহলে তুমিই কিছু বল। না হয়, গানই শোনাও একটা ?

সুজাতা চারিদিকে একবার তাকিয়ে দেখে। আগরওয়াল ছাড়া ত্রিসীমানার আর কেউ নেই ! নকুল এবং কাদের আলি দুজনেই ঘটনাচক্রে সরে গেছে। এখন আগরওয়াল যদি একবার চেয়ার ছেড়ে ওঠে তবেই সে ঝাঁপিয়ে পড়ে দখল করতে পারে আগ্নেয়াস্ত্রটা। এমন চরম বিপদেও তার মাথা ঠিক আছে। বাঁচতে হলে তাকে বুদ্ধির দৌড়ে হারাতে হবে আগরওয়ালকে। চরম একটা অভিনয়ের চেষ্টা করল সে। হঠাৎ কান খাড়া করে বলে, বাইরের বারান্দায় কেউ এসেছে।

সুজাতা যা আশা করেছিল তা হ'ল না। আগরওয়াল চট করে উঠে দাঁড়াল ঠিকই ; কিন্তু সবার আগে হাত বাড়িয়ে রিভলভারটা তুলে নিল। টর্চটাও তুলে নেয়। বারান্দায় এসে চারদিকে টর্চের আলো ফেলে কি দেখে নেয়। ফিরে এসে বলে, ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে !

আবার টেবিলের উপর পিস্তল আর টর্চবাতিটা রেখে ফিরে এসে বসে সামনের চেয়ারটায় ; বলে, কই গান শোনালে না ?

সুজাতা মরিয়া হয়ে বলে, আমি আপনাকে বিয়ে করতে রাজি নই।

—আত্মহত্যা করবে স্থির করলে ?

—আত্মহত্যা করতে যাব কোন দুঃখে ?

—সংসারে তোমার বীতরাগ হয়েছে এই দুঃখে !

—আপনি কি রসিকতা করছেন ?

—এটা কি রসিকতা করবার সময় ?

পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বার করে আগরওয়াল সেটা আলোর সামনে মেলে ধরে। বলে, কাগজটা তোমার হাতে দিতে পারছি না। পড়ে শোনাচ্ছি, শোন : “পৃথিবীতে আমার প্রয়োজন ফুরাইয়াছে। অনেক ভাবিয়া দেখিলাম, আমার বাঁচিয়া থাকিবার কোন অর্থ হয় না। কাহারও বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নাই। তোমরা সুখে থাক, এই কামনা জানাইয়া গেলাম। আমার এই মৃত্যুর জন্য কেহ দায়ী নহে। আমি স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করিতেছি।”—বেশ হাতের লেখাটা কিন্তু তোমার !

সুজাতা লাফিয়ে ওঠে—কায় লেখা ওটা ?

—লেখিকা তো নিজের নাম সইও করেছেন।

—কোথায় গেলেন ওটা ?

আগরওয়াল হেসে বলে, জোগাড় করতে হয়েছে। ক্রোনার-লস্কর হ এ চিঠিখানা কোন হস্তরেখাবিদেয় কাছে পাঠাবেন। তা পাঠান, এ তোমারই হাতের লেখা বলে প্রমাণিত হবে। সেই ভরসাতেই তো গর্তটা বন্ধ করে দিতে বললাম। লাস পাচার করার চেয়ে আত্মহত্যা প্রমাণ করা অনেক সহজ। কি বল ? কিন্তু তার চেয়েও সহজ হবে তুমি যদি মিসেস আগরওয়াল হ'তে রাজি হও !

এই কথা বলেই আগরওয়াল এগিয়ে আসে। স্বজাতা উঠে দাঁড়ায়। আগরওয়াল গুর বাঁ হাতটা চেপে ধরতেই স্বজাতা ডানহাতে তাকে একটা প্রচণ্ড চড় মারে। আর পরমুহূর্তেই আগরওয়াল একটা পাগ্‌লা হাতীর মত কাঁপিয়ে পড়ে স্বজাতার উপর। অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বজাতা চিৎকার করে ওঠে। এরপর বোধহয় কয়েক সেকেণ্ড স্বজাতা ওকে বাধা দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল, এবং ঠিক তখনই ঘরে ঢোকে কোশিক ! সেই প্রথম আঘাত করে আগরওয়ালকে। আগরওয়াল তৎক্ষণাৎ স্বজাতাকে ছেড়ে কোশিককে জাপটে ধরে। দুজনে জড়াজড়ি করতে থাকে—

—জাস্ট এ মিনিট,—বাধা দিয়ে বলে ওঠেন বাহুসাহেব, একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না। তোমার নজর বরাবর ছিল ঐ রিভলভারটার উপর। কোশিক আর আগরওয়াল যখন পরস্পরকে জাপটে ধরল তখন তো তোমার পক্ষে সবচেয়ে স্বাভাবিক হত কাঁপিয়ে পড়ে ঐ রিভলভারটা হস্তগত করা—

স্বজাতা বলে, হয়তো তাই ছিল, কিন্তু তখন আমি একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম।

বাহুসাহেব টেবিলে একটা প্রচণ্ড চাপড় মেরে বলেন, এইখানে একটা মস্ত বড় ফাঁক থেকে যাচ্ছে। একা ঘরে, স্বত্বার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মনের জোর ঠিক রাখতে পারলে, আর কোশিক আসার পর তুমি বিহ্বল হয়ে পড়লে ? এ যে অবিশ্বাস্য।

অরুণরতন বলে, একটা কথা হয়তো আপনি জানেন না, স্বজাতা দেবী কোশিকবাবুকে ভালবাসেন !

—ভালবাসা ! মাই ফুট ! যাক, তারপর কি হ'ল বল ?

আগরওয়ালই প্রথমে পিস্তলটার নাগাল পায়। ডানহাতে তুলে নেয়

সেটা; কিন্তু কোশিকও বাঁ হাতে ওর কজি চেপে ধরে। আগরওয়াল অস্ত্রটার মুখ ঘুরিয়ে কোশিকের দিকে আনতে চায়, আর কোশিক প্রাণপণ শক্তিতে তাতে বাধা দিতে চেষ্টা করছিল। এই অবস্থায় দুজনে টলতে টলতে বারান্দার দিকে চলতে থাকে। হঠাৎ দরজার চৌকাঠে বাধা পেয়ে দুজনেই পড়ে যায়। ঠিক তখনই পিস্তলটা ফায়ার হয়ে গেল। আমি দেখি আগরওয়াল উবুড় হয়ে পড়ে আছে, আর কোশিক বুঁকে পড়ে দেখছে। ঠিক পর মুহূর্তেই নকুলবাবু এসে ঘরে ঢোকে।

অরুণ বলে, কাদের আলি কখন ফিরে আসে?

—আরও মিনিট পাঁচেক পরে।

—সিগারেট নিয়ে এসেছিল সে?

—তা আমি খোঁজ করিনি।

বাহু সাহেব উঠে দাঁড়ান। বার কতক পায়চারি করে ফিরে এসে বলেন, তুমি যা বলছ, তাতে পিস্তলটার কোশিকের হাতের প্রিন্ট থাকা উচিত নয়। তা পাওয়া যাবে না তো?

—না কোশিক ওটা স্পর্শ করেনি।

—তুমি এ বিষয়ে একেবারে নিশ্চিত?

—হ্যাঁ নিশ্চিত।

—পিস্তলটা আগরওয়ালের হাতেই ধরা ছিল? মৃত্যুর পরেও?

—হ্যাঁ।

পাইপে বার কতক টান দিয়ে বাহু সাহেব বলেন, তুমি বললে, ঠিক পরের মুহূর্তেই নকুলবাবু এসে ঘরে ঢোকে। পরমুহূর্ত বলতে ঠিক কী মীন করতে চাইছ? দু পাঁচ সেকেন্ড, না আধ মিনিট, অথবা—

—আমি এত বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম, যে সময়ের মাপটা ঠিক বলতে পারব না। আধমিনিটের বেশি কিছুতেই হবে না।

আই মীন সময়ের ব্যবধান কি এতটা হবে যে কোশিক কোচার খুঁটে পিস্তলটা মুছে নিয়ে আগরওয়ালের হাতে গুঁজে দিতে পারে?

—তা সে দেয়নি।

—আমি জানি। আমি সময় কতটা তাই বুঝে নিতে চাইছি। কোশিক তা করেনি সেকথা তুমি আগেই বলেছ। আমার প্রশ্ন ইচ্ছে করলে সেই সময়টুকু সে পেত?

—খুব তাড়াতাড়ি করলে হয়তো পেরে ।

—কিন্তু সে ক্ষেত্রেও তার ফিঙ্গারপ্রিন্ট পিস্তলটার থেকে বাবার কথা, যদি না সে কন্ডালে ভড়ানো হাতে পিস্তলটা আগরওয়ালের হাতে গুঁজে দেয়, তাই না ?

—তা তো ঠাট্টাই ।

—তবু তুমি বলছ কৌশিকের ফিঙ্গার প্রিন্ট ঐ রিভলভারে পাওয়া বাবে না ?

—সে কথা তো আগেই বলেছি ।

—এখনও তাই বলছ তো ?

স্বজ্ঞাতা রাগ করে বলে, আপনি বিশ্বাস করছেন না, যে আমি সবটাই সত্য কথা বলছি ।

—ওয়েল, আই এ্যাডমিট ! তাই আমার ধারণা ।

এরপর আর কথা কি ?

॥ কুড়ি ॥

জুরিমহোদয়গণকে শপথ গ্রহণ করিয়ে জাস্টিস্ সদানন্দ ভাট্টা নিজে আসনে এসে বসলেন । আদালতে ভিলধারণের স্থান নেই । যযুরকেতন আগরওয়াল শুধু এ জেলা সদরের নয়, এ অঞ্চলেরই একজন নাম করা লোক । একডাকে তাঁকে সবাই চেনে । ফলে আদালতে অভূতপূর্ব লোক সমাগম হওয়া কিছু বিচিত্র নয় । তার উপর একটা গুজব বাজারে ছড়িয়েছে, যে আগরওয়ালের হত্যাকারী ঐ বিত্ত দাস লোকটা আসলে নাকি শিক্ষিত ভদ্রলোক । সে নাকি পাশ করা একজন এঞ্জিনিয়ার । ছদ্মবেশে আগরওয়াল ইণ্ডাস্ট্রিসে চাকরি করতে এসেছিল । শুধু তাই নয়, এ যামলার একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী ঐ মেয়েটার সঙ্গে বিত্ত ড্রাইভারের ব্যক্তি গোপন অবৈধ সম্পর্ক ছিল । স্বতরাং ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে নারীঘটিত কারণে ধনকুবেরের হত্যা । লোকজনের ভীড় তো হবেই ! দর্শকদের আসন অনেক আগে থেকেই পূর্ণ হয়ে গেছে । অনেকে দেওয়াল ঘেঁসে সারি দিয়ে দাঁড়িয়েও আছে । কিছু প্রেসের লোকও এসেছে ।

জনতার উপর থেকে বিচারকের দৃষ্টি সামনের দিকে চলে আসে। একদিকে বসে আছেন বিশালকার প্রবীন ও অভিজ্ঞ পাবলিক প্রসিকিউটর নিরঞ্জন মাইতি। এই আদালতেই জীবনের পচিশটা বছর কেটে গেছে তাঁর। পাশে বসে আছে তাঁর তরুণ সহকর্মী সুনীলেন্দু পাল। সামনে আসামীর কাঠগড়ায় থাকি ফুলপ্যাণ্ট আর হাফসার্ট-পরা আসামী। কদিন সে দাড়ি কামায়নি। তার দৃষ্টি ভাবলেশহীন, তার মনোভাব বোঝা যাচ্ছে না।

প্রতিবাদীর নির্দিষ্ট আসনে সর্বপ্রথম আসনে পলিত কেশ স্ববির ব্যারিষ্টার পি. কে বাহু। পনের বছর পর গাউনটাকে আজই বার করে পরেছেন। তাঁর ঠিক পাশেই তাঁর সহকারী নবীন উকিল অরুণরতন মহাপাত্র।

প্রথামাফিক বাদী ও প্রতিবাদী প্রস্তুত কিনা জেনে নিয়ে বিচারক বিচার আরম্ভ ঘোষণা করলেন। পাবলিক প্রসিকিউটর নিরঞ্জন মাইতির দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, আপনি কি কোন প্রারম্ভিক ভাষণ দেবেন?

বিশালায়তন প্রোট উঠে দাঁড়ান, অভিবাদন করে বলেন, আদালত যদি অনুমতি দেন, আমি একটি প্রারম্ভিক ভাষণ দিয়েই এই বিচারের সূচনা করতে চাই। যে হত্যাকাণ্ডের বিচার জুরিমহোদয়গণ করতে বসেছেন তার ফলাফল সম্বন্ধে আমাদের মনে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কারণ আসামীর অপরাধ সূর্যোদয়ের মত প্রকাশ্য। অপরাধ গোপন করবার যে সব চেষ্টা সে করেছে তার অন্তঃসারশূন্যতা সহজেই প্রমাণিত হবে। আমি এই প্রারম্ভিক ভাষণে সে সব কথা কিছুই বলব না, আমি শুধু এ বিচারের বৈশিষ্ট্যটুকু বিশ্লেষণ করতে চাই। এ বিচারের একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে।

বিচার চলা কালে জুরিমহোদয়গণ লক্ষ্য করবেন, আজকের সমাজে যুবশক্তির কী নির্দারক অবক্ষয় হয়েছে। উচ্চশিক্ষিত উদ্ভবংশীর একটি তরুণ, যে নাকি দেশের ও দশের আশা ভরসা হতে পারত, সে কী ভাবে ধাপে ধাপে নিচে নেমে গেছে তাই দেখবেন আপনারা। আমার তো মনে হয়, সমাজের এই অবক্ষয়ের পশ্চাতে আছে বিলাতি ডিটেকটিভ নভেলের এবং সস্তা ক্রাইম-চিত্রের প্রভাব।

আপনারা জানেন, স্বাধীন ভারতবর্ষে আজ কত সহস্র সহস্র নূতন প্রকল্প হচ্ছে। সেখানে সুশিক্ষিত এঞ্জিনিয়ারদের একান্ত অভাব। আপনারা এও জানেন যে একজন এঞ্জিনিয়ারকে তৈরী করতে রাষ্ট্রকে কত অর্থ বিনিয়োগ করতে হয়। সে অর্থ আপনি-আমি যোগান দিচ্ছি, আমরা

একত্র করভারে প্রতীড়িত হচ্ছি! কেন? না আমরা আশা করে আছি আমাদের দেশের যুবশক্তি ঐ সব কারিগরী কাজ শিখে নতুন করে দেশকে গড়ে তুলবে। সন্তোষজনক এই সব এঞ্জিনিয়ারদের কাছে দেশবাসীর এই হচ্ছে প্রত্যাশা।

এবার আপনারা ঐ তরুণ আসামীর দিকে তাকিয়ে দেখুন। উনি শিবপুরের বেঙ্গল এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে দুই বৎসর আগে পাশ করে বেরিয়েছেন। তাঁর পিতৃদেব কালী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। সৎ বংশের অতি উচ্চশিক্ষিত একজন প্রাণবন্ত সুস্থ যুবকের পরিণতি এবার দেখুন আপনারা। উনি নিজের নাম গোপন করে ড্রাইভারের ছদ্মবেশে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন একজন স্বনামধন্য ব্যবসায়ীর ছত্রছায়ে। স্বর্গতঃ মরুরকেতন আগরওয়ালকে আপনারা সকলেই চেনেন; অসংখ্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন, সংখ্যাভীত প্রতিষ্ঠানে তাঁর দানের কথা চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। দূর পশ্চিমের লোক হওয়া সত্ত্বেও তিনি মনে-প্রাণে বাঙালী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর বাঙলা শুনে বোঝা যেত না যে তিনি প্রবাসী। সেই নিরভিমান, সদালাপী, মহাপ্রাণ দানবীর বুকের রক্ত দিয়ে তাঁর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গেছেন।

কী পাপ? তাঁর পাপ ছিল একটি বেকার বাঙালী যুবকের কাতর অহুসারে অভিভূত হওয়া; তাঁর পাপ একজন অজ্ঞাতকুলশীলকে ভালবেসে বুকে টেনে নেওয়া।

জানি, আপনাদের মনে কী প্রশ্ন জেগেছে। কেন এই হত্যাকাণ্ড? সে কথা এ বিচারালয়ে ক্রমশঃ প্রকাশ্য। এক কথায় তার জবাব, পরশ্রীকাতরতা, অর্থ-লালসা এবং যৌনক্ষুধা। বাদীপক্ষ থেকে আমরা আশা করব যে, এমন নৃশংস হত্যাকাণ্ড স্থির মস্তিষ্কে যে করতে পারে এবং ‘পার্টনার-ইন-ক্রাইমের’ সাহায্যে প্রমাণ লোপ করার চেষ্টা করতে পারে তাকে জুরিমহোদয়গণ চরমতম দণ্ডের আদেশ দিয়ে বিচারালয়ের মর্গদা রক্ষা করবেন।

কপালের ঘাম মুছে বিশাল বগু মাইতি সাহেব আসন গ্রহণ করেন।

জজ সাহেব প্রতিবাদী আইনজীবীদের দিকে দৃকপাত করে বলেন, আপনারা কোনও প্রায়শ্চিত্ত ভাষণ দেবেন?

অরুণরতন উঠতে বাচ্ছিল, তার কাঁধে একটা হাত দিয়ে হবির বাহুসাহেব উঠে দাঁড়ান। বিচারালয়ে সূচীভেদ্য নিশ্চলতা। কিন্তু সকলের প্রত্যাশাকে

ধূলিসাৎ করে বাহুসাহেব বলেন, না, আদালত অসু্যমতি করলে বাধীপক্ষ তাঁদের প্রথম সাক্ষীকে ডাকতে পারেন।

নিরঞ্জন মাইতি বোধহয় এটা আশা করেননি। জজ সাহেবের ইঙ্গিতে তিনি তাঁর প্রথম সাক্ষীকে আহ্বান করলেন,—ডাঃ অতুলকৃষ্ণ সান্গাল।

অতুলকৃষ্ণ যথারীতি শপথ নিয়ে সাক্ষীর মঞ্চে উঠে দাঁড়ান। মাইতি মশাই তাঁর নাম, পরিচয়, পেশা ইত্যাদি প্রশ্নের আকারে প্রতিষ্ঠা করলেন। ডাক্তার সান্গাল তাঁর সাক্ষে জানালেন, গত সাতই নভেম্বর রাত্রি দশটা কুড়িমিনিটে তিনি মৃত ময়ুরকেতন আগরওয়ালকে পরীক্ষা করেন। তাঁর অসু্যমান গুলিবিদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আগরওয়ালের মৃত্যু হয়। মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থাও তিনি নিজ তত্ত্বাবধানে করেছেন। অটোপ্সি রিপোর্ট অনুযায়ী গুলি পিঠের দিক থেকে দেহে প্রবেশ করেছে, মেরুদণ্ডের কঠিন অস্থিতে প্রতিহত হয়ে গুলিটা তীক্ষ্ণকগতি প্রাপ্ত হয় এবং হৃদপিণ্ডে প্রবেশ করে। গুলিটি মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদের সময় পাওয়া গেছে। সেটি তিনি তদন্তকারী অফিসারের কাছে অর্পণ করেছিলেন।

মাইতি প্রশ্ন করেন, মৃত্যু কখন হয়েছে বলে আপনার বিশ্বাস?

—রাত্রি আটটা থেকে সাড়ে নয়টার মধ্যে।

দেহাভ্যন্তরে প্রাপ্ত সীসার গোলকটিকে এ মামলার এক নম্বর এক্সিবিট রূপে চিহ্নিত করিয়ে মাইতি সাহেব প্রশ্ন করেন, আপনি বলেছেন গুলিটি পিঠের দিক থেকে মৃতের দেহে প্রবেশ করে হৃদপিণ্ড বিদ্ধ করেছিল, তাই নয়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—গুলির আঘাতে মৃত কতগুলি কেসের অভিজ্ঞতা আপনার হয়েছে সারা জীবনে?

—আন্দাজ করা শক্ত।

—তবু কত হবে? পাঁচ-দশটা, অথবা কয়েক শ, অথবা কয়েক হাজার?

—না হাজার হবে না। যুদ্ধক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা ধরে শত খানেকের উপর হবে।

—এর মধ্যে একটি কেসও কি আপনি প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে, যেখানে আহতের পৃষ্ঠদেশ দিয়ে গুলি দেহে প্রবেশ করেছে, অথচ পরে প্রমাণিত হয়েছে আগেরাগ্র আহতের নিজের হাতে ছিল?

—না।

ক্ষেত্রে কি আপনি বিশ্বাস করতে পারেন, যে রিভলভারটি মৃতের হাতে থাকা সঙ্গেও ফায়ার হয়ে যায় এবং গুলিটি তাঁর পৃষ্ঠদেশ দিয়ে দেহে প্রবেশ করে ?

—অবজেক্‌সান য়োর অনার ! উঠে দাঁড়ান বাহু-সাহেব । বলেন, সাক্ষী তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথাই বলতে পারেন, তাঁর অনুমান কোন এভিডেন্স নয় ।

জাষ্টিস ভাহুড়ী গম্ভীরভাবে বলেন অবজেক্‌সান ওভারকল্ড্ । সাক্ষী একজন বিশেষজ্ঞ । আদালত সাক্ষীর অভিজ্ঞতাপ্রসূত অনুমান শুনতে ও নথীবদ্ধ করতে প্রস্তুত ।

ডাক্তার সান্‌জাল বলেন. আমার মতে আগ্নেয়াস্ত্রটি মৃতের হাতে থাকা অবস্থায় ফায়ার হলে এভাবে তার পিঠে গুলি লাগতে পারে না ।

—অর্থাৎ আপনি বলতে চান, রিভলভার থেকে যখন গুলিটি নিক্ষিপ্ত হয়, তখন সেটা মৃতব্যক্তি ছাড়া আর কারও হাতে ছিল ।

—আমার তাই বিশ্বাস ।

—আপনি যখন মৃতদেহটি পরীক্ষা করেন তখন রিভলভারটি কি মৃতের ডান হাতের মুঠিতে ধরা ছিল ?

—আজ্ঞে ইয়া ।

—আপনার কি এই অনুমান যে রিভলভারটি ফায়ার করার পরে মৃতের হাতে কেউ সেটা ওঁজে দিয়েছিল ?

—অবজেক্‌সান, য়োর অনার ! সাক্ষীর অনুমান কোন এভিডেন্স নয়—আবার প্রতিবাদ করে ওঠেন বুদ্ধ বাহুসাহেব ।

—অবজেক্‌সান সাস্টেইনড । এ প্রশ্ন বিশেষজ্ঞর কাছে পেশ করা হয়নি । সাক্ষীর অনুমাননির্ভর উত্তর এ ক্ষেত্রে অগ্রাহ্য ।

মাইতি একটু হেসে বলেন, আমার সওয়াল শেষ হয়েছে ।

বাহুসাহেব উঠে দাঁড়িয়ে প্রথমেই বলেন, আপনি ইতিপূর্বে বলেছেন যে রিভলভার থেকে যখন গুলিটি নিক্ষিপ্ত হয়, তখন সেটা মৃতব্যক্তি ছাড়া অন্য কারও হাতে ছিল—এইটাই আপনার বিশ্বাস ! নয় কি ?

—ইয়া তাই বলেছিলাম ।

—আপনি কি প্রাথমিক তদন্তের সময় শুনেছিলেন যে আসামী স্বীকারোক্তিতে বলে যে তার সঙ্গে মৃতব্যক্তির একটা যত্নাধিকার চলছিল এমন সময় দুজনেই পড়ে যায় ?

—ই্যা শুনেছি।

—এমন কি অসম্ভব যে পতনের পূর্বমূহুর্তে আগ্নেয়াস্ত্রটি মৃতব্যক্তির হস্তচ্যুত হয় এবং সে তার উপর পড়ে যায় ?

—আমার পক্ষে এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া শক্ত। আমি তো সে সময় উপস্থিত ছিলাম না।

আপনি যখন পূর্ববর্তী প্রশ্নের জবাবে আমার সহযোগীকে বললেন যে যন্ত্রটি মৃতব্যক্তি ছাড়া অন্য কারও হাতে ছিল, তখনও কি আপনি ভেবে দেখেছিলেন যে আপনার পক্ষে সে প্রশ্নের জবাব দেওয়াও শক্ত ছিল, যে হেতু আপনি সে সময় উপস্থিত ছিলেন না ?

সাক্ষী নীরব।

—আমি প্রশ্ন করছি যে আপনার মতে এ ঘটনা ঘটনা সম্ভব কিনা ?

—অসম্ভব নাও হতে পারে।

—সে ক্ষেত্রে আগরওয়ালের দেহের চাপে হস্তচ্যুত সেই রিভলভারটি ফায়ার্ড হয়ে যেতে পারত ?

—তা পারত।

—এবার বিশেষজ্ঞ হিসাবে বলুন, সে ক্ষেত্রে গুলি মৃতের পৃষ্ঠদেশ ভেদ করতে পারত কি ?

—তা পারত।

—এবং সে ক্ষেত্রে ফায়ার্ড হওয়ার মুহূর্তে রিভলভারটি কারও হাতে থাকত না ?

—না, তা থাকত না !

—অথচ আপনি নিঃসন্দেহ যে ফায়ার হওয়ার মুহূর্তে আগ্নেয়াস্ত্রটি মৃত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারও ‘হাতে’ ছিল ?

—না, মানে—

—মানে কিছু নেই। আপনি নিঃসন্দেহ কি না। ই্যা, না, না ?

—না।

—অথচ বিশেষজ্ঞ হিসাবে আপনি হজপ করে একটু আগেই বলেছেন যে আপনি নিঃসন্দেহ, কেমন ?

সাক্ষী নিরুত্তর।

—আপনি আমার প্রশ্নের জবাব দিন।

—আমি ভুল বলেছিলাম।

—বিশেষজ্ঞ হিসাবে আর কি কি ভুল উত্তর দিয়েছেন আপনি?

সাক্ষীর মুখ-চোখ লাল হয়ে ওঠে।

—অবজেক্সমান য়োর অনার! জেরার পদ্ধতিতে আমার আপত্তি। বলেন মাইতি।

অবজেক্সমান মাসটেইন্ড। আপনি অন্ত প্রশ্ন করুন।

—আচ্ছা ডাক্তার সান্তাল, আপনি বিশেষজ্ঞ হিসাবে নিশ্চয় জানেন যে আগ্নেয়াস্ত্র থেকে আহতের দূরত্ব যদি মাত্র দু-চার ইঞ্চি হয় তাহলে আঘাত চিহ্নের কাছে বল্গে যায়, যাকে ইংরাজিতে বলে 'চার্ড' হয়ে যাওয়া? বাকুদের চিহ্নও তার চামড়া ও জামায় থাকার কথা?

—ই্যা জানি।

—এক্ষেত্রে মৃতের দেহের চামড়ায় অথবা কোটে সে রকম কোন চিহ্ন ছিল কি?

—না।

—বিশেষজ্ঞ হিসাবে তা থেকে আপনার এই অনুসিদ্ধান্তই করা উচিত নয় কি, যে আগরওয়ারলের দেহের চাপে রিভলভারটা ফায়ার্ড হয়ে যায় নি?

—আজ্ঞে ই্যা।

—অথচ আমি যখন প্রশ্ন করলাম যে এভাবে পিছন থেকে মৃতদেহে গুলি প্রবেশ করা সম্ভব কিনা, তখন আপনি জবাবে বললেন যে সম্ভবপর!

সাক্ষী এবারও নিরুত্তর।

—এটাও বিশেষজ্ঞ হিসাবে আপনার ভুল উত্তর, তাই নয়?

—অবজেক্সমান য়োর অনার। উনি ধমক দিচ্ছেন!

—অবজেক্সমান মাসটেইন্ড!

আমার জেরা এখানেই শেষ।

বাসুসাহেব আসন গ্রহণ করা মাত্র অরুপরতন তাঁর কাছে সরে এসে নিয়ন্ত্রণে বলে, এটা আপনি কি করলেন স্যার? এরপর পিছন থেকে গুলিবিদ্ধ হওয়ার কী যুক্তি দেখাব আমরা?

বাসুসাহেব চোখ থেকে চশমাটা খুলে বলেন, ভুল করলাম, না?

অরুণ কি জবাব দেবে ভেবে পায় না। বুদ্ধের প্রতি যে প্রগাঢ় আস্থা

নিষে এ আদালতে সে এসেছিল সে আহা অনেকাংশে কমে যায়। বৃদ্ধ হয়ে গেছেন বাবুসাহেব। যুক্তির পারস্পর্য আর তাঁর ঠিক থাকছে না।

মাইতি তাঁর পরবর্তী সাক্ষীকে আহ্বান করেন অতঃপর।

করিডোরে দ্বিতীয় সাক্ষীর নাম ঘোষিত হল।

অনতিবিলম্বে মিঃ জিভেন বসাক এসে সাক্ষীর মধ্যে উঠে দাঁড়ালেন। ডান হাত তুলে যথারীতি শপথ বাক্য উচ্চারণ করেন। ব্যালিসটিক বিভাগের সরকারী অফিসার লেফটেন্যান্ট জিভেন বসাকের নাম, অভিজ্ঞতা ইত্যাদির সম্বন্ধে প্রাথমিক প্রশ্নাদি শেষ করে মাইতি প্রশ্ন করেন, মৃত ময়ূরকেতন আগরওয়ালের হাতে যে রিভলবারটি পাওয়া গেছে তা কি আপনি পরীক্ষা করে দেখেছেন?

—হ্যাঁ।

—তাতে কারও আঙ্গুলের ছাপ পাওয়া গেছে কি?

—একমাত্র আগরওয়ালের আঙ্গুলের ছাপ পাওয়া গেছে। আর কারও নয়।

—রিভলবারটি কি জাতীয়?

—এটি একটি স্যানিস রিভলবার। তৈরী করেছেন, মেসার্স রুবি এ্যাণ্ড কোং। এটার ৩৮ ক্যালিবারের বোর।

সাক্ষী রিভলবারটির নম্বর মিলিয়ে সেটি সনাক্ত করেন। বাবুসাহেবের অনুমতি নিয়ে মাইতি সেটাকে দুই নম্বর এক্সিবিট হিসাবে নথীভুক্ত করলেন।

—মৃত ময়ূরকেতন আগরওয়ালের দেহ ব্যবচ্ছেদের সময় তার হৃদপিণ্ডে যে বুলেটটি পাওয়া গেছে সেটিও কি আপনি পরীক্ষা করে দেখেছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আপনার কি বিশ্বাস ঐ এক নম্বর এক্সিবিট বুলেটটি এই দুই নং এক্সিবিট রিভলবার থেকে ছোঁড়া হয়েছিল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

অবজেক্সমান। উঠে দাঁড়ান বাবুসাহেব। বলেন, সাক্ষী তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথাই বলতে পারেন, তাঁর বিশ্বাস অবিশ্বাস কোন এভিডেন্স নয়।

মাইতিসাহেব তাঁর বিশাল দেহটি নিয়ে ঘুরে দাঁড়ান : সাক্ষী একজন আগেরায়ত্র-বিশেষজ্ঞ। তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছাড়া পরোক্ষ জ্ঞানের উপরে ভিত্তি করে দেওয়া এভিডেন্সও গ্রাহ্য হওয়া উচিত।

—সে ক্ষেত্রে মাননীয় সহযোগীর সওয়াল স্থগিত রেখে, এই পর্ষায়ে আমাকে জেরা করবার অহুমতি আমি আদালতের কাছে প্রার্থনা করি।

মাইতি হেসে বলেন, মাননীয় ডিফেন্স কাউন্সেল পনের বছর পরে কোর্টে আসছেন। তিনি বোধহয় ভুলে গেছেন আমার সওয়াল শেষ না হলে তাঁর জেরা শুরু হতে পারে না—

বাসুসাহেবও হেসে বলেন, মাননীয় পি. পি. পচিশ বছর প্রাকটিশ করেও বোধহয় জানেন না আমার সে অধিকার এক্ষেত্রে আছে।

জাষ্টিস্ ভাহুড়ী কিঞ্চিৎ বিরক্তি প্রকাশ করে বলেন, আপনারা দুজনেই প্রবীণ আইনজীবী। আশা করি আমাকে মনে করিয়ে দিতে হবে না যে আদালত এ জাতীয় ব্যক্তিগত আক্রমণ পছন্দ করেন না।

বাসুসাহেব জাষ্টিস্ ভাহুড়ীকে একটি বাণ্ড করে বলেন, I beg to ask the witness some questions on voir dire, my Lord !

জজসাহেব জুরিদের দিকে ফিরে বলেন, সাক্ষী আগেরোত্তর বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হিসাবে দাবী করতে পারেন কিনা প্রতিবাদী এই পর্ষায়ে সেটা যাচাই করে দেখতে চান। আইনত সে অধিকার তাঁর আছে। আপনাকে অহুমতি দেওয়া গেল।

বাসুসাহেব গম্ভীর হয়ে বলেন, অহুমতি পেয়েছি, কিন্তু আমার অহুযোগ অহুপ্রবেশের পথ আমি পাচ্ছি না !

মাইতি একটু অন্তমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর বিশালবপুতে সাক্ষী প্রায় ঢাকাই পড়ে গিয়েছিল। সসঙ্কোচে মাইতি তার দেহটা সঙ্কচিত করে বাসুসাহেবকে এগিয়ে যেতে দেন। আদালতে যুহু হাসির রোল উঠছিল। জাষ্টিস্ ভাহুড়ী একবার হাতুড়িটা ঠুকলেন।

—আপনি বলেছেন, যে বুলেটে মিস্টার আগরওয়ালের মৃত্যু হয়েছে সেটি ঐ রিভলভার, যা নাকি দু-নম্বর এল্লিবিট হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, সেটা থেকে ছোড়া। এটা আপনার আন্দাজ, বিশ্বাস না স্থির সিদ্ধান্ত ?

—স্থির সিদ্ধান্ত।

—কি যুক্তিতে এই স্থির সিদ্ধান্তে এসেছেন আপনি ?

—বুলেটটি '৩৮ বোর রিভলভারের—

—পৃথিবীতে কি ঐ একটিই '৩৮ বোর রিভলভার আছে ?

—আমি আমার উত্তর শেষ করিনি।

—আমি আমার প্রশ্ন শেষ করেছি। পৃথিবীতে কি ঐ একটি '৩৮ বোর রিভলভার আছে?

—আমি যে আপনার আগের প্রশ্নের জবাব দিইনি।

—আনসায় ইয়েস অর নো! পৃথিবীতে কি ঐ একটিই '৩৮ বোর রিভলভার আছে?

—না।

ধন্যবাদ। আর কি যুক্তিতে আপনি স্থির সিদ্ধান্ত করেছেন ঐ গুলিটি ঐ রিভলভার থেকে নিকৃষ্ট?

—তাই তো বলতে চাইছি। শুধুন; ঐ রিভলভার থেকে একটি টেস্ট বুলেট ছুঁড়ে দেখা হয়েছে। কম্পারিসন মাইক্রোস্কোপের পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে ঐ বুলেট ঐ রিভলভার থেকে ছোঁড়া। রিভলভারটিতে ছয়টা চেম্বার আছে। আর তিনটি খালি ছিল! দুটি খোপে দুটি ডিসচার্জ বুলেট ছিল এবং একটা তাজা বুলেটও ছিল। তাজা বুলেটটা ছিল ট্রিগারের সামনে। অর্থাৎ ট্রিগার টিপলেই ফায়ার হয়ে যাওয়ার কথা। ডিসচার্জড বুলেট দুটি ছিল ক্লক-ওয়ারাইজ সামনে। অর্থাৎ বেশ 'বোঝা' যায় দুবার ফায়ার করা হয়েছিল এবং তৃতীয় একটি তাজা বুলেট ওতে ছিল।

—যে অব্যবহৃত বুলেটটি ছিল আশাকরি সেটাই আপনারা পরীক্ষা কার্বে ব্যবহার করেছেন?

—না তা আমরা করিনি। আমরা আমাদের একটি নিজস্ব বুলেট নিয়ে টেস্ট ফায়ার করে দেখেছিলাম।

—সেই অব্যবহৃত তৃতীয় বুলেটটি দিয়ে পরীক্ষা করা হল না কেন?

—আমরা মনে করেছিলাম, আদালতে এভিডেন্স হিসাবে সেটার প্রয়োজন হতে পারে। সেটি এইটি।

বাহুসাহেব সেই বুলেটটিকে প্রতিবাদী পক্ষের এক্সিবিট হিসাবে নথীবদ্ধ করিয়ে প্রশ্ন করেন, রিভলভার তৈরীর কারখানায় যখন ব্যারেল তৈরী করা হয় তখন সেগুলো কি এক ছাঁচে ঢেলে তৈরী করা হয়, না কামারেরা হাত আন্দাজে তৈরী করে?

ছাঁচে ঢেলেই তৈরী করে।

—আমি যদি ঐ কবি কোম্পানীর ঐ বছরের ঐ মেকের আর একটি

রিভলভার নিয়ে এসে ঐ অব্যবহৃত বুলেটটা ফায়ার করতে চাই, তাহলে তা আমি ফায়ার করতে পারব, না পারব না ?

—পারবেন ।

—তখন যদি আমি আপনাকে সেই রিভলভারটি এবং এল্লিবিট নং দুই রিভলভারটি এনে দিই, আপনি দেখে বলতে পারবেন যে কোন গুলিটা কোন অস্ত্র থেকে নিক্সিত ?

—স্মার, একই কোম্পানীর একই বছরের, একই স্পেসিফিকেশনের—

—বাজে কথা বলবেন না । যা প্রশ্ন করেছি তার জবাব দিন । ইয়া, না, না ?

—না !

—তা সত্ত্বেও আপনার অনুমান নয়, বিশ্বাস নয়, একেবারে হির সিদ্ধান্ত যে ঐ ১নং বুলেটটি ঐ ২নং রিভলভার থেকে নিক্সিত ?

—ইয়া, কারণ ঐ একই কোম্পানীর, একই বছরে, একই মেকের দ্বিতীয় রিভলভার অকুইলে ছিল না ।

—আপনি অকুইলে গিয়ে নিজে খুঁজে দেখেছেন ?

—না আমি নিজে যাইনি, তবে—

—ঐ তবে'টা তো আমি বলব । তবে আপনি কেমন করে হির সিদ্ধান্তে এলেন ?

—না, ওখানে যে ঐ কোম্পানীর, ঐ বছরের ঐ রকম আর একটা রিভলভার ছিল না, এটাতে সবাই জানে ।

—সাক্ষী কে দিচ্ছে ? আপনি না 'সবাই' ?

সাক্ষী নীরব ।

—জবাব দিন, সাক্ষী কে দিচ্ছে ? আপনি না 'সবাই' ?

—মাইতি উঠে দাঁড়ান—ধর্মাবতার, জেরার পদ্ধতিতে আমি আপত্তি জানাচ্ছি । মাননীয় সহযোগী সাক্ষীকে ধমক খাওয়াচ্ছেন ।

বান্ধুসাহেব ঘুরে দাঁড়ান, 'ধমক' জিনিসটা বেবিফুড নয় । ধমক কেউ খাওয়ার না, লোকে ধমক খায় । আমার বক্তব্য, সাক্ষী বিশেষজ্ঞের যত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছেন না । তিনি মনে মনে একটা পূর্বসিদ্ধান্ত করে রেখেছেন এবং তারই ভিত্তিতে সাক্ষ্য দিয়ে চলেছেন ।

বিচারক বলেন, আমি প্রতিবাদীর সঙ্গে একমত । অবজেক্শান ওভারকল্ড্ ; সাক্ষী প্রশ্নের জবাব দিন ।

বাস্তবসাহেব পুনরায় প্রশ্ন করেন, সাক্ষী কে দিচ্ছে ? আপনি না 'সবাই' ?
—আমি ।

বাস্তবসাহেব বিচারকের দিকে ফিরে বলেন, আমার Voir dire শেষ হয়েছে । আমার বিশ্বাস মহামান্য আদালত অনুধাবন করেছেন যে সাক্ষী ঘটনাস্থলে কি ঘটেছিল তার একটা মনগড়া চিত্র এঁকেছেন ; এবং সেই পূর্বসিদ্ধান্তের ভিত্তিতে তিনি সাক্ষ্য দিয়ে চলেছেন । মহামান্য আদালতকে প্রতিবাদীর অনুরোধ সাক্ষীর সমস্ত সাক্ষ্যই নথী থেকে নাকচ করা হ'ক ।

বিচারক বলেন, প্রতিবাদীর এ আবেদন আদালত নামঞ্জুর করছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে আদালত জুরিমহোদয়গণকে একথাও জানিয়ে রাখছেন যে ঘটনাস্থলে কি হয়েছিল, না হয়েছিল বলে সাক্ষী যেসব অবাস্তব কথা বলেছেন, তা অগ্রাহ্য করতে ! আগ্নেয়াস্ত্র ও বুলেটটি সম্বন্ধে যেসব তথ্য তাঁর সাক্ষ্য পাওয়া যায় শুধু তাই গ্রাহ্য করতে । বাকি অংশ আদালতের নথী থেকে নাকচ করবার আদেশও আমি এই সঙ্গে দিচ্ছি ।

বাস্তবসাহেব প্রশ্ন করেন, ঐ ১নং বুলেটটি ২নং রিভলভার থেকে নিক্ষেপ হওয়ার বিষয়ে সাক্ষীর স্থিরসিদ্ধান্ত সমেত নাকচ হবে ?

—নিশ্চয়ই । একথা সাক্ষী জ্ঞানতঃ বলতে পারেন না । সাক্ষী দেখিয়েছেন বুলেটটি '৩৮ ক্যালিবারের, দেখিয়েছেন রিভলভারটিও ঐ বোরের । এর থেকে কি সিদ্ধান্ত হবে তা জুরি-মহোদয়গণ বুঝে নেবেন, সাক্ষী নন !

মাইতি উঠে দাঁড়ান, সবিনয়ে বলেন, আমার মনে হচ্ছে মাননীয় সহযোগী বড় বেশী টেকনিক্যাল হয়ে যাচ্ছেন ।

জাস্টিস ভাহুড়ী তৎক্ষণাৎ বলেন, কিন্তু আদালত মনে করেন, ব্যালাসটিক এক্সপার্ট বড় কম টেকনিক্যাল হয়ে পড়েছিলেন । আদালতের কলিং বহাল থাকবে ।

মাইতির মুখ লাল হয়ে ওঠে । আত্মসম্বরণ করে তিনি বলেন, আমি মনে করি মহামান্য আদালত এভাবে সাক্ষীর বিধিবদ্ধ সাক্ষ্য নাকচ করতে পারেন না এবং আদালতে আলোচ্য অংশের কতটুকু জুরিমহোদয়গণ গ্রহণ করবেন, সে বিবেচনাতে হস্তক্ষেপ করাও আদালতের অধিকার বহির্ভূত ।

জাস্টিস ভাহুড়ী চোখ থেকে চশমাটা খুলে ফেলেন, একটু সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলেন, লুক হিয়ার মিস্টার প্রসিকিউটার আমি সময় সংক্ষেপ করতে চাইছি মাত্র । আদালতের অধিকার সম্বন্ধে যদি আপনার মনে কোন

সংশয় থেকে থাকে তাহলে প্রতিবাদীপক্ষ যে আবেদন করেছেন তা মঞ্জুর করতে আমি বাধ্য হব, এবং এই সাক্ষীর সমস্ত সাক্ষ্যই বিধি বহিস্কৃত বলে নাকচ করে দেব। স্পষ্টতই সাক্ষী একটি পূর্বসিদ্ধান্তের বশবর্তী হয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন।

মাইতি জবাব দেন না।

বিচারক বলেন, যেহেতু Voir dire শেষ হয়েছে, সুতরাং আপনি সাক্ষীকে সওয়াল করতে পারেন।

—আমার আর কিছুই জিজ্ঞাস্য নেই, বলে স্পষ্টত আহত হয়ে আসন গ্রহণ করেন মাইতি-সাহেব।

এরপর বাদীপক্ষ কন্সট্রাকশন এঞ্জিনিয়ার এবং ঠিকাদার কিশোর ডালমিয়ার সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। তা থেকে জানা যায়, আসামীর নাম কৌশিক মিত্র সে শিবপুরের গ্র্যাজুয়েট এঞ্জিনিয়ার। যে নাটকীয় পরিস্থিতিতে এঞ্জিনিয়ার সুরত রায়-চৌধুরীর বাড়িতে দীর্ঘদিন পরে সে বন্ধুর সাক্ষাত পায়, সজ্ঞাতা যেভাবে তাকে হঠাৎ হাজির করে সব কথাই কিশোর জানালো। তারপর আগরওয়াল ইন্সটিটিউটের কেশিয়ারের সাক্ষ্য শ্রমাণ হল আসামী বিশ্বনাথ দাসের ছদ্মনামে এখানে কেমন করে চাকরি করেছে। একমাসের মাহিনাও সে গ্রহণ করেছে রেভিনিউ টিকিটের উপর আকাবাকা অক্ষরে বিশ্বনাথ দাসের নাম সই করে।

বাসুসাহেব ওদের দুজনের কাউকেই কোন জেরা করলেন না।

বিরতির সময় হয়ে এসেছিল। তবু জজ সাহেবের অনুমতি ক্রমে মাইতি তাঁর পরবর্তী সাক্ষীকে তলব করলেন। করিডোরে উচ্চৈশ্বরে ঘোষিত হল—নকুল হই, হাজির?

অনতিবিলম্বে সাক্ষী নকুল হই সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠে দাঁড়ায়। তার পরনে একটি গলাবন্ধ কোট চোখে চশমা, গলায় কম্পাটার। সাক্ষীর শপথ নেওয়া হতেই একজন অল্প বয়সী উকিল এগিয়ে এসে বলে, মহাশয় আদালতকে আমার নিবেদন, আমি ত্রীগণপতি জানা, সাক্ষীর তরফে আমি উকিল হিসাবে নিযুক্ত হয়েছি।

ওকালতনামার কপি সে আদালতে দাখিল করে।

মাইতি তাঁর সওয়ালের প্রারম্ভিক পর্যায়ে নকুল হইয়ের নাম ধাম, পরিচয় ইত্যাদি প্রথাহুযায়ী প্রতিষ্ঠিত করে প্রশ্ন করেন, গত সাতই নভেম্বর রাজি নরটা থেকে সাড়ে নয়টার ভিতর আপনি কোথায় ছিলেন?

—অবজেক্‌মান য়োর অনার! তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ায় গণপতি জানা। বলে, মাননীয় সহযোগীর প্রশ্ন অবৈধ। রাত্রি নয়টা থেকে সাড়ে নয়টার ভিতর একটা লোক একাধিক স্থানে থাকতে পারে। ‘কোথায় কোথায় ছিলেন’ জিজ্ঞাসা করেন নি উনি, প্রশ্ন করেছেন ‘কোথায় ছিলেন!’

—আপত্তি গ্রাহ্য হল।

মাইতি হেসে বলেন, গত সাতই নভেম্বর সন্ধ্যার পর আপনি আপনার নিয়োগকর্তার আদেশে বাগানবাড়ী থেকে এক বোতল মদ কিনতে শহরে আসেন, এ কথা কি সত্য?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আপনি মদের বোতল কিনে নিয়ে আবার বাগানবাড়িতে যখন ফিরে যান তখন কত রাত্রি?

—আমি ঠিক নয়টা বারো মিনিটে বাগানবাড়িতে ফিরে যাই।

—রাত ঠিক নয়টা বারো মিনিট তা কেমন করে জানলেন?

—আজ্ঞে আমার সাইকেলটা পাকার হয়ে যাওয়ায় ফিরতে বেশ দেরী হয়েছিল। আমার মালিক ছিলেন রাগি মানুষ, তাই কত দেরী হয়েছে দেখবার জন্য সাইকেল থেকে নেমেই আমি ঘড়ি দেখি।

—তারপর কি হল বলে যান।

—সাইকেলটা গাছের গায়ে রাখতে গিয়ে দেখি সেখানে আর একখানা সাইকেল রয়েছে। কার তা জানবার জন্য আমি চৌকিদার কাদের আলির ঘরের দিকে যাই। কিন্তু অতদূর পৌছানোর আগেই বাড়লোর দিক থেকে স্ফুজাতা দেবী চিৎকার করে ওঠেন। আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ি। পিছন ফিরে দেখতে পেলাম আনামী বিশ্বনাথ দাস, গুরুত্বপূর্ণ মিত্র একটা রিভলভার আমার মালিকের দিকে উত্তত করে তুলেছে, আর মালিক ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসছেন। তখনই বুঝতে পারলাম ঐ নৃশংস দৃশ্য দেখেই স্ফুজাতা দেবী চিৎকার করে উঠেছিলেন—

—আপনি কি বুঝতে পারলেন তা আমরা শুনতে চাই না, আপনি কি দেখলেন, কি শুনলেন শুধু তাই বলুন।

—আমি দেখলাম হুজুর, প্রাণভয়ে আগরওয়াল সাহেব ঘর ছেড়ে ছুটে পালাচ্ছেন, কিন্তু তিনি চোকাঠ পর্বত পৌছাবার আগেই শুনলাম একটা গর্জন। মালিক চোকাঠের উপর মুখ খুবড়ে পড়ে গেলেন—

—লায়ার !

সমস্ত আদালত চম্কে ওঠে এ গর্জনে। সকলের দৃষ্টি চলে যায় আসামীর কাঠগড়ার দিকে। আসামী কাঠগড়ার কাঠখানা হুহাতে চেপে ধরে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। তার চোখ দিয়ে আগুন ছুটছে। একজন কলগেটবল ছুটে এগিয়ে যায় তার দিকে।

আদালতে যে মুহু গুল্লন উঠেছিল তা হয়তো অচিরেই মিলিয়ে যেত, কিন্তু ঠিক সেই মুহুর্তেই সাক্ষীদের কক্ষে একজন মহিলা যুঁহিতা হয়ে পড়েছেন এ খবর বিদ্যুৎগতিতে প্রচারিত হওয়ায় আদালত কক্ষে কলগুল্লন শুরু হয়ে যায়। সকলেই উঠে দাঁড়িয়ে দেখতে চায়। কী ব্যাপার।

জাষ্টিস্ ভাহুড়ী দাঁড়িয়ে উঠে বলেন, আপনারা যে যার আসনে বসে পড়ুন। একটি মহিলা যুঁহিতা হয়ে পড়েছেন।

যুঁহিতা স্জাতাকে ধরাধরি করে দুজন স্বেচ্ছাসেবক আদালত কক্ষ থেকে বার করে নিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই বিচারক ঘোষণা করলেন—আদালতের বিরতি হল।

॥ একুশ ॥

আদালত থেকে বাইরে এসে অরূপরতন বললে, আপনি আমাদের বাড়িতেই চলুন, আমাদের ওখানেই কিছু বিশ্রাম করে বাড়ি যাবেন। গাড়িতে যেতে মিনিট পাঁচেকও লাগবেনা। বাবাও তাই বলে পাঠিয়েছেন।

—স্জাতা কোথায় ?

—আমাদের বাড়িতেই পাঠিয়ে দিয়েছি। তার জ্ঞান হয়েছে।

—চল তবে।

গাড়িটা আদালতের অনতিদূরে জীমূতবাহন মহাপাত্রের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়। গৃহস্থামী এগিয়ে এসে বলেন, আহুন, আহুন।

লাঠি ঠুক ঠুক করতে করতে জীমূতবাহনের বৈঠকখানায় এসে বাহুসাহেব দেখতে পেলেন একটা ইজি চেয়ারে অর্ধ যুঁহিতার মত স্জাতা বসে আছে। বাহুসাহেব গাউনটা খুলে একটা সোফার উপর রাখলেন।

—কি খাবেন বলুন ? প্রস্ন করে অরুণরতন ।

—খাবার আমার গাড়িতে আছে, ড্রাইভারকে বল ।

—সে কি হয় ?

—উপায় নেই ভায়া । যথেষ্ট বয়স হয়েছে, বাঁধা ভায়েটে আছি । তবে কিছু না খাওয়ালে ভোমারও হয়তো খারাপ লাগবে । এক কাপ র‍্যাক-কফি খাওয়াও । দুধ-চিনি ছাড়া ।

জীমুতবাহন হাত দুটি জোড় করে অতি বিনয়ের একটা অভিব্যক্তি করে বলেন, বাসুসাহেব, আমি শুনেছি আদালতে একেবারে শেষ পর্যায়ে নাটকীয় কিছু ঘটেছে । আপনি নিশ্চয় এখন আপনার মক্কেলের সঙ্গে নিভৃতে দুটো কথা বলতে চান । তাই আপনাদের একা রেখে আমি চলে যাচ্ছি, কিছু মনে করবেন না ।

জীমুতবাহন দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে গেলেন ।

অরুণরতন তৎক্ষণাৎ বলে, বলুন স্যার, এখন কি কর্তব্য ? নকুল হই একেবারে অস্ত্র সুরে কথা বলছে কেন ?

বাসুসাহেব স্নান হেসে বলেন, তুমি সবে প্র্যাকটিশ শুরু করেছ, আর আমি প্র্যাকটিশ ছেড়ে দিয়েছি ! এ বুড়োর অভিজ্ঞতা থেকে একটা কথা শুনবে অরুণ ?

—বলুন বলুন ?

—এটাই এ জীবিকার ট্রাজেডি !

—কোনটা ?

—আমার আটাত্তর বছর বয়স হল । এ জীবনে অসংখ্য ডাক্তারকে আমি বলতে শুনেছি, ‘আহা কগী যদি এই উপসর্গগুলো আমার কাছে গোপন না করত !’ অসংখ্য এঞ্জিনিয়ারকে আমি বলতে শুনেছি ‘কী দুঃখের কথা, ক্লারেন্ট যদি ঘুণাকরেও জানাতো যে সে এতটাকা এ বাড়িতে ঢালবে, তাহলে এভাবে প্লানই করতাম না আমি ।’ আর অসংখ্যবার আদালত থেকে ফিরে এসে নিজের মনে বলেছি, ‘আমার মক্কেল যদি প্রথমেই আমাকে আত্মপ্রাস্ত সমস্ত সত্যকথা বলত, তাহলে এ কেস আমি হারতাম না ।’

অরুণ কী জবাব দেবে ভেবে পার না । আড়চোখে সে একবার স্নজাতার দিকে তাকায় । আচ্ছরের মত পড়েছিল সে, কিন্তু এর পর সে উঠে বসে । কক্ষ চুলগুলো চোখের উপর থেকে সরিয়ে দিয়ে বলে, আপনি এ অভিযোগ

করতে পারেন। হ্যাঁ, আমি সত্য গোপন করেছিলাম। কিন্তু আমি যা চেয়েছিলাম, তা হল না! আপনি কি এরপর আমার কথা ভাববেন, না এখানেই ত্যাগ করবেন আমাকে?

বাহুসাহেব বলেন, এ পর্যন্ত নতুন কথা তুমি কিছুই বলনি স্জাতা। তুমি সত্য গোপন করছ একথা জেনেই তোমার কেস হাতে নিয়েছি। পনের বছর পরে ঐ জামাটা আজ আবার গায়ে চড়িয়েছি। তুমি যদি এখনও সব কথা খুলে বল, আমার খুব সুবিধা হয়। আমি নতুন করে চেষ্টা করতে পারি।

নতুন করে চেষ্টা করার আর কিছু নেই দাছ। যা হবার তা সব শেষ হয়ে গেছে। এখন আর কিছু করা যাবে না। তবু সব কথাই আপনাকে বলব আমি—

—বল!

—কী ভাবে বলব বুঝতে পারছি না।

—আমি প্রশ্ন করছি, তুমি উত্তর দিয়ে যাও। কোশিকের সঙ্গে ধাতাধতি করবার সময় আচম্কা গুলি ছুটে যায় নি, তাইত?

মুখটা নিচু করে স্জাতা বলে, হ্যাঁ।

—এবং রিভলভারটা মৃত আগরওয়ালের হাতে গুঁজে দেওয়া হয়েছিল, কোশিকই দিয়েছে ফিদার প্রিন্ট মুছে নিয়ে। ঠিক বলেছি?

—বলছেন। বললে স্জাতা!

কোশিককে বাঁচাবার জন্যই মিথ্যা এজাহার দিয়েছিলে তুমি, নয়?

এবার মুখ তুলে স্জাতা বলে, না।

—না? তাহলে?

আমাকে বাঁচাবার জন্য কোশিকই মিথ্যা এজাহার দিয়েছে!

—তার মানে?

হুহাতে মুখ ঢেকে বসে থাকে স্জাতা!

অরুপরতন বলে ওঠে, তার মানে—, তার মানে কি?

মুখ থেকে হাত দুটি সরিয়ে নেয় স্জাতা। স্থির দৃষ্টিতে তাকায় বাহুসাহেবের দিকে। তার চোখ দুটো জলছে। প্রতিটি কথা স্পষ্ট উচ্চারণ করে বলে হ্যাঁ তাই! কোশিক নয়, আমিই গুলি করেছিলাম।

কী বলছেন আপনি? উঠে দাঁড়ায় অরুপরতন।

বাহুসাহেব ইজি চেয়ারে এলিয়ে পড়েন। চোখ দুটি বোজা।

মিনিটখানেক কেউ কোন কথা বলে না। তারপর শান্ত নিরুদ্বেগ কণ্ঠে বাহুসাহেব বলেন, সময় খুব কম সূজাতা, এখনই গিয়ে নকুলকে ক্রশ-এগজামিন করতে হবে। সংক্ষেপে সব কথা বলে যাও।

—বলার তো আর বাকি নেই কিছু। প্রায় সমস্তটাই আপনাকে ঠিক বলেছিলাম। শেষের দিকে আমার চড় খেয়ে আগরওয়াল থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। তার তখন খেয়াল হয় দরজাটা হাট করে খোলা। দরজাটা বন্ধ করবার জন্যে সেদিকে এগিয়ে যেতেই আমি টেবিলটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। তুলে নিই রিভলভারটা। দরজাটা আর সে বন্ধ করতে পারে না। আগরওয়াল চৌকাঠের কাছে পৌঁছে ঘুবে দাঁড়ায়। সেখান থেকেই বলে, ছেলেমানুষী করনা সূজাতা, ওটা লোডেড।

ততক্ষণে আমি যন্ত্রটা উত্তত করে তুলে ধরেছি। বললাম, দরজা থেকে সরে দাঁড়ান, আমাকে ধরবার চেষ্টা করলেই আমি গুলি করব। আগরওয়াল তখন বলে, তোমার হাত কাঁপছে। তুমি আমার গুলি করতে পার না, পারবে না। একটা মানুষকে তুমি কিছুতেই খুন করতে পার না, সূজাতা! খুন—ফাঁসি, —তুমি মায়ের জাত!

আমি লক্ষ্য করতে থাকি, কথা বলতে বলতে ময়ুরকেতন পায়ে পায়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। বেশ বুঝতে পারি তার উদ্দেশ্য! তাই চীৎকার করে উঠি—সরে দাঁড়ান, আর এগিয়ে আসবেন না, আমি—আমি কিন্তু এবার গুলি করব!

কিন্তু আমার সাবধানবাণী অগ্রাহ করে সে আরও এগিয়ে এল। সত্যিই তখন আমার হাত থরথর করে কাঁপছিল। আমার মনে হল, পরমুহূর্তেই সে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। মর্দিনিয়া হয়ে আমি ট্রিগার টিপে দিয়েছিলাম!

ছু-হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে থাকে সূজাতা! অঝোর ধারায়!

বাহু-সাহেব এগিয়ে আসেন। একটা হাত রাখেন তার মাথার উপর। বলেন, আত্মরক্ষার জন্য তুমি যা করেছ ঠিকই করেছ সূজাতা! কিন্তু তারপর? তারপর কি হল, বল আমাকে।

অশ্রুসিক্ত মুখটা তুলে সূজাতা বলে, ট্রিগার টিপবার পরেই আমার বোধহয় বাহুজ্ঞান লুপ্ত হয়েছিল। প্রচণ্ড শব্দ হল একটা! না, একটা নয় দুটো! আমার আঙ্গুলগুলো এমন থর থর করে কাঁপছিল যে দ্বিতীয়বার আপনা থেকেই ফায়ার হয়ে গেল! আমি সজ্ঞানে দ্বিতীয়বার গুলি ছুঁড়িনি।

—জাস্ট এ মিনিট । ছবার ফারার হয়েছে কেমন করে বুঝলে ? যত্নের
দেহে তো একটিই আঘাত চিহ্ন পাওয়া গেছে !

দ্বিতীয়বার ফারার হতে আমি নিজের কানে শুনলাম । তাছাড়া
রিভলবারেও দু-দুটো ডিসচার্জড বুলেট ! দ্বিতীয় গুলিটি বোধহয় খোলা দরজা
দিয়ে বেরিয়ে যায় ।

—বুঝলাম । তারপর ?

মিনিটখানেক থরথর করে কেঁপেছিলাম আমি । তারপর সজ্জিত ফিরে
পেয়ে দেখি, চৌকাঠের উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছেন আগরওয়াল । রক্তে
ভেসে যাচ্ছে ঘরটা । যত্নের দেহের পাশে একটা মদের বোতল নামানো আছে,
আর নকুল ছই ঝুঁকে ঠুঁকে পরীক্ষা করছে ।

অরূপ বলে ওঠে, সেকি তখনও কোশিকবাবু আসেনই নি ?

—না, নকুল ঠুঁকে পরীক্ষা করে উঠে দাঁড়ালো । আমার দিকে ফিরে
বললে, একেবারে খুন করে ফেললেন ? খুন ! আমি মরিয়া হয়ে বললাম,
দরজা থেকে সরে দাঁড়ান । না হলে আবার গুলি করব আমি । নকুল উন্মত্তের
মত ছুটে এল আমার দিকে ; ই্যা, আমি তাকেও গুলি করতে গিয়েছিলাম,
কিন্তু তার আগেই সে আমার হাত চেপে ধরল !

বাসু সাহেব উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে ওঠেন, বলেন—স্ট্রেঞ্জ !

অরূপ সে কথার কান না দিয়ে বলে, তারপর ?

স্বজাতা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, বললে—আমার হাত থেকে অস্ত্রটা ছিনিয়ে
নিল সে । আমি দু-হাতে মুখ ঢেকে খাটের উপর বসে পড়লাম । তার পর
আমাদের কী কী কথা হয়েছিল ঠিক মনে নেই । আমি একেবারে নার্ভান
হয়ে পড়েছিলাম । একবার বোধহয় জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আগরওয়াল বেঁচে
আছে কিনা । ও বলেছিল, না । ঠিক এই সময়েই এসে পড়ে কোশিক ।
সেও অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে । নকুল সমস্ত সত্য ঘটনা কোশিককে খুলে
বলে । কোশিকই তখন উপায় বাতলায় । বলে, আমার পক্ষে আগরওয়ালের
সঙ্গে ধস্তাধস্তি করার সময় গুলি ছুটে যাওয়ার কাহিনীটা বিশ্বাসযোগ্য হবে
না । সেই ঐ মনগড়া কাহিনীটা তৈরী করে । নকুল প্রথমটা মিথ্যা সাক্ষ্য
দিতে রাজি হয় নি । শেষ পর্যন্ত এই সর্তে রাজি হয় যে, তাকে মগদে দশ
হাজার টাকা আমাকে দিতে হবে । হির হর নকুল বলবে যে, সে স্বচক্ষে
দেখেছে যে মারামারি হওয়ার সময় রিভলভারটা আগরওয়ালের হাতে ছিল ।

এর কিছু পরে কাদেরআলি এসে উপস্থিত হয়। স্তম্ভ অহুয়ারী নকুল তাকেও বলে মারামারির সময় আচমকা গুলি ছুটে যায়। এরপর কাদেরআলি লাইকেলে করে থানায় যায়। পুলিশের সামনেও নকুল স্তম্ভ অহুয়ারীই তার এজাহার দিয়েছিল। কিন্তু আদালতে দাঁড়িয়ে হঠাৎ এমন মনগড়া কাহিনী সে কেন বলল, তা আমি বিন্দু-বিসর্গও বুঝতে পারিনি।

অরুণ বলে, আমার মনে হয়—

বাধা দিয়ে বাহুসাহেব বলেন, না আর নয়, এবার আমাদের উঠতে হবে। তোমার বাবাকে একবার ডাক তো অরুণ।

জীমূতবাহন এলে বাহুসাহেব বলেন, আপনাকে একটা উপকার করতে হবে।

—বলুন বলুন।

—আগরওয়ালের মৃত্যু উপলক্ষ্যে কাল মিউনিসিপ্যালিটিতে যে শোকসভা হয়েছিল, তাতে আপনি সভাপতি ছিলেন, নয় ?

—হ্যাঁ।

—টেবিলের উপর আগরওয়ালের যে প্রমাণ-সাইজ ফটোখানা ছিল, ওটা আগরওয়াল ইণ্ডাস্ট্রিস থেকে আনানো হয়েছিল নিশ্চয়।

—হ্যাঁ, কেন বলুন তো ?

—আপনি আজ সন্ধ্যার পর নকুলকে ফোন করে সেই ছবিখানা আর একবার আনিয়ে নেবেন। আমি চেয়েছি তখন তা বলবেন না। এনে ছবিটা আমাকে পাঠিয়ে দেবেন ; এবং তারপর নকুলকে আবার ফোন করে জানাবেন যে ছবিটা আমি আপনার কাছে চাওয়াতে ওটা আপনি আমাকে দিয়েছেন ; বলবেন, আগামী কাল আদালতে সেটা আমি ফেরত দেব, কেমন ?

—হঠাৎ এ অদ্ভুত আদেশ ?

—আদেশ নয়, অহুরোধ। আপনি স্বজাতাকে স্নেহ করেন, সেই দাবীতে।

—আপনি নিশ্চিত থাকুন। আপনার এ আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হবে।

—ধন্যবাদ !

॥ বাইশ ॥

পরদিন আদালত শুরু হতেই অসমাপ্ত সাক্ষ্য দিতে নকুল হই কাঠগড়ায় উঠে দাঁড়ায়। পাবলিক প্রসিকিউটর সাক্ষীকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, পূর্বদিন শপথ নেওয়া আছে বলে তাকে আর নতুন করে শপথ নিতে হচ্ছে না। কিন্তু সে যা এখন বলবে তা সে হালফ নিয়েই বলবে।

নকুল মাথা নেড়ে বলে, বুঝছি হজুর, সত্য ছাড়া মিথ্যা বলব না।

—বেশ, এখন বলুন, কাল আপনি বলেছিলেন—খোলা দরজা দিয়ে আপনি দেখতে পেলেন যে আসামী বিশ্বনাথ দাস ওরফে কৌশিক মিত্র একটি রিতভাঙার উদ্ভাত করে আছে, আর প্রাণভয়ে আগরওয়ালা ছুটে পালাচ্ছে; কিন্তু চৌকাঠের কাছে পৌছবার আগেই কৌশিক তাকে গুলিবিদ্ধ করে।

—অবজেক্‌সন য়োর অনার। উঠে দাঁড়ায় অরূপ, বলে, সাক্ষী গতকাল এ কথা বলেন নি। আমি অনুরোধ করি গতকাল তাঁর সাক্ষ্যের ঐ অংশটা যেভাবে নথীবদ্ধ হয়েছে তা পড়ে শোনানো হক।

বিচারকের নির্দেশে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী নথীপত্র দেখে পড়ে যায় :

“প্রশ্ন : আপনি কি বুঝতে পারলেন তা আমরা শুনতে চাই না। আপনি কি দেখলেন, কি শুনলেন তাই বলুন।

‘উত্তর : আমি দেখলাম, হজুর, প্রাণভয়ে আগরওয়ালাসাহেব ঘর ছেড়ে ছুটে পালাচ্ছেন, কিন্তু তিনি চৌকাঠ পর্যন্ত পৌছবার আগেই শুনলাম একটা পিস্তলের গর্জন। মালিক চৌকাঠের উপর মুখ খুবড়ে পড়ে গেলেন—”

মাইতি বলেন, ঠিক কথা। আপনি আসামীর হাতের পিস্তলটা গর্জন করে উঠতে শুনেছেন, সেই সঙ্গে—

—অবজেক্‌সন য়োর অনার। আবার উঠে দাঁড়ায় অরূপ। বলে, সাক্ষী বলেছেন ‘একটা পিস্তলের গর্জন’; মাননীয় সহযোগী সেটাকে ‘আসামীর হাতের পিস্তলের গর্জন’ নামে উল্লেখ করে লীডার কোন্‌সেন করছেন।

—অবজেক্‌সন সারটেও।

মাইতি হেসে বলেন, বেশ, আপনি ‘একটা’ পিস্তলের গর্জন শুনতে

পেলেন। সেইসঙ্গে কি আসামীর হাতের পিঁতল থেকে আগুন বা ধোঁয়া
বের হতে দেখেছিলেন ?

—আজ্ঞে না হজুর। অতদূর থেকে তা আমি দেখিনি।

—কতদূর হবে সেটা ? আপনি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখান থেকে ?

—তা বিশ-পঁচিশ হাত হবে হজুর।

—ঘরে তখন আলো কি ছিল ?

—পেট্রোম্যাক্স জ্বলছিল।

—তবু আপনি আগুন বা ধোঁয়া দেখেন নি ?

—আজ্ঞে না। যা দেখিনি তা বলব কেন ?

—ঠিকই তো। কোশিকের রিভলভার থেকে আগরওয়ালের দূরত্ব তখন
কতটা হবে ?

—হাত চারেক হবে হজুর।

—গুলির শব্দটা যখন শোনে তখন কি আগরওয়াল পিছন ফিরে
ছিল ?

—আমার দিকে সম্মুখ ফিরে ছিল হজুর, আসামীর দিকে পিছন ফিরে
তখন তিনি ছুটে পালাচ্ছিলেন যে।

—আচ্ছা নকুলবাবু, যে কথা আপনি আদালতকে এইমাত্র বললেন, ঠিক
এই কথাই কি আপনি তদন্তকারী অফিসার রমেন গুহকে ঘটনার রাতে
বলেছিলেন ?

—অবজেকসন, য়োর অনার ! আসন ছেড়ে লাফিয়ে ওঠে গণপতি জানা।
বলে, তদন্তকারী অফিসার রমেন গুহের সম্মুখে আমার মক্কেল ঘটনার রাতে
যে এজাহার দিয়েছিলেন, এ মামলার তা গ্রাহ্য হতে পারে না। এ প্রশ্ন
ইনকম্পিট্যান্ট, ইরেলিভ্যান্ট এবং ইম্পেটিরিয়াল !

জাষ্টিস্ ভাট্‌টী বলেন, কেন ? তদন্তকারী অফিসার কি সাক্ষীকে সে
রাতে জানাননি যে তাঁর জবানবন্দী প্রয়োজনবোধে কোন আদালতে এভিডেন্স
হিসাবে গ্রাহ্য হতে পারে ?

গণপতি বলে, এ প্রশ্ন আমার মক্কেলকে জিজ্ঞাসা করুন ধর্মাবতার !

নকুল হাত দুটি জোড় করে বলে, না ধর্মাবতার। তিনি স্বেচ্ছাতা দেবীকে
এবং আসামীকে ঐ কথা বলেছিলেন, আমার বক্তব্য শোনার আগে সে কথা
তিনি বলেন নি।

—কিন্তু আপনার সামনেই তো তিনি ওদের দুজনকে সাবধান করেছিলেন এ থেকে আপনার বোকা উচিত ছিল, যে আপনার জবানবন্দীও প্রয়োজন বোধে যামলার ব্যবহৃত হতে পারে।

—মাগ করবেন ধর্মাবতার, তা ঠিক ঘটেনি। দারোগাবাবু সবার আগে আমাকে প্রশ্ন করেন। তারপরে ওদের বলেন, ‘আপনারা যা বলবেন, তা প্রয়োজনবোধে আদালতে পেশ করা হবে।’ আমাকে উনি কোনভাবেই সাবধান করে দেননি ধর্মাবতার। ঠেকেই জিজ্ঞাসা করে দেখুন।

জাষ্টিস ভাড়াড়ী ক্লিং দেন : এ ক্ষেত্রে যতক্ষণ না তদন্তকারী অফিসারের সাক্ষ্য অথবা ঘটনাস্থলে উপস্থিত অপর দুজনের সাক্ষ্য প্রমাণিত হচ্ছে যে তদন্তকারী অফিসার বর্তমান সাক্ষীকে তাঁর সাংবিধানিক অধিকার সম্বন্ধে পূর্বেই অবহিত করেছিলেন ততক্ষণ এ প্রশ্ন অবৈধ ! অবজেক্শন সাস্টেইনড !

মাইতি বাসুনাহেবের দিকে তাকিয়ে য়ু হাসলেন, তারপর বললেন, অগত্যা এ প্রশ্ন আর এ আদালতে উঠতে পারে না ! আচ্ছা নকুলবাবু, সূজাতাদেবী কি তদন্তকারী অফিসারকে কি ঘটেছিল তা বলতে প্রথমে অস্বীকার করেন ?

আবার অরূপ উঠে দাঁড়ায়, অবজেক্শন য়োর অনার ! এ প্রশ্ন ‘হেয়ার সে’। তদন্তকারী অফিসার এবং সূজাতাদেবী উভয়েই আদালতে উপস্থিত। এ প্রশ্নের জবাব তাঁরাই দেবেন।

—অবজেক্শন সাস্টেইনড !

মাইতি একটি অভিবাদন করে বলেন, ধর্মাবতার, আদালত যদি অনুমতি করেন, তাহলে এক্ষেত্রে বর্তমান সাক্ষীকে সাময়িকভাবে অপসারণ করে আমি তদন্তকারী অফিসারের সাক্ষ্য গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। তাহলে ঘটনার পারস্পর্য বুঝতে আমাদের সুবিধা হবে।

বিচারক বলেন, আদালতের এতে আপত্তি নেই, প্রতিবাদী অবশ্য ইচ্ছা করলে এই পর্যায়ে বর্তমান সাক্ষী এ পর্যন্ত যেসব ডাইরেক্ট এভিডেন্স দিয়েছেন তার উপর জেরা করতে পারেন।

বাসুনাহেব বলে ওঠেন—আমরা বর্তমান সাক্ষীকে বর্তমানে জেরা করছি না। সাক্ষীর সাক্ষ্য শেষ হলেই আমরা জেরা করব। যদি বাদীপক্ষ বর্তমান সাক্ষীকে পুনরায় না আহ্বান করেন, তাহলেও তাঁকে জেরা করবার অধিকার আমরা যত্নে রাখছি।

তদন্তকারী অফিসার রমেন দারোগা অতঃপর সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠে শপথ গ্রহণ করেন। নকুল হইয়ের সঙ্গে তার উকিল গণপতি নিয়ন্ত্রণে কি যেন আলোচনা করতে থাকে। অরূপরতন খবরের কাগজে জড়ানো একখানা প্রকাণ্ড ছবি হাতে এগিয়ে আসে। নকুলের দিকে সেটা বাড়িয়ে ধরে কিছু বলতে যায়, কিন্তু তার আগেই বাহুসাহেব তাকে ধমক দিয়ে ওঠেন, ও কি? ফটোটোর কাজ তো এখনও শেষ হয়নি। আমাকে না বলে ওটা ফেরত দিচ্ছ কেন?

অরূপ ফিরে আসে আবার।

গণপতি বলে, কার ফটো ওখানা?

অরূপ জবাব দেয় না। নকুল নিয়ন্ত্রণে তাকে কি যেন বলে।

এদিকে মাইতি মশাই ততক্ষণে রমেন গুহের পরিচয় ও ঘটনার রাত্রে তার তদন্তের বিষয়ে প্রাথমিক প্রশ্নাদি শেষ করে জিজ্ঞাসা করেন, এ কথা কি ঠিক যে অকুহলে কি ঘটেছিল তা জানবার জন্য আপনি উপস্থিত তিনজনের মধ্যে নকুলবাবুকেই প্রথম প্রশ্ন করেন?

—না, তা ঠিক নয়। আমি তিনজনকেই সাধারণ ভাবে প্রশ্ন করি নকুলবাবুই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে প্রথমে জবাব দেন।

—আপনি কি তার পূর্বে তাঁর সাংবিধানিক অধিকারের কথা জানিয়ে বলেছিলেন যে তাঁর এজাহার আদালতে উত্থাপিত হতে পারে?

—না।

—আসামী এবং সূজাতা দেবীকে সে কথা জানিয়েছিলেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আসামী প্রাথমিক এজাহারে কি বলেছিলেন?

—ঠিক যে কথা তিনি খানায় ফিরে এসে লিখিত জবানবন্দীতে বলেছেন।

—সূজাতা দেবী কি বলেন?

—প্রথমতঃ তিনি তাঁর সলিসিটোরের উপস্থিতি ছাড়া কোন কথা বলতে অস্বীকার করেন। পরে আসামীর অনুরোধে তিনি নকুলবাবুর স্টেটমেন্ট করোবরেট করেন।

—নকুলবাবুর স্টেটমেন্ট না আসামীর?

বাহুসাহেব তৎক্ষণাৎ আপত্তি জানান, বলেন, সহযোগী লীডিং কোন্সেন

করেছে, অনর্থাৎ সাক্ষীর মুখে নিজ প্রয়োজন অনুসারে উত্তর বসিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন।

—আপত্তি গ্রাহ্য হল।

রমেনবাবু নিজের ভুল বুঝতে পারেন, কিন্তু তখন আর উপায় নেই।

মাইতি বলেন, স্জাতা দেবী কি বলেন, তাই বলুন।

—স্জাতা দেবী বলেন, কৌশিকবাবু যা বলছেন তা সব সত্য।

—আচ্ছা মিঃ গুহ, আপনি ইতিপূর্বে বলেছেন আসামীর জামা কাপড় ছিঁড়ে গিয়েছিল, তা আপনি দেখেছেন, কিন্তু আগরওয়ালের পোষাকের কোথাও ছেঁড়া ছিল?

—না।

আগরওয়ালের মাথায় চুল কি অবিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল? মারামারি করতে গেলে যেমন হওয়া স্বাভাবিক?

—না।

—আসামীর মাথায় চুল ঠিক ছিল?

—না, অবিচ্ছিন্ন ছিল।

—ক্রশ এগজামিন, বলে আসন গ্রহণ করেন মাইতি।

বাহুসাহেব এগিয়ে আসেন, বলেন—মিস্টার গুহ, আপনি কত বছর পুলিশে চাকরি করছেন, এবং কত বছরই বা দারোগাগিরি করছেন?

—আমি ষোলো বছর পুলিশে চাকরি করছি। থানার চার্জে আছি আট বছর।

—একটু আগে আপনি বলেছেন যে স্জাতা দেবী নকুলবাবুর স্টেটমেন্ট করোবরেট করেন। নকুলবাবু কী স্টেটমেন্ট দিয়েছিলেন?

তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে গণপতি জানা: অবজেক্শন য়োর অনার! এতে আরি আগেই আপত্তি জানিয়েছি এবং ধর্মাবতার আমার আপত্তি গ্রাহ্য করেছেন।

বাহুসাহেব ঘুরে দাঁড়ান, বিচারকের দিকে ফিরে বলেন, আমি মনে করি বর্তমান পরিস্থিতিতে এ প্রশ্ন করবার অধিকার প্রতিবাদীপক্ষ অর্জন করেছেন। সংবিধান যে অধিকার নকুল হই মশাইকে দিয়েছে তা রক্ষা করবার দায় ছিল সাক্ষী রমেনবাবুর। কিন্তু সাক্ষী ডাইরেক্ট এজিডেন্সে স্বতঃ প্রণোদিত হয়ে বলেছেন ‘স্জাতা দেবী নকুলবাবুর স্টেটমেন্ট করোবরেট করেন।’ এ সাক্ষ্য

নথীভুক্ত করা হয়েছে। সুতরাং জেরায় এ প্রশ্ন করা চলতে পারে এই আমার বক্তব্য। এ বিষয়ে আদালতের কলিং প্রার্থনা করছি।

জাস্টিস্ ভাহুড়ী বলেন, অবজেক্শন ওভারক্লড্ !

এবার মাইতি লাকিয়ে ওঠেন, ধর্মাবতার, নকুলবাবুর স্টেটমেন্ট আদালতে পেশ করবার অধিকার সাক্ষীর নেই !

জাস্টিস্ ভাহুড়ী গম্ভীরভাবে বলেন, সে ক্ষেত্রে এমন অসংলগ্ন কথাটা ডাইরেক্ট এভিডেন্সে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সাক্ষীর বলা উচিত ছিল না।। সাক্ষী সাধারণ গ্রামের মানুষ নন, তিনি ষোলো বছর পুলিশে চাকরি করছেন, আট বছর দারোগাগিরি করছেন। ডাইরেক্ট এভিডেন্সে যে সাক্ষ্য তিনি দিয়েছেন, জেরায় তার জবাব দিতে তিনি বাধ্য। এতে যদি নকুলবাবুর উকিল মনে করেন সাক্ষী রমেন গুহ নকুলবাবুর সাংবিধানিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করেছেন তাহলে তিনি সাক্ষীর বিরুদ্ধে পৃথক মামলা আনতে পারেন। কিন্তু সাক্ষীকে জেরায় জবাব দিতেই হবে। নাউ আনসার ছাট কোশ্চেন !

বাসুসাহেব পুনরায় প্রশ্ন করেন, নকুলবাবু কি এজাহার দিয়েছিলেন ?

রমেন গুহ অতঃপর বাধ্য হয়ে বলেন, নকুলবাবু সে রাতে বলেছিলেন যে খোলা দরজা দিয়ে তিনি দেখতে পান আসামী কৌশিক মিত্র এবং মৃত আগরওয়াল ধস্তাধস্তি করছেন এবং আচমকা দুজনেই চৌকাঠের উপরে পড়ে যান। তখনই গুলি ছুটে যায়।

—নকুলবাবু কি একথাও বলেননি যে রিভলভারটি মৃত আগরওয়ালের হাতেই বরাবর ছিল ?

—হ্যাঁ তাই বলেছিলেন।

—আচ্ছা রমেনবাবু, সূজাতা দেবী কি আপনাকে একখানি মোটর ড্রাইভিং লাইসেন্স এনে দিয়ে তদন্ত করে দেখতে বলেছিলেন সেটা জাল কিনা ?

রমেনবাবু স্বীকার করেন। সূজাতার সঙ্গে থানার তাঁর বেসব কথা হয় এবং পরে সূজাতার বাড়িতে এসে তিনি বেসব কথা বলেন সবই তাঁর সাক্ষ্য একে একে প্রকাশ হয়ে পড়ে। তারপর বাসুসাহেব বলেন, একথা কি সত্য যে আসামীর গৌফ লাগিয়ে, চশমা এঁটে কনভোকেশান গাউন পরিয়ে তাকে কৌশিক মিত্র সাজিয়ে এবং গৌফ চশমা গাউন খুলে তাকে বিত্তদাস সাজিয়ে যে ছুটি ফটো তোলা হয় তা আপনি আপনার ক্যামেরায় বহুতে তুলেছিলেন ?

আদালত ঘরে মৃদু গুঞ্জন ওঠে।

রমেন গুহের উত্তর শুরু হতেই ঘরে হুচীভেদে নিশ্চুপতা ফিরে আসে।

—এ প্রশ্নের জবাব দিতে হলে সরকারী গোপন তথ্য, যা নাকি আমি পদাধিকার বলে জানি, তা প্রকাশ হয়ে পড়ার আশঙ্কা আছে।

—আপনি কি আমার এ অভিযোগ অস্বীকার করতে পারেন?

—আমি আমার উপরওয়ালার নির্দেশ ছাড়া ঐ বিষয়ে কোন কথা বলতে পারি না।

বাহুসাহেব বিচারকের দিকে ফিরে বলেন, বাদীপক্ষ ফাস্ট ডিগ্রি মার্ডারের চার্জ এনেছেন। সাক্ষীর উপরওয়ালার কাছ থেকে অনুমতি আনবার ব্যবস্থা করার আজি আমি আদালতে পেশ করছি।

জাস্টিস্ ভাহুড়ী তখন সাক্ষীকে বলেন, কার অনুমতি পেলে আপনি এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন?

—ভিজিলেন্স বিভাগের অফিসার শ্রীমুকুমার গুপ্ত, আই-পি-র।

বিচারক বাহুসাহেবকে আশ্বস্ত করেন, আদালত এ বিষয়ে যথাকর্তব্য করবেন; আপনি জেরা চালিয়ে যান।

—আমি যদি বলি ঘটনার অন্তত এক পক্ষকাল আগে থেকেই আপনি জানেন যে কৌশিক মিত্র বিশ্বনাথ দাসের জাল লাইসেন্স নিয়ে গাড়ি চালাচ্ছে, সে অভিযোগ আপনি অস্বীকার করতে পারেন?

—আমি এ বিষয়েও কোন জবাব দেব না ঐ একই করণে।

জাস্টিস্ ভাহুড়ী হঠাৎ প্রশ্ন করে বসেন, জাস্ট এমিনিট, আপনি এ অভিযোগ অস্বীকারও করছেন না?

—আজ্ঞে না, এ বিষয়ে আমি কোন কথা বলতে পারি না, আমার উপর-ওয়ালার নির্দেশ ছাড়া।

জাস্টিস্ ভাহুড়ী চোখ থেকে চশ্মাটা খুলে বাহুসাহেবের দিকে ফিরে বলেন, দিস্ ইস্ সামথিং ট্রেজ। আপনি কি জেরা চালিয়ে যেতে চান, না ততদিন না এ অনুমতি আনানো যায় ততদিন এ মামলা মূলতুবি রাখতে চান?

বাহুসাহেব একটা অভিবাদন করে বলেন, আমার যেকোন জামিন পায়নি, ততরাং মামলা আমি মূলতুবি রাখতে চাইনা। আদালত অনুমতি করলে আমি জেরা চালিয়ে যেতেই চাই।

—দেন প্রসিড!

বাহুসাহেব প্রশ্ন করেন, একথা কি সত্য যে বক্তাবাদের জন্ত এই শহরে

‘অকালবসন্ত’ নামে যে নাটক অভিনয়ের আয়োজন হয়েছিল আপনি তার পরিচালক ছিলেন ?

মাইতি এ প্রশ্নে আপত্তি জানান। প্রশ্ন অবাস্তব এবং অপ্রাসঙ্গিক এই অজুহাতে। কিন্তু বাস্তবসাহেব এ প্রশ্নের উত্তরের প্রাসঙ্গিকতা প্রতিষ্ঠিত করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর সাক্ষী মেনে নিলেন যে তিনি ঐ নাটকের পরিচালক ছিলেন।

—নাটকটার এক কপি কি সূজাতা দেবী অনুলিপি করে দেন ? এবং সেই কপিটি কি আপনি নকুল হুই মশায়ের কাছে জমা রাখেন ?

—আপনার উভয় প্রশ্নের উত্তরই—ই্যা।

—এইটি কি সেই কপি ?

সাক্ষী পাণ্ডুলিপিটি পরীক্ষা করে সে কথা স্বীকার করেন।

—নাটকের ১০৩ পৃষ্ঠায় লাল কালি চিহ্নিত অংশটুকু আপনি আদালতকে পাঠ করে শোনাবেন কি ?

রমেনবাবু পড়ে যান : পৃথিবীতে আমার প্রয়োজন ফুরাইয়াছে। অনেক ভাবিয়া দেখিলাম, আমার বাঁচিয়া থাকিবার কোন অর্থ হয় না। কাহারও বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নাই। তোমরা সুখে থাক এই কামনা জানাইয়া গেলাম। আমার এই মৃত্যুর জন্ত কেহ দায়ী নহে। আমি স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করিতেছি। ইতি—সূজাতা।”

—এবার আপনি পাণ্ডুলিপিটা পরীক্ষা করে বলবেন কি যে ঐ ১০৩ পৃষ্ঠার হস্তাক্ষর সমস্ত পাণ্ডুলিপিটার অন্ত্যন্ত পৃষ্ঠার হস্তাক্ষরের সঙ্গে মিলছে কিনা ?

—আমি হস্তরেখাবিদ নই।

—আমি জানি ; কিন্তু আপনি ষোলো বছর পুলিশে আছেন, আট বছর থানার চার্জে আছেন। আপনার সেই অভিজ্ঞতা থেকে আমার প্রশ্নের জবাব দিন।

—না মিলছে না।

—ঐ ১০৩নং পৃষ্ঠাটি আঠা দিয়ে বাঁধানো খাতাটার আটকানো আছে কি ?

—ই্যা।

—আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্ত নেই।

রমেন গুহ সাক্ষীর মঞ্চ থেকে নেমে আসার পর নকুল হুইকে আবার উঠে দাঁড়াতে হল। মাইতি এবার প্রশ্ন করেন, আপনি বলছেন যে খোলা দরজা

দিয়ে দেখতে পেলেন যে আগরওয়াল গুলিবিদ্ধ হয়ে চৌকাঠের উপর পড়ে আছে। তারপর কি হল ?

নকুলবাবু বলতে থাকেন, তিনি অকুশলে ছুটে যান। প্রথমটা সকলেই হতচকিত হয়ে যায়। তারপর আসামী কৌশিক সাকীর হাতে পায়ে ধরতে থাকে, মিথ্যা সাকী দেওয়ার জন্য। স্বজাতা দেবীও সনির্বন্ধ অকুসৌখ্য করতে থাকেন। নকুল বিচলিত হয়ে পড়ে। সে ভেবে দেখে যে তার মালিক আগরওয়াল স্বজাতা দেবীকে অসৎ-উদ্দেশ্যেই ওখানে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। সে ছিল হুমের চাকর, ফলে সে প্রতিবাদ করতে পারেনি। এ জন্যে মনে মনে সে স্বজাতা ও কৌশিকের প্রতি একটা করুণা বোধ করেছিল। তাই শেষ পর্যন্ত সে ওদের কথা দেয় যে, সে বলবে যত্নাধিনি করার সময় আচম্কা গুলি ছুটে যেতে সে স্বচক্ষে দেখেছে। রমেনবাবু তাই যখন ঘটনার রাত্রে তাকে প্রশ্ন করেন, তখন সে ঐ কথাই বলেছিল। কিন্তু পরে তার মনে হয় কাণ্ডটা তার পক্ষে ঠিক হয়নি। মিথ্যা কথা বলা তার স্বভাব নয়। তাই পরদিন সে একজন উকিলের কাছে সব কথা খুলে বলে এবং পরামর্শ চায়। উকিল গণপতি জানা তখন তাকে বলে যে, এভাবে মিথ্যা কথা বলে আইনের উপর তার হস্তক্ষেপ করা ঠিক নয়। স্বজাতা এবং কৌশিকের উপর তার যত করুণাই হ'ক না কেন, সে মিথ্যা এজাহার দিতে পারে না। ফলে উকিলের পরামর্শ মত সে থানায় আসে এবং নতুন করে এজাহার দেয়।

অরূপ বাহুসাহেবের কানে জনাস্তিকে বলে, বেটা এমনভাবে সাকী দিচ্ছে যে জুরিদের অবিশ্বাস করার কিছু থাকবে না। জেরায় যদি কাবু না করা যায়—

বাহুসাহেব হেসে বলেন, ওর সবচেয়ে ইন্টেলিজেন্ট মুভ হয়েছে একথা বলা যে সে শুধু গুলির আওয়াজই শুনেছে, পিস্তলের মুখ থেকে আগুন বা ধোঁয়া বার হতে দেখিনি—

অরূপ বলে—সেটা সব চেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছে কেন ?

—ও একটা পরিবেশ এভাবে সৃষ্টি করেছে যে সে মিথ্যা সাক্য দিচ্ছে না। যেটুকু দেখেছে বা শুনেছে শুধু তাই বলছে। মিথ্যা সাকী দিলে সে অনায়াসে বলতে পারত যে সে আগুন ও ধোঁয়াও দেখেছে !

মাইতি তাঁর সওয়াল শেষ করে বাহুসাহেবের দিকে ফিরে বলেন, আপনি এবার জেরা করতে পারেন।

বাসুসাহেব ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে বলেন, আচ্ছা ঐ বাগানবাড়ি থেকে সাইকেলে চেপে শহরে আসতে আপনার কতক্ষণ লাগবে নকুলবাবু ?

—আজ্ঞে ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ মিনিট লাগবে হজুর ।

—আপনি ময়ূরবাহনের আদেশে ঘটনার রাতে এক বোতল মদ কিনতে শহরে এসেছিলেন বলেছেন, কার দোকানে মদ কিনেছিলেন ?

মাইতি উঠে দাঁড়ান, বলেন : অবজেক্সমান য়োর অনার, এ প্রশ্ন অরাস্তর, অপ্রাসঙ্গিক এবং ভিত্তিহীন । ময়ূরবাহন নামে কাউকে আমরা এখনও চিনি না ।

অরূপ বাসুসাহেবের কানে কানে বলে, ময়ূরবাহন নয়, ময়ূরকেতন !

বাসুসাহেব হেসে উল্লেখ্যেই বলেন, এইকন্ডেই প্র্যাকটিশ ছেড়ে দিয়েছি ! আই বেগ য়োর পার্ডন, ময়ূরকেতনের আদেশে ঘটনার রাতে এক বোতল মদ কিনতে শহরে এসে কার দোকানে মদ কিনেছিলেন ?

—লক্ষ্মী সাহার দোকানে হজুর ।

—মদের বোতলটা কিনে সোজা বাগান বাড়িতে ফিরে যান ?

—আজ্ঞে না । দোকান থেকে বেরিয়েই আমার সাইকেলটা পাঞ্চার হয়ে যায় । সাইকেলটা গোকুল বাড়ুইয়ের দোকানে মেরামত করিয়ে নিতে আমার আধঘণ্টাখানেক দেরি হয়েছিল ।

—লক্ষ্মী সাহার দোকান থেকে কখন বার হয়েছিলেন ?

—সাতটা পঞ্চাশ মিনিটে হজুর ।

—আপনি বারে বারেই ঘড়ি দেখেন ?

—আজ্ঞে না । মাঝে মাঝে দেখি । দোকান থেকে বেরিয়েই দেখেছিলাম ।

—লক্ষ্মী সাহার দোকান থেকে আপনি ক্যাসমেয়ো নিয়েছিলেন ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার সঙ্গেই আছে, এই দেখুন ।

—না দেখবার দরকার নেই । আমি লক্ষ্মী সাহার দোকানে কাউন্টার-ফয়েল আগেই দেখেছি । দিনের শেষবিক্রি আপনার হাতেই হয়েছে । আমি জানতে চেয়েছিলাম, যে ভাউচারটা আপনি পকেটে করে সাক্ষী দিতে এসেছেন কিনা । ভাল কথা, ঐ দিন সন্ধ্যায় মেল ট্রেনটা এ্যাটেণ্ড করতে আপনি স্টেশনে গিয়েছিলেন, তাই নয় ?

—গিয়েছিলাম হজুর ।

—মটোরে স্টেশন থেকে বাগানবাড়িতে যেতে কতক্ষণ লাগার কথা ?

—মিনিট পনের লাগবে।

—খুব জোরে গেলে দশ মিনিট ?

—না হুজুর। বার থেকে পনের মিনিট।

—করটার সময় স্টেশান থেকে আপনারা রওনা হন ?

—তা ঠিক বলতে পারিনা। আমি বড়ি দেখিনি।

—ও এবার বুঝি বড়িটা দেখেননি ? কিন্তু আপনার মনে আছে নিশ্চয় যে স্টেশানে মেল ট্রেনটা আসার পর আপনারা রওনা হয়েছিলেন ?

—না হুজুর, তাও ঠিক স্মরণ হচ্ছে না।

—হচ্ছে না ? কিন্তু একথাও কি স্মরণ হচ্ছে না যে স্টেশানের গেটে টিকিট কালেক্টার অনাদি দত্ত আপনাকে আটকে বলেছিল, আপনি যে এই মেল ট্রেনে নায়েননি তার প্রমাণ কি ?

—আজ্ঞে অনাদি দত্ত নামে আমি কাউকে চিনি না।

—নকুলবাবু, এভাবে প্রশ্নটা এড়িয়ে বাবার চেষ্টা করবেন না। আমি বলছি স্টেশান গেটে টি. সি. অনাদি দত্ত আপনাকে চ্যালেঞ্জ করেছিল যে আপনি মেল ট্রেনে নেমেছেন, আপনি বিনা টিকিটের বাড়ী। তখন টি. টি. আই সতীশ সামন্ত এবং সুবল বহু আপনাকে জি. আর. পি-তে দেবার পরামর্শ করে। এই সময় আগরওয়াল আপনাকে উদ্ধার করতে আসে। এর মধ্যে টি. টি. আই সতীশ সামন্ত আগরওয়ালকে চিনতে পারে এবং আগরওয়ালের অহুরোধে আপনাকে ছেড়ে দেয়। আপনি অনাদি দত্ত, সুবল বহু এবং সামন্তকে চেনেন বা না চেনেন এ ঘটনা অস্বীকার করতে পারেন কি ?

—আজ্ঞে না। আমাকে এভাবে গেটে আটকেছিল মনে পড়ছে।

—তাহলে মেল ট্রেনটা স্টেশানে আসার পরেই আপনারা বাগানবাড়ির দিকে রওনা দিয়েছিলেন, কেমন ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর ! এবার মনে পড়ছে, সাড়ে ছয়টার মেল ট্রেনটা আসার পরেই আমরা মটোরে বাগানবাড়ির দিকে রওনা হয়েছিলাম।

—কিন্তু স্টেশান মাস্টার মশাই জানাচ্ছেন ঘটনার দিন মেল ট্রেনটা সাত মিনিট লেটে এসেছিল। অর্থাৎ সন্ধ্যা সাতটা আঠাশ মিনিটে সেটা প্রাটকর্মে আসে। এক্ষেত্রে বড়ি না দেখেও আপনি কি বলতে পারেন না যে সাড়ে সাতটার আগে আপনারা মটোরে করে রওনা হন নি ?

—আজ্ঞে, তাই তো হিসাব দাঁড়াচ্ছে।

—এবং যেহেতু যেতে আপনাদের অন্ততঃ বারো মিনিট লেগেছে তাই ধরা যায় যে সন্ধ্যা সাতটা বেরান্নিশ মিনিটের আগে আপনারা বাগানবাড়িতে পৌঁছাননি! কেমন?

—আজ্ঞে তাই হবে।

—যদি ধরা যায় পৌঁছান যাত্রাই আপনি সাইকেলে করে মদ কিনতে আবার শহরে আসেন তাহলে আপনার হিসাব মত রাত আটটা বেজে বারো মিনিটের আগে আপনি লক্ষ্মী সাহার দোকানে কিছুতেই পৌঁছাতে পারেন না। তাই নয়?

—ঐ বারো মিনিট হিসাবে ধর্তব্য নয়। হাজার হোক আমরা আন্দাজে হিসাব করছি।

—তা করছি। কিন্তু পৌঁছানো যাত্রাই তো আপনি রওনা হননি। পৌঁছানোর পর তো অনেক কাণ্ড ঘটেছিল, যার ফলে আপনার চশমা ভেঙ্গে যায়, তাই নয়?

—হুজুর, আমি আপনার প্রশ্নটা বুঝতে পারছি না।

বাগানবাড়িতে পৌঁছানোর পরে কোন দুর্ঘটনায় আপনার চশমাটা ভেঙ্গে গিয়েছিল, একথা কি সত্য?

—আজ্ঞে হ্যাঁ!

—এবার বলুন, পৌঁছানোর কত পরে আপনি সাইকেলে করে মদ কিনতে আবার রওনা হন?

—তা মিনিট দশেক হবে।

—সে ক্ষেত্রে রাত আটটা বারো মিনিটের আগে আপনি কিছুতেই লক্ষ্মী-সাহার দোকানে পৌঁছাতে পারেন না। ঠিক কিনা?

—তাই হবে বোধ হয়।

—আবার বোধহয় কেন? এ তো অন্ধের হিসাব।

—আজ্ঞে তাই।

—অথচ আপনি বলেছেন, লক্ষ্মী সাহার দোকান থেকে বেরিয়েই আপনি আপনার বাড়িতে দেখেন তখন সময় সাতটা বেজে পঞ্চাশ মিনিট!

—তাই দেখেছিলাম, মনে হচ্ছে।

—এখন কি মনে হচ্ছে যে বাড়িটা অন্তত মিনিট কুড়ি লেটে চলছিল?

—তাই বোধ হয় ।

—এবার বলুন, লক্ষ্মী সাহা, যার আবগারি লাইসেন্সে বলা আছে যে সে রাত আটটার পরে কোন মাদক দ্রব্য বিক্রয় করতে পারবে না, সে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে হলপ করে স্বীকার করবে তো যে সে রাত সাতটা পঞ্চায়ে আপনাকে এক বোতল মদ বিক্রয় করেছিল ?

গণপতি লাফিয়ে ওঠে, অবজেকশান য়োর অনার ! এ প্রশ্ন অবৈধ ! সাক্ষী কেমন করে জানাবেন লক্ষ্মী সাহা কি সাক্ষ্য দেবেন ?

—আপত্তি গ্রাহ্য হল ।

বাহুসাহেব তখন অন্য প্রশ্ন পেশ করেন : আচ্ছা হুই-মশাই, আপনি বলেছেন যে আপনার মালিক ময়ূরবাহন, আই মীন ময়ূরকেতন প্রাণভয়ে ছুটে পালাচ্ছেন আর আসামী একটি রিভলভার তার দিকে উত্তত করে আছে । এদের হুজনের দূরত্বটা কত হবে ?

আজ্ঞে আমি তা আগেই বলেছি, হাত চারেক হবে হুজুর ।

—আর আপনি যেখানে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন সেখান থেকে আপনার মালিক কি যেন নাম আমার মনে থাকে না, তাঁর দূরত্ব কত হবে ?

—তাও আমি আগে বলেছি, বিশ-পঁচিশ হাত দূরে ।

—যে তখন আলো কেমন ছিল ?

—এসব কথা আগেই হয়ে গেছে হুজুর, পেট্রোম্যাক্সের জোরালো আলো ছিল ।

—এই কোর্টঘরে এখন যেমন আলো আছে ?

—আজ্ঞে না । এখন তো দিনের বেলা । রাতে পেট্রোম্যাক্সের আলোর কি আর এত জোর হয় ? তবে দেখতে আমার কোন ভুল হয়নি হুজুর ।

—আপনি সিদ্ধান্তে আসবেন না । যা প্রশ্ন করি শুধু তার জবাব দিন । এত আলো ছিল না ?

—আজ্ঞে না ।

—আপনি আসামীকে স্পষ্ট চিনতে পারলেন ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ ।

—আপনার মালিক, কি যেন নাম তাঁর, আমার মনে থাকে না, তাঁকেও স্পষ্ট চিনতে পারলেন ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর ।

—আপনার চশমাটা দিন তো ?

—চশমা ? কেন ?

গণপতি জানা আপত্তি জানায়। বাহুসাহেব তখন বিচারকের দিকে ফিরে বলেন, ঘটনার রাত্রে সাক্ষীর চোখে চশমা ছিলনা। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। আমি দেখতে চাই, বিনা চশমায় তিনি কতদূর দেখতে পান।

বিচারক বললেন. আপনার চশমাটা ঠুকে দিন।

নকুলের চশমাটা নিয়ে বাহুসাহেব অরূপের হাতে দিলেন এবং তার হাত থেকে কাগজে জড়ানো একখানা বড় বাঁধানো ফটো নিয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেলেন। সেখান থেকে বলেন, আপনি বলেছেন দূরত্ব আন্দাজ বিশ হাত ছিল। এই এতদূর হবে কি ?

—আজ্ঞে না, এর চেয়ে অনেক বেশী।

বেশ, এবার দেখুন তো, এই ছবিটা কার ? নামটা আমার মনে থাকে না, আপনি নিশ্চয় চেনেন এঁকে !

খবরের কাগজের মোড়ক খুলে ছবিটা উনি নকুলের দিকে মেলে ধরেন।

নকুল একটু শ্লেষের স্বরে বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ চিনি। ময়ূববাহন নয় ছতুর ছবিটা স্বর্গতঃ ময়ূরকেতন আগরওয়ালের।

—এঁকেই সেদিন চোকাঠের উপর পড়ে যেতে দেখেছিলেন ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—অর্থাৎ আপনি বলতে চান, যার হাতে সেদিন রিভলভারটা দেখেছিলেন তিনি আসামী নন. তাঁর নাম নাথুরাম গড্‌সে ?

মাইতি সহকারীর সঙ্গে নিয়কণ্ঠে কি একটা আলোচনা করছিলেন। এ কথায় হঠাৎ চমকে ছবিটির দিকে তাকিয়েই চিৎকার করে ওঠেন,—
অবজেকসান !

জাষ্টিস ভাহুড়ী এতক্ষণ ছবিটার পিছন দিক দেখতে পাচ্ছিলেন। বাহুসাহেব ছবিটা এবার উঁচু করে ধরেন। চারিদিকে ঘুরিয়ে দেখান। বারম্বার হাতুড়ির শব্দ অগ্রাহ্য করে বিচারালয় উচ্চ হাস্তে ফেটে পড়তে চায়।

—বৃহদায়তন চিত্রটি জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর !

—বাহুসাহেব বিচারকের দিকে ফিরে একটি অভিবাদন করে বলেন, মি লর্ড। সাক্ষীর নিজের স্বীকৃতি মত অকুস্থলে এর চেয়ে আলো কম ছিল, এর

চেয়ে দূরত্ব বেশী ছিল। এখন এই একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শীর জবানবন্দীর উপর জুরিমহোদয়গণ কতটা গুরুত্ব দেবেন সে কথা তাঁদের বিচার, কিন্তু—

মাইতি সাহেব তাঁর কথা শেষ হবার আগেই বলে ওঠেন, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি ধর্মাবতার, যে মাননীয় সহযোগী একটা অত্যন্ত হীন চক্রান্তের সাহায্য নিয়েছেন। প্রবীন আইনজীবীর পক্ষে এ ধরনের ‘আনফেয়ার মীনস্’ নেওয়া অবিশ্বাস্য! গতকাল রাতে তিনি মৃত আগরওয়ালের একখানি ঠিক ঐ সাইজের বাঁধানো কটো সাক্ষীর কাছ থেকে নিয়ে যান, এবং আজ আদালতে সেটা ফেরত দেবার প্রতিশ্রুতি দেন—

—সো হোয়াট? প্রশ্ন করেন সহাস্ত্র বিচারক।

—ধর্মাবতার, উনি প্রশ্নের মাধ্যমে সাজেস্ট করেছেন ‘আপনার চেনা লোক, কি যেন নাম আমার মনে থাকেনা’ এ থেকে সাক্ষীর মনে হয়েছে যে ছবিটি আগরওয়ালের।

—আপনি কি বলতে চান, মহাত্মা গান্ধী নকুল ছইয়ের অচেনা লোক?

—না, তা ঠিক নয়। মানে, আমি বলতে চাই ‘কি যেন নাম মনে থাকেনা’ কথাগুলো বারবার ব্যবহার করে সহযোগী একটা ভাস্কির সৃষ্টি করেছেন, অত্যন্ত আনফেয়ার ভাস্কি।

জাস্টিস ভাহুড়ী হেসে বলেন, সে তো বটেই, পি. কে. বাহুর যে কীতি কাহিনী আমার জানা আছে তাতে ‘ময়ুরকেতন’ নামটা তিনি কেন মনে রাখতে পারছেন না, তা আমিও বুঝে উঠতে পারিনি!

—সাক্ষীও সেই ভুল করেছেন। তিনি ধরে নিয়েছিলেন, আগরওয়ালের সেই ছবিটিই তাঁকে দেখানো হচ্ছে। এতদূর থেকে বিনা চশমায় এ ভুল হওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয় মোটেই—

জাস্টিস ভাহুড়ী বলেন, আপনার সহযোগীও তো ঠিক তাই বলছেন, বিনা চশমায় দূর থেকে সাক্ষী ধরে নিয়েছিলেন, যে, তিনি আসামীর হাতেই আগ্নেয়াস্ত্রটা দেখেছিলেন, এ ভুল হওয়া তার পক্ষে অসম্ভব নয় মোটেই—

মাইতি কি জবাব দেবেন ভেবে পান না।

ভাহুড়ী বলেন, প্রসীড উইথ য়োর ক্রশ এগ্জামিনেসন্স প্রিজ!

নকুল ছইয়ের চশমাটা ফেরত দিয়ে বাহুসাহেব বলেন, এই নাটকের পাণ্ডুলিপিটা দেখুন তো, এটা কার হাতের লেখা?

নকুল তখনও স্বাভাবিক হতে পারিনি। তার মুখ চোখ লাল হয়ে আছে, কোনক্রমে বলে, স্ফূজাতা দেবীর।

—এইবার ১০৩ পৃষ্ঠা খুলে দেখুন তো। ওটা কার হাতের লেখা?

—আমার।

—ঐ একটা পাতা আপনি নিজে হাতে লিখেছিলেন কেন?

—পাণ্ডুলিপিটা আমার কাছে ছিল। অসাবধানে ঐ পাতাটার কালি পড়ে যায়।

—কালি পড়ে যায় মানে? কি ভাবে কালি পড়ে যায়?

—আজ্ঞে ঐ পাতাটা সামনে খোলা ছিল, আমি তখন কলমে কালি ভরছিলাম। হঠাৎ কয়েক ফোঁটা কালি ঐ পাতাটার পড়ে যায়। তাই ও পাতা আমি নতুন করে লিখি।

—কিন্তু খোলা খাতার পাতায় কালি পড়ে গেলে, তার চিহ্ন তো পরের পাতাগুলোতেও থাকবে। তা নেই কেন?

—খুব অল্প কালি পড়েছিল।

—কালি পড়ার পরেও লেখা পড়া যাচ্ছিল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তাহলে আপনি ও পাতাটা আবার নতুন করে লিখলেন কেন?

—আমি অপরিষ্কার জিনিস দেখতে পারি না বলে।

—স্ফূজাতা দেবীর হস্তাক্ষরে লেখা সেই পাতাটা কোথায়?

—আমি ছিঁড়ে ফেলেছিলাম।

জজ-সাহেব এখানে বাহুসাহেবকে বলেন, আমি কিন্তু ঐ নাটকের পাণ্ডুলিপির সঙ্গে এ মামলার পারস্পর্ষটী বুঝতে পারছি না।

বাহুসাহেব একটি 'বাও' করে বলেন, সে দায়িত্ব আমার মিলড! আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে এর রেলিভেন্সি ষথাসময়ে প্রতিষ্ঠা করব। আমার জেরা শেষ হয়েছে।

এখানেই জজ-সাহেব মধ্যাহ্ন বিরতি ঘোষণা করলেন।

জুনিয়ার উকিলের দল ছুটে এসে ঘিরে ধরে বাহুসাহেবকে। পনের বছর পর বিখ্যাত ব্যারিস্টার পি. কে. বাহু একটি কেসে সওয়াল করছেন খবর পেয়ে সমস্ত বার এ্যাসোসিয়েশন ভীড় করে এসেছে এ মামলা দেখতে। একজন উকিল বলে, এ মামলার বনিয়াদটাই আজ ধ্বসিয়ে দিয়েছেন আপনি।

একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য যে কতদূর নির্ভরযোগ্য তা সবাই বুঝে নিয়েছে।

চশমার কাচটা মুছতে মুছতে বাহুসাহেব হেসে বলেন, নকুলই যে একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী সে কথা কে বলল আপনাদের? এরপর দেখবেন হয়তো প্রসিকিউশান কাদের আলিকেও হাজির করেছে। সেও হলপ খেয়ে বলবে যে সে স্বচক্ষে দেখেছে হত্যাকাণ্ডটা।

অরুণরতন বলে, সে ভয় নেই স্যার, আমি খবর নিয়ে জেনেছি, সেই রাত্রি থেকেই কাদেরআলি নিরুদ্দেশ।

—নিরুদ্দেশ? তাকে ‘সমন’ করা হয়নি?

—না! লোকটার পাভাই নেই, সমন জারি করবে কার উপর?

একজন নবীন উকিল বলেন, অনাদি দত্ত, সুবল বহু আর সতীশ সামন্ত কি ডিফেন্স উইটনেস হিসাবে সমন পেয়েছে?

বাহু হেসে বলেন, না ভাই ও তিনটে নামই আমার মনগড়া। আমি সূজাতার কাছে শুনেছিলাম, নকুলকে গেটে কয়েকজন রেল কর্মচারী আটকে বলেছিল ‘আপনি এই মেলট্রেনে নামেন নি তার প্রমাণ কি। এবং তারপর আগরওয়াল তাকে উদ্ধার করে আনে।

—কী আশ্চর্য! তাহলে ঐ তিনটে ‘ফিক্টিশাস্’ নাম বললেন কেন?

—না হলে নকুল কিছুতেই স্বীকার করত না। তিন তিনটে সাক্ষী আমার হাতে আছে জানার সঙ্গে সঙ্গে সে স্বীকার করল যে ট্রেন আমার পর তারা মটোরে করে রওনা হয়। তা থেকে প্রমাণ হল ও মদ কিনতে শহরে আসেনি আদৌ! ওর এই সাক্ষ্যের কথা জানার পর লক্ষীসাহা কিছুতেই স্বীকার করবে না যে ঐ মদের বোতলটা সন্ধ্যার পর বিক্রি হয়েছে। তাহলে তাকে স্বীকার করতে হবে রাত আটটার পরে সে মদ বিক্রি করেছে।

আগের দিনের মত এদিনও ঊর। মধ্যাহ্ন বিরতিতে এসে আশ্রয় নিলেন জীমূতবাহনের ড্রাইংরুমে। সূজাতা এবং বাহুসাহেবকে আপ্যায়ন করে বসিয়ে জীমূতবাহন বললেন, বাহু-সাহেব এ কেসে আমারও একটা ভূমিকা আছে। আমি কিছু কনক্লেস করতে চাই।

—বলুন।

—কৌশিক মিত্রকে আমিই নিয়োগ করেছিলাম ডিভিশনালের সহায়তায়।

আমিই সন্দেহ করেছিলাম, আগরওয়ালা সিমেন্টে গলাঘাটির ভেজাল মেশানো। একজন দক্ষ এঞ্জিনিয়ারকে তাই গোপনে পাঠিয়ে ছিলাম ব্যাপারটার তদন্ত করতে। আপনি আজ রমেন গুহকে যে প্রস্তাব করেছেন, তা থেকেই বুঝতে পারছি যে আপনি সেটা জানেন। আমি জানাতে চাই যে কৌশিক এ কাজে সাফল্যলাভ করেছিল; কিন্তু আগরওয়ালের আকস্মিক মৃত্যুতে পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ণ বদলে গেছে। তবু আমি কোন করে ভিজিলেন্স অফিসার মিস্টার স্কুমার গুপ্ত আই. পি. কে আনিয়েছি। সরকারী তথ্যের গোপনীয়তা যতদূর সম্ভব রক্ষা করে তিনি সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত আছেন। আপনি অস্বস্তি করলে যি: গুপ্তকে এখানে আনতে পারি।

—সিওর।

অনতিবিলম্বে ভিজিলেন্স অফিসার স্কুমার গুপ্তের সঙ্গে বাহুসাহেবের পরিচয় হয়ে গেল। গুপ্তসাহেব উঠেছেন মার্কেট-হাউসে। প্রয়োজন হলে দু-চারদিন থাকবার জন্তে প্রস্তুত হয়েই এসেছেন। বাহুসাহেব বলেন, প্রয়োজন হবে। বাদীপক্ষের সব সাক্ষী শেষ হলে আপনাকে আমি ডাকব। সম্ভবত কাল। সমন এখনই জারি করব আমি। আজ রাতে যদি দয়া করে আমার সঙ্গে ডিনার করেন তবে ঘটনাগুলি জেনে নিতে পারি। ঘোষের সঙ্গে আপনার আলাপ আছে তো?

—যথেষ্ট আলাপ আছে। আমি আসব। ধরুন রাত আটটা।

গুপ্তসাহেব বিদায় নেবার পর সূজাতা বলে, নকুল হুইয়ের সাক্ষ্য খুব জোরদার হবে না। কিন্তু কাদের আলিকে ওরা লুকিয়ে রেখে তালিম দিচ্ছে না তো?

অরূপ বলে, তা বলা মুশকিল। বাজারে গুজব সে এক-কনভিক্ট। সে আত্মগোপন করে আছে।

সূজাতা বলে, ধস্তাধস্তি করতে গিয়ে যে গুলি ছুটে যায়নি তা তো আগেই প্রমাণ হয়েছে! গুলিবিক্র অঙ্গে 'চার্ড' হয়ে যাবার চিহ্ন নেই। তাছাড়া গুলি পিছন থেকে দেহে প্রবেশ করেছে—

অরূপ মাথা নেড়ে বলে—এই 'চার্ড' না হওয়ার প্রসঙ্গটা তোলা আমাদের ভুল হয়েছিল। ও প্রসঙ্গটা না উঠলে হয় তো অনিচ্ছাকৃত মৃত্যুর একটা যুক্তি খাড়া করতে পারতাম। এ থেকে আশঙ্কা হয় একেবারে বেকসুর খালাস করানো যাবে না। অবশ্য ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট হতে পারে না—

আচ্ছন্নের মত স্ফূর্তিতা বলে—কত দিনের মেয়াদ হবে বলে মনে হয় ?

অরূপ বলে আইনে তো বলে—

বাসুসাহেব সামনের দিকে ফিরে বলেন, আমার পরামর্শ শুনবে স্ফূর্তিতা ?

স্ফূর্তিতা চমকে ওঠে সে কণ্ঠ করে, বলে, বলুন। আপনার পরামর্শই তো শুনছি।

—তুমি আত্মপ্রাপ্ত সত্য কথা স্বীকার করে যাও !

অরূপ চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে ওঠে, বলে—কী বলছেন আপনি ? অসম্ভব !

বাসুসাহেব জানালা দিয়ে আকাশের দিকে দৃষ্টি মেলে দেন। দূরে বহু উচুতে একটা নিঃসঙ্গ চিল পাক খাচ্ছে। শূঁষ সাক্ষী সেই চিলটার দিকে তাকিয়েই বাসুসাহেব বলেন, আমার মনে হয় সেইটাই সব চেয়ে ভাল হবে এক্ষেত্রে !

অরূপ রাগতভাবে বলে ওঠে, সর্বনাশ হয়ে যাবে তাহলে ! এখন আর তা কি করে সম্ভব ?

—কেন নয় ? স্ফূর্তিতা তো তার এভিডেন্স দেয়নি। যে মুহূর্তে স্ফূর্তিতা স্বীকার করে নেবে যে সে নিজেই আত্মরক্ষার্থে গুলি করেছিল সেই মুহূর্তেই এ কেস একেবারে ধ্বসে যাবে।

—তা তো যাবে ! কিন্তু স্ফূর্তিতাই যে তখন নতুন কেসে জড়িয়ে পড়বে ? স্ফূর্তিতাই হবে আসামী।

—তাই চাই আমি। কোশিকের বিরুদ্ধে একজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী আছে। তার দৃষ্টিশক্তি সম্বন্ধে আমি অতি নাটকীয়ভাবে আজ যেটা করেছি তার ফলাফল জুরিদের উপর কি হবে তা বলা যায় না। তাঁরা মনে করতে পারেন, হতে পারে বিনা চশমায় নকুল মাহুযজন ঠিকমত চিনতে পারেনি। কিন্তু ঘরে তিনজন মাত্র মাহুয ছিল। একজন খুন হল, বাকি দুজনের একজন পুরুষ একজন স্ত্রীলোক। দৃষ্টিশক্তির বিষয়ে সন্দেহ হলেও সাক্ষী একজন পুরুষমাহুযকে পিস্তল হাতে দেখেছিল এটুকু যদি জুরি মেনে নেয় তাহলেই গির্নিট ভাঙিষ্ট হয়ে যাবে। নকুল তার স্বচক্ষে যে ভাবে রিভলভারের আগুন ও ধোঁয়া দেখতে পাওয়ার কথা অস্বীকার করেছে তাতে সত্যই মনে হয়েছে যে মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছে না। কিন্তু স্ফূর্তিতা যদি এখন স্বীকার করে ফাঁকা ঘরে সে আত্মরক্ষার্থে গুলি চালিয়েছিল, তাহলে তার কোন সাক্ষী নেই, কোন প্রমাণ নেই ! শুধু স্ফূর্তিতার এজাহারের ভিত্তিতে ‘গির্নিট’ ভাঙিষ্ট হতে পারে না।

অরূপ বলে—আমি দৃঢ়তার সঙ্গে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করছি।

সুজাতা একবার তার দিকে তাকিয়ে দেখে, তারপর বাহুসাহেবের দিকে ফিরে শান্তভাবে বলে—আমি রাজি।

—কী বলছ সুজাতা! ধমকে ওঠে অরূপরতন—নিশ্চিত জেল হয়ে যাবে তোমার!

সুজাতা বলে, কিন্তু আমার বদলে সম্পূর্ণ নিরপরাধ কৌশিক যদি জেল খাটে তাহলেই কি শাস্তি পাব আমি?

—সেই কথাটাই ভাবছিলাম আমি! বললেন বাহুসাহেব সুজাতার পিঠে একখানা হাত রাখে।

অরূপ একই সুরে বলে, সেন্টিমেন্টালিটির জায়গা আদালত নয়। তুমি ইমোসানের বশবর্তী হয়ে এ প্রস্তাবে রাজি হচ্ছে!

—আমি তো তা অস্বীকার করছি না অরূপবাবু। আমার বদলে কৌশিক জেল খাটলে আপনার কিছু যায় আসে না, কিন্তু আমার যায় আসে।

—জানি! তুমি কৌশিককে ভালবাস! একথা তুমি অস্বীকার কর?

—অস্বীকার করব কেন? আমি তো এও জানি যে, আপনি আমাকে ভালবাসেন। আপনি অস্বীকার করতে পারেন?

—না আমি অস্বীকার করিনা। মো হোয়াট?

—তাই কি ‘জেলাস’ হয়ে আপনি বাধা দিচ্ছেন?

অরূপ উঠে দাঁড়ায়, বলে, এরপর এখানে থাকা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। তাছাড়া বাহুসাহেব মিনিয়ার। তাঁর মতের সঙ্গেও আমি একমত নই। ফলে আমাকে সরে দাঁড়াতে হচ্ছে। এ কেসে আমি আর অংশগ্রহণ করব না।

সুজাতা বলে—কিসের থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন অরূপবাবু?

আপনার মকেল কে? কার স্বার্থ আপনার দেখবার কথা? আমার? আপনার মকেল তো আসামী কৌশিক মিত্র! তার তরফে আমি আপনাকে উকিল হিসাবে নিয়োগ করেছি!

—বিনা পারিশ্রমিকে! বলে অরূপ তিক্ত স্বরে!

—না বিনা পারিশ্রমিকে নয়। আপনি কি নিতে অস্বীকার করেছিলেন, বলেছিলেন, সে সব কথা পরে হবে, আগে কৌশিকবাবুকে ছাড়িয়ে তো আমি!

যাক আপনার যদি মনে হয় এরপর আপনি এ কেসে অংশগ্রহণ করতে অপারক তাহলে তাই হবে। যে কদিন কোর্ট এ্যাটেণ্ড করেছেন তার বিল পাঠিয়ে দেবেন !

বাহুসাহেব বলেন, আহা এসব কথা উঠছে কেন ? শোন—

কিন্তু তাঁর কথা শেষ হওয়ার আগেই অরূপ বেগে বেরিয়ে যায়—

॥ ভেইশ ॥

ভিনার টেবিলে নৈশ আহারে বসেছিলেন সকলে।

ঘোষ সাহেবের বাড়িতে এই একটি সময় যখন সকলে এক হয়ে নিশ্চিন্তে ছুটো গল্প করতে পারেন। মধ্যাহ্নে সকলের একসঙ্গে আহার হয় না। ঘোষ সাহেব সকালেই ছুটো নাকে মুখে ঝুঁজে ছোটেন, কখনও অফিস থেকে আদালতিকে বাড়ি পাঠিয়ে দেন হট-কেসে খাবার নিয়ে আসতে। কাজের চাপ কম থাকলে মধ্যাহ্নে মাঝে মধ্যে বাড়ি এসেও আহালাদি সারেন। মেয়ে প্রগতি সাড়ে নয়টার মধ্যে খেয়ে কলেজে ছোট। আর মিসেস ঘোষের খাওয়ার তো কোন সময়ই নেই। তাই নৈশ আহারের এই পরিবেশে সারাদিনের ঘরোয়া কথার রোমন্থন হয়। প্রগতির ক্লাশে প্রক্সি দিতে গিয়ে কোন মেয়ে ধরা পড়েছে, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে কী জাতীয় হাঙ্গামা বেনামী দরখাস্ত এসেছে অথবা মিসেস ঘোষের বাগানে নূতন ফুলের চারাগুলো কিভাবে ছাগলের পেটে গেছে তার আলোচনার আর কোন বাধা থাকে না। কখনও বা বাহুসাহেব তাঁর বিশ্বতপ্রায় ব্যারিস্টারী জীবনের জটিল কেসের অবতারণা করেন। সেদিন ভিনার টেবিল থেকে উঠতে ঠুঁদের রাত হয়ে যায়। অজানা অচেনা আসামীর ভাগ্য হুলতে থাকে সওয়াল-জবাবের মরু প্ৰত্যয়। বাহুসাহেবের কাহিনীর সমাপ্তি হত নাটকীয় ভাবে। উপকথার গল্পের শেষে যেমন নটেগাছটির মৃত্যুসংবাদ অবধারিতভাবে এনে পড়ে, বাহুসাহেবও তেমনি গল্পের শেষে বলতেন, এরপর জুরিমহোদয়গণ পাশের ঘরে উঠে গেলেন। নাউ, আজ ছোট খুকি বলবে, বলেই মণিব্যাগ থেকে একটা নোট বার করে মাস চাপা দিয়ে বলেন, বল ছোটখুকি, কী ভাঙিষ্ঠ হল ? গিল্টি না নট-গিল্টি ?

উত্তর সন্তোষজনক হলে বাহুসাহেব হেসে বলতেন—রাইট ! তুমিই বাজি জিতেছ। এ নোটটা তোমার। তারপর মিসেস ঘোষের দিকে বলতেন মেয়েকে তুমি সায়েন্স পড়ালে খুকি, ওকে আইন পড়ানো উচিত ছিল।

আর উত্তর ভুল হলেই নোটখানা টেনে নিয়ে বলতেন, মেয়েটার মাথায় গোবর !

আজ আর সেসব কিছু হল না। আজ একজন বিশিষ্ট অতিথিও উপস্থিত ছিলেন খাবার টেবিলে। মিস্টার স্কুমার গুপ্ত আই-পি।

কথা প্রসঙ্গে ঘোষসাহেব বলেন, এটা কিন্তু আপনি ঠিক করলেন না, দাহ ! আপনার এক মক্কেল বেরিয়ে এল বটে, কিন্তু আর এক মক্কেল তার হুলাভিসিক্ত হল !

বাহুসাহেব শ্রুতের বোলটা টেনে নিয়ে বলেন, মক্কেলকে মিথ্যে সাক্ষী দিতে বলাই আমার উচিত ছিল বলতে চাও ?

—মিথ্যা ঠিক নয়, তবে—

—সত্য গোপন ? হেসে পাদ পূরণ করেন বাহুসাহেব।

তা কি জীবনে কখনও করেননি আপনার ব্যারিস্টারী জীবনে ?

প্রতি প্রশ্ন করেন এবার স্কুমার গুপ্ত।

—না ! সত্য গোপন করিনি গুপ্তসাহেব। তথ্য গোপন করেছি। এবং তাও করেছি শুধু একটি উদ্দেশ্যকে—সত্যকে প্রকাশ করতে ! জবাব দিলেন বৃদ্ধ।

ঠিক বুঝলাম না।

—সত্য জিনিসটি এমন বিরাট আর ব্যাপক যে আপনাদের তৈরী পিনাল কোডের ধারায় সে সব সময় আবদ্ধ হয় না। এ যেন জাল দিয়ে সূর্যের আলোক ধরবার চেষ্টা ! কিম্বা বলতে পারেন আইনের ক্যামেরার মধ্যাহ্ন সূর্যের ফটো তোলার চেষ্টা ! আলো ছাড়া আলোকচিত্র হয় না। কিন্তু নেগটিভে আলো লাগলে সব সাদা হয়ে যায়। আইনও তেমনি সত্যকে ছাড়া বাঁচেনা ; কিন্তু প্রথর সত্যের মধ্যাহ্ন তেজে আইনের ধারাগুলো অনেক সময় অকেজো হয়ে যায় ! তাই তথ্যের ছাতাটা ইচ্ছামত বাঁকিয়ে আমাকে লক্ষ্য রাখতে হয় আইনের লেনে যেন সরাসরি সত্যের প্রথর আলো না পড়ে। জীবনে তাই অনেকবার তথ্যকে সাজিয়েছি, বানিয়েছি, লুকিয়েছি,—ছায়া ফেলে যেমন আলোক ফোটার চিত্রকর, তেমনি করে

বিকৃতি তথোর সাহায্যে সত্যকে প্রকট করেছি ! একটা কথা বলতে পারি, যে মকেলের কাহিনী শুনে মনে হয়েছে সে নিরপরাধ নয়, তার কেস আমি হাতে নিতাম না !

মিসেস্ ঘোষ বলেন, আজ কোর্টে কি হল তাই বলুন !

—আজ সূজাতা তার এভিডেন্স স্বীকার করে নিল যে, আত্মরক্ষার্থে সে নিজেই গুলি করেছে, আর তাঁকে বাঁচাবার জন্যই কোশিক মিথ্যা এজাহার দিয়েছে, এবং সেই জন্যই সে তদন্তকারী অফিসারের কাছে প্রথমটায় কিছু বলতে চায়নি।

—বলেন কি ! তারপর ?

কোর্ট এ্যান্ডজর্নণ্ড হয়ে গেল। মামলা ডিসমিস হয়নি, মূলতুবি হল। কিন্তু আমার আবেদনে কোশিককে ‘বেল’ দেওয়া হয়েছে। জাস্টিস্ ভাদুড়ী স্ম-সোর্টো অর্ডার দিয়ে আদালতের ভিতরই সূজাতাকে গ্রেপ্তার করালেন, এবং ষতদিন না চার্জ তৈরী হচ্ছে ততদিন তাকে জেল-হাজতে রাখবার আদেশ দিলেন। কাল সকালে সূজাতাকে আবার একজন ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এজাহার দিতে হবে।

প্রণতি আর নিজেকে সামলাতে পারে না বলে—আপনি সূজাতাদিকে বলেছিলেন এ-কথা স্বীকার করে নিতে ?

—হ্যাঁ তাই বলেছিলাম। কারণ এই হচ্ছে টুথ, ছ হোল টুথ এ্যাণ্ড নাথিং বাট ছ টুথ !

সুকুমার গুপ্ত মাথা নেড়ে বলেন, মাপ করবেন বাহুসাহেব, আমারও মনে হচ্ছে না আপনি ঠিক করলেন।

বাহু হেসে বলেন—দাউ টু ক্রটাস ?

—তার মানে ?

—তার মানে, আমার তো ধারণা ছিল কালীবাসী জগদানন্দ মিত্র ছাড়া আপনি একমাত্র ব্যক্তি যে এতে খুশী হবে। আপনি চেয়েছিলেন কোশিক মিত্র এ মামলা থেকে বেকসুর হয়ে বেরিয়ে আসুক। সূজাতাকে আপনি চিনতেন না ; কিন্তু কোশিকের কোন সাজা হলে আপনার মনের মধ্যে একটা কাঁটা বিঁধে থাকত। তাই নয় ?

গুপ্তসাহেব বাঁহাতের কর্কটার দিকে তাকিয়ে বলেন, আপনি ঠিকই বলছেন, কোশিকের কোন সাজা হলে আমি অত্যন্ত আহত হতাম। ছেলেটা হ্যাণ্ডেড

পার্সেন্ট অনেস্ট ! এ কেসে তার জড়িয়ে পড়ার পিছনে আমারও হাত ছিল। পরোক্ষভাবে আমিও দায়ী, কিন্তু সে কথা বাক। আপনি কিন্তু একটা কথা ভুল বলেছেন। কৌশিক বেরিয়ে আসায় আমি এবং তার বাবা ছাড়া আরও একটি লোক আজ স্থিতির নিঃখাস ফেলেছে। সেও অত্যন্ত খুশী হয়েছে।

—জানি ! কিশোর ডালমিয়া ! তাই নয় ?

—আপনি কেমন করে জানলেন ?

—ছেলেটি আমার কাছেও এসেছিল। বললে, আমি শ্রীর পুলিশের সামনে পেয়েছি, সাক্ষী দেব। আপনি জেরায় আমাকে যা বলতে বলবেন, আমি তাই বলতেই রাজি আছি। আপনি আমার মুখ দিয়ে যা খুশী বলিয়ে নিন। কৌশিককে বাঁচাতেই হবে।

প্রণতি বলে, কিশোর ডালমিয়া কে দাত ?

—কৌশিকের ক্লাস ফ্রেন্ড। বড়লোকের ছেলে। বড় অদ্ভুত ছেলে, তার সঙ্গেও আমার দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল—ঐ তথ্য আর সত্য নিয়ে—

—তাই নাকি ? শুনি ব্যাপারটা।

বাসুসাহেব তখন বলতে থাকেন কিশোর ডালমিয়ার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত-কারের কথা।

কিশোর তার সঙ্গে দেখা করে বলেছিল, প্রয়োজনে সে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতেও রাজি আছে, মত শুধু একটি, কৌশিককে বাঁচাতে হবে।

বাসুসাহেব প্রশ্ন করেছিলেন, তুমি কি মনে কর কৌশিক এ অপরাধ করেনি ? সে মানুষ খুন করতে পারে না ?

কিশোর বলেছিল—না। শ্রীর তা আমি বলছি না। কৌশিক একটা হীরের টুকরো ছেলে ! সে যদি গুলি করে আগরওয়ালকে হত্যা করে থাকে তবে আমি নিশ্চিত যে সেজন্য বথেষ্ট ‘প্রভোকেশন’ ছিল ! আমি বিশ্বাস করি আজকের ভারতবর্ষে একশটা আগরওয়ালের মতো ব্ল্যাক-মার্কেটিয়ারের বদলে একটা কৌশিক মিত্রের বেঁচে থাকা দরকার !

বাসুসাহেব বলেন, কিন্তু দেশের আইন তো সে কথা বলে না !

কিশোর বলেছিল, আইন নিয়ে আপনার সাজ তর্ক করা আমার শোভা পায়না ; কিন্তু যে আইনে আপনারা ‘শেয়ালদ’ আর হাওড়া স্টেশান থেকে কাঁক বেঁধে উদ্বাস্ত বিধবা বুড়ির দলকে ধরে আনেন তাদের কোঁচড়ে চালের

পুঁটুলি বাঁধা আছে বলে, এবং যে আইনের বলে ময়ূরকেতন আগরওয়ালের গজামাটির ভেজালের তদন্তটা আপনারা চাপা দিতে পারেন, সে আইনকে ঠিক অতটা প্রহা করিনা আমি।

বাসুসাহেব বলেছিলেন, সেটা কি আইনের অপরাধ না আইন প্রয়োগ-কারীর অপরাধ ?

—তা আমি জানিনা, তবে এটুকু জানি যে আইনের বেড়াজালে আপনারা আমাদের বেঁধে ফেলেছেন। আমার এক বন্ধু আইনকে অস্বীকার করে ডাকাতি কেসে আজ জেল খাটছে, আর এক বন্ধু আইনকে স্বীকার করে আত্মহত্যা করেছে। আমাদের একমাত্র অপরাধ আমরা প্র্যানিং কমিশনের নির্দেশক্রমে এঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে দেশের কারিগরী কাজ জানা মানুষের অভাব মেটাতে চেয়েছিলাম।

ঠিক সেই মুহূর্তেই পাশের ঘরে ঝন্ঝনিয়ে টেলিফোনটা বেজে উঠল।

একজন চাপরাশি ছুটে গেল, একটু পরে ফিরে এসে বাসুসাহেবের দিকে ফিরে বললে—থানা থেকে বড় দারোগা আপনাকে ফোন করেছেন।

বাসুসাহেব ধীরে স্বস্থে উঠে গিয়ে ফোন ধরলেন : বাসু স্পিকিং।

এ-প্রাস্তবানী কি বলছে তা শুনতে পেলেন না এঁরা। ব্যারিস্টার সাহেব অনেকক্ষণ ওপক্ষের কথা শুনে শেষে বললেন,-না, রাত হ'ক, আজ রাত্রেই আমি শুনতে চাই। আমি যাব ?...থ্যাংস, বেশ তুমিই এস, আমি অপেক্ষা করছি।

বাসুসাহেব ফিরে এলেন।

ঘোষসাহেব বলেন, কি বলছিল রমেন ?

—কাদের আলি ধরা পড়েছে। সে অনেক কথা বলছে। তাকে নিয়ে আসতে বললাম।

—অনেক কথা কি বলছে ?

বাসুসাহেব মুচ্কি হেসে বলেন, সেটা আমার 'সিক্রেট'! তুমি জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট, প্রসিকিউটর লোক, তুমি তো আমার বিপক্ষ শিবিরের লোক।

ঘোষ হেসে বলেন, কিন্তু থানার দারোগা কি আমার লোক নয় ?

—হতে পারে ! সে যদি অযাচিত আমাকেই ফোন করে আমি কি করতে পারি ? ঘোষ, তুমি এক কাজ কর, টেলিফোন করে কাল সকালে আর্টটার

সময় পি. পি. মিস্টার মাইতিকে আসতে বল। রমেন শুধুকেও আসতে বল, আমার বলাটা ভালো দেখাবে না। নকুল ছই আর গণপতি জানাকেও বেন রমেন সঙ্গে করে নিয়ে আসে।

—এতগুলি লোককে ডেকে এনে কি হবে?

—সুজাতার বিরুদ্ধে নতুন করে চার্জ ফ্রেম করতে হবে তো? তার আগে আমি এ-কেসটা বিশ্লেষণ করতে চাই। আমি কতকগুলি সত্য, মাইণ্ড যু তথ্য নয়, সত্য আবিষ্কার করেছি, যা-নাকি তোমার থানা অফিসারের নজরে পড়েনি। সেগুলো আমি তোমাদের সামনে রাখতে চাই। কিন্তু তোমাদের সরকারী মেনিনারিতে আমার কোন স্থান নেই। তাই আমি তোমার সাহায্য চাইছি—

বাধা দিয়ে ঘোষসাহেব বলেন, বেশ তো, আমি না হয় এখনই নারদের নিমন্ত্রণ করে রাখছি। উঠে যান ঘোষসাহেব।

॥ চব্বিশ ॥

পরদিন যথানিয়মে প্রাতঃভ্রমণ মেরে বাসুসাহেব তাঁর সেই সিট্রিন গাড়ি চালিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাড়ীলোতে যখন ফিরে আসছিলেন তখনও আগরওয়াল ইণ্ডাস্ট্রিসের কারখানায় সকাল সাতটার ভেঁা বাজেনি। সকাল আটটার শহরের কয়েকজন বিশিষ্ট অতিথিকে আমন্ত্রণটা জানানো হয়েছে। নিমন্ত্রণকর্তা অবশ্য তিনি নন, ঘোষসাহেব—কিন্তু দায়িত্বটা তাঁর। গতকাল রাতে রমেন দারোগা ঘেসব তথ্য তাঁর কাছে পেশ করেছে, তারপর সমস্ত ব্যাপারটাকে তিনি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখতে পেয়েছেন। তবু সারারাত তাঁর ঘুম হয়নি। যুক্তির পারস্পর্যে একে একে বিশ্লেষণ করে দেখেছেন সমগ্র সমস্যাটা। বিছানায় শুধু এপাশ ওপাশ করেছেন। বিচার বিশ্লেষণের যে পথেই অগ্রসর হবার চেষ্টা করেছেন সে পথেই গিয়ে থেমেছে একটি নিরেট দেওয়ালের সামনে। যতগুলি ক্লু পেয়েছেন কার্য-কারণের সূত্রে সেগুলিকে এতদিন যুক্তিনির্ভর পারস্পর্যে গাঁথতে পারেন নি। কৌশিক ছেলেটির যে পরিচয় বিভিন্ন সূত্রে পেয়েছেন তাতে মনে হয়েছিল সে ক্রিমিনাল-টাইপ নয়। উদ্ভেজনার মুহূর্তে যথেষ্ট ‘প্রভোকেশন’ থাকলে সে হয়তো গুলি ছুঁড়তে

পারে, কিন্তু সেটা কি এই ভাবে লুকোবার চেষ্টা সে করত ? অপরপক্ষে ময়ূরকেতন আগরওয়াল লোকটা একটা ‘বর্ণ-ক্রিমিনাল’ ! সেই বা ওভাবে রিভলভারটা টেবিলের উপর লোডেড অবস্থায় কেলে রেখে বারে বারে উঠে যাচ্ছিল কেন ? ধস্তাধস্তি করার সময় আচম্কা গুলি ছুটে যাওয়ার থিওরিটা টেকেনি । সেক্ষেত্রে মৃতের পিঠের দিকে গুলি লাগার কোন যুক্তি থাকে না । একমাত্র সম্ভাবনা হতে পারত এই যে, চৌকাঠে ধাক্কা খেয়ে ওরা যখন পড়ে যায় তখন আগ্নেয়াস্ত্রটা আগরওয়ালের হস্তচ্যুত হয় এবং পতন জনিত আঘাতে রিভলভার থেকে গুলি ছুটে এসে আগরওয়ালকে বিদ্ধ করে । এটা প্রমাণ করতে পারলে মৃত্যুর জন্ত কাউকে দায়ী করা চলত না । অরূপরতন চেয়েছিল এই থিয়োরিটাকে প্রতিষ্ঠিত করতে । কিন্তু অপরাধ বিজ্ঞান নিয়ে যার জীবন কেটেছে সেই প্রসন্নকুমার যে এই থিয়োরিটাকে অবলম্বন করে প্রসন্ন হতে পারেন নি । তিনি যে জানতেন, ও জাতীয় দুর্ঘটনায় মৃতের পৃষ্ঠদেশে আঘাত হওয়ার সমস্তাটার সমাধান পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে সে ক্ষেত্রে মৃতের চামড়ায় দাহ-চিহ্ন থাকার কথা । গরম কোটের পিঠের দিকে যে অংশে ফুটো হয়েছে সেখানে বাকদের চিহ্ন অন্তর্বীক্ষণ যন্ত্রে ধরা পড়ার কথা । সে সব পাওয়া যায় নি । কিন্তু এ সব আপত্তি বাদীপক্ষ তোলেন নি ; আদৌ তুলতেন কিনা তা জানা যায় না, এ আপত্তি তুলেছিলেন স্বয়ং প্রসন্নকুমার বাহু ! আচ্ছা এ প্রশ্নটা স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে উত্থাপন করা কি মূর্থ্যমি হয়েছে তাঁর ? অরূপরতন তাই মনে করে । নিঃসন্দেহে এভাবে তিনি তাঁর মকেলের ক্ষতি করেছেন । এই চিন্তাটাই তাঁর নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিয়েছিল গতকাল রাতে । ঘটনাচক্রে একে একে অনেকগুলি তথ্য তাঁর সামনে উদ্ঘাটিত হয়েছে, তিনি নূতন নূতন সূত্রের সন্ধান করেছেন এবং অপরাধ-বিজ্ঞানীর যুক্তি-নির্ভর বিশ্লেষণে আশ্রয় তিনি বুঝতে পেরেছেন প্রকৃত সত্য কি । সেটা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েছেন যাত্র গতকাল রাতে, রমেন গুহর টেলিফোন পাবার পর । যখন তিনি ঘোষসাহেবকে বললেন সকলকে আমন্ত্রণ জানাতে । আগরওয়াল কেমন করে গুলিবিদ্ধ হয়েছিল এখন তিনি তা বুঝতে পেরেছেন, সেটার সন্দেহাতীত প্রমাণ দিতে পারবেন কিনা এখনও বলতে পারছেন না, সেটা নির্ভর করছে আশ্রকে তিনি যেভাবে আলোচনাটাকে পরিচালিত করতে পারবেন, তার সাফল্যের উপর । কিন্তু সে জন্ত তো নয়, ওর নিদ্রার ব্যাঘাত হচ্ছে অন্য একটি কারণে ।

প্রথমা এ হত্যামামলা সংক্রান্ত নয়, ক্রিমিনাল ল' ইয়ারের প্রফেশনাল এথিক্স নিয়ে।

বিচারের একেবারে প্রথম পর্যায়ে, বস্তুত প্রথম সাক্ষীর জেরার সময়ে তিনি তাঁর মক্কেলের উদ্ধার পাওয়ার একমাত্র পথটা নিজে হাতে চিরকুদ করে দিয়েছিলেন। তিনিই যুক্তি তুলে দেখিয়েছেন যে আগরওয়ালের পতন জনিত আঘাতে আচম্কা গুলি ছুটে যায়নি, যেতে পারে না। এ কথা যখন প্রতিষ্ঠিত করেছেন তখন তিনি ছিলেন সত্যাস্থেয়ী, তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সত্যকে উদ্ঘাটিত করা! প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু সত্য যদি তাঁর মক্কেলের স্বার্থের পরিপন্থী হয় সে ক্ষেত্রেও কি সেটা প্রকাশ করা তাঁর উচিত হয়েছিল? আদালতে প্রসন্নকুমার বাসুর ভূমিকাটা কি? তিনি সত্যাস্থেয়ী? না তো। তিনি ডিফেন্স কাউন্সেল। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য হওয়ার কথা তাঁর মক্কেলকে বাঁচানো। তাঁর মনে পড়ে গেল পনের বছর আগেকার একটা কেস। তাঁর জীবনের শেষ কেস। সে কেসে উনি হেরেছিলেন। না, শুধু হারেন নি, হেরেছিলেন এবং জিতেছিলেন :

সেটাও মনের মামলা। ফাস্ট-ডিগ্রি মার্ভারের চার্জ। আসামী একজন লক্ষপতি ধনীর একমাত্র উপযুক্ত পুত্র। মাত্র বছর খানেক বিবাহ করেছে, তার স্ত্রী তখন সন্তান সন্তবা। ছেলেটির মা এসে বাসুসাহেবের পা-দুটো জড়িয়ে ধরেছিল, বলেছিল—বিশ্বাস করুন সাহেব, আমার ছেলে এ কাজ করেনি, করতে পারে না। তাকে আমি পেটে ধরেছি, তাকে আমি মানুষ করেছি। আমার এত বড় সর্বনাশ সে করবে না। বাসুসাহেব বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন, বলেছিলেন আপনি অমন করবেন না, আপনার ছেলের সঙ্গে আগে কথা বলি; যদি বুঝি সে নিরপরাধ, তখন আমার যেটুকু সাধ্য তা আমি করব।

কেসটা আদালত শুনে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, মিথ্যা। কেসে ছেলেটিকে জড়ানো হয়েছে। খুন হয়েছিল আসামীর বাপ, বন্দুকের গুলিতে। বাড়িতে নয়, গদিতে। ওর বাপের অনেক দোষ ছিল, অত্যন্ত কপণ, মদ্যপায়ী, দুশ্চরিত্র,—কিন্তু মৃত্যুর পর দেখা গেল সমস্ত সম্পত্তিই সে উইল করে দিয়ে গেছে তার একমাত্র পুত্রকেই। অল্প অল্পসন্ধান করে বাসুসাহেব বুঝতে পেরেছিলেন মৃতের শত্রুর অভাব ছিল না, অনেকের অর্থ আত্মসাৎ করেছেন তিনি আইনের চোরাপথে। সচোবিধবার অন্বেষণে তিনি কেসটা হাতে নিয়েছিলেন, নিরলস পরিশ্রমে দিনের পর দিন রাতের পর রাত ঐ কেস নিয়ে পড়েছিলেন। সে কেস

ভিতেছিলেন বাহুসাহেব। ছেলেটি বেকসুর খালাস পেয়েছিল। কিন্তু তার পরেই একটা প্রচণ্ড আঘাত পেলেন তিনি। মৃত্তির আনন্দে ছেলেটি স্বতঃ-প্রণোদিত হয়ে তাঁর কাছে জনান্তিকে স্বীকার করেছিল, সেই অপরাধী! একমাত্র পুত্রবধূর প্রতি বৃদ্ধ আসক্ত হয়ে পড়ায় সে মাথার ঠিক রাখতে পারেনি।

বাহুসাহেব সেই যে গাউনটা খুলে ফেলেছিলেন, তারপর আর পরেন নি। অবসর নিয়েছিলেন কর্মজীবন থেকে।

পনের বছর পর আবার এই কেসটা হাতে নিয়েছিলেন।

এবারও বুঝে উঠতে পারছেন না তিনি ঠিক পথে চলেছেন কিনা। বাকুদের চিহ্ন এবং ‘চার্ড’ না-হওয়ার কথাগুলো প্রতিষ্ঠিত করা তাঁর মক্কেলের স্বার্থের বিরুদ্ধে গিয়েছে, স্জাতাকে দিয়ে সত্য স্বীকার করানোতে কেসটা তার বিরুদ্ধে গিয়েছে—এ নিয়ে অরূপরতনের সঙ্গে তাঁর মতাস্তর থেকে মনাস্তরও হয়েছে; তবু এ পথ ছাড়া অন্য কোন পথে তিনি চলতে পারেন নি। প্রথম থেকেই তিনি বেশ বুঝতে পেরেছিলেন যে, কৌশিক মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে। দায়িত্ব নিজের স্বন্ধে তুলে নিয়েছে। তার একমাত্র উদ্দেশ্য হতে পারে সে স্জাতাকে বাঁচাতে চেয়েছিল। সে ক্ষেত্রে ধরে নিতে হবে যে অন্তর্গত কৌশিক নয়, স্জাতার হাতে ছিল। কিন্তু তাও তো মেনে নেওয়া যাচ্ছে না। স্জাতার সাক্ষ্য পুরোপুরি মেনে নিলে ধরে নিতে হয়, সে যখন গুলি করেছিল তখন আগরওয়ালা তার দিকে ফিরে আছে। তাহলে বুলেটটা বুকে লাগার কথা, পিঠে নয়! এ থেকে সন্দেহ হয় স্জাতা কি কৌশিককে বাঁচানোর জন্য আবার মিথ্যে এজাহার দিল না কি? কে কাকে বাঁচাচ্ছে? সব দিক থেকে নকুল ছইয়ের সাক্ষ্যই বিশ্বাসযোগ্য। তার সাক্ষ্য মেনে নিলে চামড়া পুড়ে না যাবার, বাকুদ চিহ্ন না থাকার এবং পিঠের দিকে গুলি লাগার সব কটা সমস্তারই সম্ভাবজনক কৈফিয়ৎ পাওয়া যায়। তার সাক্ষ্যের বাকি অংশও নির্ভরযোগ্য। অর্থাৎ কৌশিকের অসুযোগে, শুধু ফাঁকা অসুযোগে নয় নিশ্চয়, কানুন মূল্যে শোধনকরা অসুযোগে সে প্রথম তদন্তের সময় মিথ্যা কথা বলেছিল।

তা হ’ক তবু নকুল ছইয়ের আচরণেও অসঙ্গতি আছে। প্রথমতঃ সে সন্ধ্যার পরে লক্ষী সাহার দোকানে আদৌ আসেনি, আসতে পারে না। সন্ধ্যা ছয়টা থেকে রাত্রি অন্তত আটটা কুড়ি পর্যন্ত তার কার্যকলাপের হিসাব পাওয়া

যাচ্ছে। অথচ সে লক্ষীসাহার দোকানে একটা মিথ্যা ‘এ্যালোবাই’ খাড়া করেছে। দ্বিতীয়তঃ তার স্টেটমেন্ট অনুযায়ী কৌশিক তার মিনিট খানেক আগে বাগানবাড়িতে আসে। কৃষ্ণপক্ষের রাত, বাগানের রাস্তাটা সম্পূর্ণ জনমানব শূন্য এবং রাস্তায় কোন বাঁক সেখানে নেই। অমন সোজা রাস্তায় কৌশিক যদি নকুলের ঠিক আগে আগে শহর থেকে সাইকেলে বাগানবাড়িতে এসে থাকে তাহলে বিনা চশমাতেও অনেক দূর থেকে একটি আলোকবিন্দুকে নকুল দেখতে পেত। রাস্তা ছেড়ে যদি সে বিন্দুটা বাগানবাড়ির গেটের দিকে বাঁক নিয়ে থাকে তবে তা নকুলের দৃষ্টি কিছুতেই এড়াতে পারে না। কিন্তু সে কথা সে বলেনি। বলেছে, গাছের গায়ে অপর একটি সাইকেল দেখে সে চমকে ওঠে। তৃতীয়তঃ সাক্ষীর কাঁঠ গড়ায় দাঁড়িয়ে টাইম-ক্যাকটারটাকে বারে বারে সে এড়িয়ে যেতে চেয়েছে। কেন?

নিঃসন্দেহে নকুল একটা মিথ্যা ‘এ্যালোবাই’ খাড়া করার চেষ্টা করেছে। ‘এ্যালোবাই’ লোকে খাড়া করে কেন? প্রমাণ রাখতে যে অপরাধের সময়ে সে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল না, থাকতে পারে না, যেহেতু সে অগত্যা ছিল। কিন্তু এ হত্যামামলার নকুলের জাড়িয়ে পড়ার তো কোন সম্ভাবনা নেই। কৌশিক বা সূজাতা কেউই কখনও বলেনি যে নকুল ছই হত্যাকারী। তার কোনও মোটিভও নেই। তাহলে সে এভাবে মিথ্যা ‘এ্যালোবাই’ খাড়া করতে চেয়েছে কেন? লক্ষী সাহাকে রাজি করাতে নকুল নিশ্চয় যথেষ্ট খরচ করেছে। তার দোকানের ক্যাশমেমো বইয়ের গতদিনের বিক্রির পর শেষ ভাউচারখানি গতদিনের তারিখ দিয়েই তাকে সংগ্রহ করতে হয়েছে! সাইকেল সারানোর দোকানে অবশ্য খোঁজ করা হয়নি। করলে নিশ্চয় দেখা যাবে গোকুল বাড়ুই হলপ খেয়ে বজবে রাত সওয়া আটটা থেকে সাড়ে আটটা পোনে নটা পর্যন্ত নকুল ছই তার দোকানে সাইকেল সারাচ্ছিল। বিনা পরসায় এসব হয় না। তাহলে এসব কাজ নকুল করেছে কেন?

চিন্তা করতে করতে হঠাৎ একসময় অন্য একটা সম্ভাবনার কথা বাসুসাহেবের মনে হয়েছিল। ঠিক কথা। এ কথা তো আগে খেয়াল হয়নি। নকুল ‘এ্যালোবাই’ খাড়া করেছিল হত্যাকাণ্ডের পরে নয়, আগে। আগরওয়াল-হত্যা আশঙ্কা করে নয়। সূজাতা-হত্যা মামলা এড়াবার জন্য! সে আশঙ্কা করেছিল রিসার্চের কাগজগুলো হস্তগত হলে আগরওয়াল সূজাতাকে এ দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবে। হয়তো এ পরিকল্পনা আগে থেকেই তুঙ্গনে করে রেখেছিল।

কৌশিকের সঙ্গে সূজাতা ঘটনার দিন যখন পালাবার পরামর্শ আঁটে তখন নকুল সেটা জানতে পারে। সে নিশ্চয় তখনই টেলিফোনে আগরওয়ালকে জানায়। এবং আগরওয়ালকে তখন ট্রেনের জন্য অপেক্ষা না করে গাড়ি করেই চলে আসার কথা জানায়। তখনই কাদের আজিকে গত খুঁড়ে রাখার নির্দেশ দিয়েছিল নিশ্চয়, কারণ একা মাত্রের পক্ষে অতবড় গত খুঁড়তে অসম্ভব ঘট। চার-পাঁচ সময় লেগেছে।

ফলে নকুল তখনই বুঝতে পারে ঐ দিন রাত্রেই আগরওয়ালের বাগান বাড়িতে সূজাতার মৃতদেহ কবর দেওয়া হয়ে। নিঃসন্দেহে ‘অকালবসন্ত’ নাটকের পাণ্ডুলিপি থেকে সূজাতার আত্মহত্যার স্বীকৃতি নকুলই ছুঁগিয়েছিল ময়ূর-কেতনকে। নকুল তাই নিজেকে বাঁচানোর জন্য আগে থেকে একটা ‘এ্যালেবাই’ খাড়া করেছিল—মৃত্যুর সময়টা তার জানা ছিল না, বাক্সী মাহার কাছ থেকে তাউচরখানা সংগ্রহ করে রেখেছিল তখনই। বোধহয় সময়টা তাকে পরে জানিয়ে দেবে, এই চুক্তি হয়েছিল। ঘটনাটকে সূজাতার বদলে আগরওয়াল খুন হয়ে যাওয়ায় সে জোড়াতালি দিয়ে ব্যাপারটা ম্যানেজ করতে চেয়েছে। স্তবরাং মিথ্যা ‘এ্যালেবাই’য়ের জন্য নকুলকে দায়ী করা চলে না।

বাঙলোয় ফিরে এসে বাহুসাহেব গাড়িটাকে গ্যারেজে তুললেন। বারান্দায় উঠে আসতেই আদালী জানায় দুজন ভদ্রলোক তাঁর অপেক্ষায় বসে আছেন। বাহুসাহেব হাতঘড়িটা দেখলেন। দাতটা পাঁচশ। এখনও অভ্যাগতদের আসবার সময় হয়নি।

বৈঠকখানাতে প্রবেশ করতেই কৌশিক ও অরুপরতন আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। নমস্কার করে।

—বস, বস, কী পবর ? বাহুসাহেব নিজেও উপবেশন করেন।

অরুপ একটু কুঠার সঙ্গে বলে, দেখুন এ ব্যাপারে আমার কিছু বলতে আসা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না, কিন্তু—

তাকে ধামিয়ে দিয়ে কৌশিক বলে, মিঃ মহাপাত্র, সমস্তটা আমার, বক্তব্যটাও আমার। আপনার কুঠার তো কোন প্রয় নেই। যা বলবার আমাকেই বলতে দিন।

—বেশ, তাই বলুন। থেমে পড়ে অরুপরতন।

কৌশিক বেশ সপ্রতিভভাবে বলে—মিঃ বাহু আমার সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ পরিচয় হয়নি, কিন্তু আসামীর কাঠগড়ার আমাকে আপনি দেখেছেন, আমিও

আপনাকে ডিফেন্স কাউন্সেল হিসাবে দেখেছি। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, কে আপনাকে ডিফেন্স কাউন্সেল হিসাবে নিয়োগ করেছিল ?

বাসুসাহেবকে গম্ভীর হতে হয়। পকেট থেকে পাইপ ও টোব্যাকো পাউচটা বার করতে করতে বলেন : শ্রীমতী সূজাতা চট্টোপাধ্যায়।

—আপনাকে কি তিনি কিছু ‘রিটেইনার’ দিয়েছেন ?

আরও গম্ভীর হয়ে বাসুসাহেব বলেন—না !

—অনারাসে আপনি আমার সঙ্গে হাজতে দেখা করতে পারতেন। কিন্তু আমার ডিফেন্স দেওয়ার আগে কি সেটা আপনি প্রয়োজন মনে করেন নি ?

বাসুসাহেবের পাকা-আমটির মত মুখখানা থম্‌থম্‌ করতে থাকে। এবারও সংক্ষেপে তিনি বলেন,—না !

—সে ক্ষেত্রে আমি আপনাকে আমার এ্যাটর্নি-হিসাবে স্বীকার করিনা, এ কথাটা দয়া করে মনে রাখবেন কি ?

—আপনার ডিফেন্সের আর প্রয়োজন নেই।

—আশা করি এরপর এ মামলায় আপনি আর নাক গলাবেন না।

বাসুসাহেব বলেন, আপনি ভুল করছেন মিঃ মিত্র ! আগরওয়াল হত্যা মামলায় আপনি এখন আর আসামী নন। এ মামলায় যিনি আসামী তিনি আমাকে ডিফেন্স কাউন্সেল হিসাবে নিয়োগ করেছেন। তাঁর নাম সূজাতা চট্টোপাধ্যায়। ফলে, আশা করি এ মামলায় আমার কাজে আপনি নাক গলাবেন না।

অরূপ বাধা দিয়ে বলে, মাপ করবেন মিঃ মিত্র। ঠিক যে সুরে আলোচনাটা চলা উচিত, সেভাবে কথাবার্তা চলছে না, তাই আমাকে কথা বলতে হচ্ছে। মিঃ বাসু, কিছু মনে করবেন না। কৌশিকবাবু আমাকে সূজাতাদেবীর তরফে ডিফেন্স-কাউন্সেল হিসাবে নিয়োগ করতে চান।

বাসুসাহেব বলেন, সে-ক্ষেত্রে আমাদের দুজনের দাবীর চূড়ান্ত মীমাংসা একজন লোকই করতে পারেন ;—তিনি আমাদের মক্কেল, সাবালিকা সূজাতা দেবী। আমি তাঁর লিখিত ওকালতনামা পেয়েছি, আপনি উকিল হিসাবে তাঁর সঙ্গে হাজতে দেখা করে সেটা ক্যানসেল করিয়ে আপনার নামে ওকালতনামা এনে আমাকে দেখান !

এই সময় একজন আদালী একটি স্লিপ কাগজ এনে দিল বাসুসাহেবের

হাতে। এক নজর দেখে নিয়ে বাহু অরূপরতনকে বললেন, নকুল হই আর গণপতি জানা এসেছেন।

—আমরা তাহলে উঠি ?

—উঠতে চাইলে বাধা দিতে পারি না, বসলে খুশি হতাম।

—বসে কি করব ?

—মিস্টার ঘোষ আমার পরামর্শে কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোককে আজ সকাল আটটায় এখানে আসতে বলেছেন। ঐ কেসের ব্যাপারেই। স্বজাতার বিরুদ্ধে এখনও চার্জ ফ্রেমড হয়নি। এ অবস্থায় পরিস্থিতিটা আমরা ঘরোয়া ভাবে আগে আলোচনা করে নিতে চাই। আপনাদের দুজনকে আমন্ত্রণ করতে আমি সাহসী হইনি, কিন্তু ঘটনাচক্রে যখন আপনারা দুজনেই এসে পড়েছেন তখন থেকে গেলে এবং আলোচনার অংশগ্রহণ করলে আমি সত্যি খুশী হতাম।

কৌশিকের সঙ্গে অরূপের একবার দৃষ্টি বিনিময় হয়।

অরূপ বলে, বেশ এ অধ্যায়টা দেখেই যাই।

বাহুসাহেব আদালীকে বলেন, তাঁদের দুজনকে ডেকে নিয়ে এস।

তারপর অরূপের দিকে ফিরে বলেন, আমাকে একটু মাপ করতে হবে। আমি এখনই আসছি। আপনারা বসুন।

॥ পঁচিশ ॥

আধঘণ্টা পরের কথা।

ঘোষসাহেবের বৈঠকখানায় অনেকেই এসে বসেছেন। প্রকাণ্ড ঘর তবু ফাঁকা লাগছে না। অটলিস-সার্জেন ডাঃ সান্তাল, পাবলিক প্রসিকিউটর নিরঞ্জন মাইতি, অরূপরতন, কৌশিক, গণপতি জানা ও নকুল হই বসেছে পর পর। এঁদের মুখোমুখি বসেছেন তিনজন, বাহু সাহেব, স্বকুমার ও গুপ্ত এবং গৃহস্বামী বিপুল ঘোষ।

বাহুসাহেব বলেন, আপনাদের সকলকে আজ জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ঘোষ এখানে আসতে অস্বরোধ করেছেন একটি বিশেষ কারণে। আপনারা জানেন আমি দীর্ঘদিন প্র্যাকটিস ছেড়ে দিয়েছি। তবু বিশেষ অস্বরোধে পড়ে স্টেট-

ভার্সেস-কৌশিক মিত্রের যে কেসটা এখানকার আদালতে চলছিল তার ডিফেন্স-কাউন্সেল হিসাবে আমি এতদিন কাজ করছিলাম। আমার সে ভূমিকা শেষ হয়েছে। কিন্তু আপনারা জানেন, গতকাল সেই কেসটা এমন একটা মোড় নিয়েছে যাতে আর একটা মামলা আদালতে আসন্ন হয়ে উঠেছে। আই মীন, স্টেট-ভার্সেস-সুজাতা চট্টোপাধ্যায়ের কেস। সে মামলা এখনও আদালতে ওঠেনি, বস্তুত সুজাতার বিরুদ্ধে এখনও চার্জই ফ্রেম করা হয়নি। এ অবস্থায় আমরা যদি নিজেদের মধ্যে ঘরোয়া আলোচনা করি তাতে কারও আপত্তি হবার কথা নয়। হয়তো এভাবে আমরা প্রকৃত সত্যকে উদ্ধার করতে পারিব।

আমি জানি, এটা আদালত নয়। আমি কাউকে কোন প্রশ্ন করতে পারিনা। সে অধিকার আমার নেই। তবে আমি আশা করব সাধারণ ভাবে আমি যেসব প্রশ্ন আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরব তার জবাব জানা থাকলে আপনারা অকুণ্ঠ ভাবে তা জানাবেন। যদি আপনাদের মনে কোন প্রতিপ্রশ্ন জাগে তাও অসঙ্কোচে পেশ করবেন।

আগরওয়ালের মৃত্যু রহস্যের বিষয়ে তিনটে থিয়োরি আমরা পেয়েছি। এছাড়া অন্য কোন থিয়োরির কোন সম্ভাবনা নেই। প্রথম থিয়োরি হচ্ছে একটা ধস্তাধস্তির সময় আচম্কা গুলি ছুটে গিয়েছিল। এই থিয়োরিটার মূল বনিয়াদ মিস্টার কৌশিক মিত্রের স্বতঃপ্রণোদিত স্বীকৃতি। মনে রাখতে হবে প্রাথমিক পর্যায়ে নকুলবাবু এবং সুজাতা দেবী উভয়েই এই থিয়োরিটাকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তী বিচার বিশ্লেষণে এ থিয়োরিটা টেকেনি। ধস্তাধস্তির সময় আচম্কা গুলি ছুটে গেলে ধার হাতে রিভলভারটা থাকে তার পিঠের দিকে গুলিবিদ্ধ হওয়া প্রায় অসম্ভব। এভাবে গুলিবিদ্ধ হওয়ার আর একটা সম্ভাবনা ছিল, যদি আমরা মেনে নিতে পারতাম যে আগরওয়াল গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়েনি, প'ড়ে গুলিবিদ্ধ হয়েছে—অর্থাৎ পতনের পূর্বেই অস্ত্রটা তার হস্তচ্যুত হয় এবং সে তার উপরেই পড়ে। কিন্তু তিনটি কারণে তা আমরা মেনে নিতে পারছি না। তার দেহে দাহ-চিহ্ন ছিল না, বারুদের অস্তিত্ব তার দেহে বা কোটে পাওয়া যায়নি, এবং রিভলভারটা মৃত্যুর পরেও তার হাতে ধরা ছিল। এ ছাড়াও কথা আছে, প্রাথমিক পর্যায়ে এ থিয়োরি মেনে নিলেও সুজাতা দেবী এবং নকুলবাবু উভয়েই পরে একথা অস্বীকার করেছেন। কলে এ থিয়োরিটাকে আমরা কোনমতেই মেনে নিতে পারছি না।

দ্বিতীয় থিয়োরি হচ্ছে, সৃজাতা দেবী পরে যা বলেছেন, অর্থাৎ আত্মরক্ষার্থে তিনিই গুলি ছুঁড়েছিলেন। তাঁর এ বক্তব্য অনুযায়ী কৌশিকবাবুর মিন্ধা সাক্ষ্য দেবার উদ্দেশ্য স্পষ্ট বোঝা যায়, মৃতদেহের চামড়ায় প্রদাহ-চিহ্ন না থাকার ও বাকদের চিহ্ন না থাকার ষোক্তিকতার সন্ধান পাওয়া যায়; কিন্তু একটা প্রধান সমস্যা সে ক্ষেত্রেও থেকে যাচ্ছে—মৃতদেহে গুলি পিছন দিক থেকে প্রবেশ করল কি করে?

গণপতি জানা দাঁড়িয়ে ওঠে : আমি একটা কথা বলতে পারি তার ?

—বলুন, বলুন। না না, বসে বসেই বলুন।

কিন্তু দু-পায়ে দাঁড়িয়ে না উঠলে গণপতি মন্তব্য করতে পারে না। অনুরোধ অগ্রাহ করে সে দাঁড়িয়েই বলে—মাননীয় ম্যাডিস্ট্রেট সাহেবকে আমি আসামীর স্বীকারোক্তিটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করে দেখতে বসি—

বাধা দিয়ে বাসু-সাহেব বলেন, লুক হিয়ার মিস্টার জানা, এখানে আসামী আপনি কাকে বলছেন? এটা আদালত নয়—

—আমি শ্রীযুক্তা সৃজাতা দেবীর কথাই বলছি। তিনি তার স্বীকারোক্তিতে বলেছেন, স্বেচ্ছায় তিনি একবার গুলি করেছেন বটে, কিন্তু তাঁর হাতে ত-বার ফায়ার হয়েছে। তাঁর হাত এত কাঁপছিল যে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও দ্বিতীয়বার ফায়ার হয়ে যায়। দুবার গুলির আওয়াজ তিনি স্বকর্ণে শুনেছেন, এবং রিভলভারটিতেও দুটি ডিস্চার্জড বুলেট পাওয়া গেছে। তাই নয়?

—বলে যান।

—আমি যদি বলি, প্রথমবার স্ব-ইচ্ছায় গুলি বর্ষণের পরেও সৃজাতা দেবী এতদূর বিহ্বল হয়ে পড়েন যে তাঁর সামনে কি ঘটছে তা তিনি লক্ষ্য করতে অশক্ত হয়ে পড়েন? মনে করুন, দুটি ফ্যারিউএর ইন্টারভ্যাল তিন-চার সেকেন্ড। ধরা যাক প্রথম গুলি আগরওয়ালের গায়ে লাগেনি, পোলাদরক্ত দিয়ে বেরিয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে কি হবে? আগরওয়াল এই বিখ্যাসেই এগিয়ে আসছিল যে সৃজাতা দেবী স্বীলোক হয়ে নরহত্যা করতে পারবেন না। কিন্তু যে মুহূর্তে সৃজাতা দেবী প্রথম গুলি ছুঁড়লেন, সেই মুহূর্তেই তার হুল ভেঙে যাবে। প্রাণধারণের তাড়নায়, রিক্সেক্সএ্যাকসন হিসাবে সে তৎক্ষণাৎ পালাতে চাইবে। পরবর্তী ঐ তিন-চার সেকেন্ড সে নিশ্চয় পিছন ফিরে পালাতে চেয়েছিল! এবং তখন দ্বিতীয় গুলিতে সৃজাতা দেবী তাকে বিদ্ধ করেন—

অরূপ বলে ওঠে, অর্থাৎ যেবার অনিচ্ছাকৃতভাবে তাঁর হাতে ফারার হয়ে যায় ?

—ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা বলা শক্ত, আমার বক্তব্য, যেহেতু স্বজাতা দেবী স্বীকার করেছেন যে প্রথম গুলিবর্ষণের পরেই তিনি অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে পড়েন এবং থর থর করে কাঁপতে থাকেন, তাই ঐ তিন-চার সেকেন্ডে আগরওয়াল পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল কিনা তিনি তা লক্ষ্য করেন নি !

ঘোষসাহেব বলেন, সম্ভাব্য যুক্তি !

সুকুমার গুপ্ত বলেন, সে ক্ষেত্রে কিন্তু ধরে নিতে হবে, কৌশিক মিত্র এবং নকুল ছই দুজনেই মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন। কৌশিক মিত্রের মিথ্যা সাক্ষ্য দেবার একটা কৈফিয়ৎ আছে, তিনি স্বজাতার অপরাধ নিঃস্বক্ষে তুলে নিতে চেয়েছিলেন ; ঠিক নিজের কাঁধে নয় অবশ্য, এটা একটা এ্যাকসিডেন্ট এই কথাই প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, নকুলবাবু কেন খামোখা এমন জলজ্যান্ত মিথ্যা কথা বলে যাবেন ?

নকুল ছই তার কুংকুতে চোখ দিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল বাহুসাহেবের দিকে। কিছু একটা বলবার জন্য গলা-খাঁকারি দিতেই গণপতি তার কোটের হাতা চেপে ধরল। গণপতি বলে ওঠে—এ প্রশ্নের জবাব নকুলবাবু আদালতে দেবেন। ঘরোয়া আলোচনায় এ প্রশ্ন না ওঠাই বাঞ্ছনীয়।

বাহু-সাহেব বলেন, বেশ, এবার তাহলে আমরা তৃতীয় থিরোরিটা যাচাই করে দেখি। যা নাকি নকুলবাবু স্বচক্ষে দেখেছেন বলেছেন ! অর্থাৎ কৌশিক মিত্র আগরওয়ালকে গুলি করেছিল, যখন সে ছুটে পালাতে চাইছে। এ থিরোরিতে পিছন দিকে গুলি লাগা, দেহচর্মে দাহচিহ্ন না থাকা এবং স্বজাতা ও কৌশিকের দুজনেরই মিথ্যা সাক্ষ্য দেবার প্রচেষ্টার কৈফিয়ৎ পাওয়া যায়। আমার তো মনে হয় এটাই সবচেয়ে সম্ভাব্য সমাধান।

অরূপরতন বলে ওঠে—আমি কিন্তু আপনার সঙ্গে একমত নই। এ থিরোরির একমাত্র ভিত্তি প্রত্যক্ষদর্শী নকুলবাবুর সাক্ষ্য। প্রথমতঃ বিনা চলমায় তিনি কতদূর দেখতে পেয়েছিলেন সেইটাই বিচার্য। দ্বিতীয়তঃ রিভলভারটা আগরওয়ালের, কৌশিকবাবু সেটা কেমন করে হস্তগত করলেন সেটাও আমাদের ভেবে দেখতে হবে। তৃতীয়তঃ একমাত্র নকুলবাবুই সত্যকথা বলছেন বলে যদি ধরে নিই, তবে তাঁর সমুদ্র কার্যকলাপের বৌদ্ধিকতা আমাদের যাচাই করে দেখতে হবে। একথা অনস্বীকার্য যে তিনি একটা

মিথ্যা “এ্যালোবাই” খাড়া করবার চেষ্টা করেছিলেন। ঘটনার দিন সন্ধ্যার পর তিনি আদৌ লক্ষ্মী সাহার দোকানে এসেছিলেন কিনা এ বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে—

হঠাৎ রমেন-দারোগা দাঁড়িয়ে উঠে বলে, ফর য়োর ইন্ফরমেশন্ স্মার, লক্ষ্মী সাহার এজাহার আমরা নিয়েছি, তিনি লিখিত স্টেটমেন্ট দিয়েছেন যে ঘটনার দিন, দিনের বেলায় তিনি নকুলবাবুকে এক বোতল মদ বিক্রি করেন, সন্ধ্যার পর নকুলবাবু তাঁর দোকানে আদৌ আসেন নি।

বাসুসাহেব হেসে বলেন, আর লক্ষ্মীসাহা এ কথাও নিশ্চয় বলেছে যে, দিনের বেলা নকুলবাবু মদের বোতলটা কিনে নিয়ে যাবার পরে আর সে দিন তার দোকানে কিছু বিক্রয় হয়নি?

—হ্যাঁ স্মার, তাও সে বলেছে।

বাসুসাহেব গণপতির দিকে ফিরে বলেন, আপনি যদি মনে করেন যে আদালত ছাড়া আপনার মক্কেল কোন কথা বলবেন না, তাহলে এ প্রহসনের আর প্রয়োজন কি?

গণপতি তৎক্ষণাৎ বলেন, না না, তা কেন হবে? হজুর যখন তাঁর বাঙালোয় ডেকে এনে সব কথা শুনতে চেয়েছেন, তখন সব কথাই বলবে নকুল। বল বল না হে, সব কথা হজুরের কাছে খুলে বল। রাখলেও উনি, মারলেও উনি।

নকুল হাত দুটি জোড় করে উঠে দাঁড়ায়।

—আপনি বসে বসেই বলুন, বলেন ঘোষসাহেব।

কিন্তু না। খোদ ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেবের সামনে গদি-আঁটা সোফায় বসে জবানবন্দী দেবার কথা কল্পনাই করতে পারে না নকুল হই। গলাবন্ধ কোটের গলার বোতামটা খুলে নিয়ে হাত দুটি জোড় করেই বলতে থাকে—হজুর মা-বাপ! অপরাধ যা করেছি, তা করেছি। তবে সব কথাই এবার শ্রীচরণে নিবেদন করব। তারপর আপনি রাখুন আর ফাঁসী দিন।

—ভূমিকা তো হল, এবার বলুন।

—হজুর, মালিকের কাছে দশবছর চাকরি করছি। তিনি স্বর্গে গেছেন তাঁর কথা এভাবে বলা আমার ঠিক হচ্ছে না। কিন্তু কি করব বলুন, আমি ছিলাম হকুমের চাকর। যা বলেছেন, তামিল করে গেছি। গোড়া থেকেই বলি। মালিক একদিন আমাদের রিহাসাঁলে এসেছিলেন। পরদিন আমার

আমার কাছ থেকে ঐ নাটকটা চেয়ে নিয়ে তার একখানা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে বললেন, পাতাটা আমার কাছে থাক। শুনে হজুর আমার হাত পা পেটের ভিতর সেদিয়ে গেল। আমি জানতাম, মালিকের নজর পড়ে আছে সৃজাতা-দেবীর বাবার সেই কাগজগুলোর উপর। আমাকে মালিক হুকুম দিয়ে রেখেছিলেন যে কাগজগুলোর সন্ধান পাওয়া মাত্র তাঁকে জানাতে, ঘটনার দিন সকালে যখন সৃজাতা দেবী ঐ বিজ্ঞানসের, গুড়ি কৌশিক মিত্র মশায়ের সঙ্গে পালাবার পরামর্শ করেন তখন আমি তা জানতে পারি। স্বীকার করছি হজুর খবরটা আমিই তাঁকে টেলিফোনে জানাই। তিনি তখন কলকাতার হোটেলেরে ছিলেন। রাত্রে মেলগাড়িতে গুর আসার কথা ছিল। কিন্তু আমার কাছ থেকে খবরটা শুনে উনি বললেন, তখনই গাড়ি নিয়ে উনি রওনা দিচ্ছেন। বাগানবাড়িতে কাদেরকে খবরটা দিতে বললেন। আমার তখনই সন্দেহ হল, হজুর, যে মালিক আজ একটা হেস্ট নেস্ট করবেন। বাগানবাড়িতে কাদের আলিকে খবর দিতে গিয়ে দেগি সে পেলায় এক গর্ত খুঁড়ছে। হায়া কথা বলছি হজুর, আমি এর মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারি নি। ঘটনার পরদিন তদন্তে এসে রমেন বাবু আমাকে শুধিয়েছিলেন ঐ গর্তটা কিসের। তাঁকেও আমি কোন কৈফিয়ৎ দিতে পারিনি। আমি আজও জানি না মালিকের মনে কী ছিল! লাস যদি মাটি চাপাই দেওয়া হবে, তবে আত্মহত্যার সেই কাগজখানাটাই বা উনি রাখলেন কেন? যা হোক আমার মনে হল আজ রাত্রেই একটা হেস্ট নেস্ট হয়ে যাবে। পাছে আমার ঘাড়ে দোষ চাপে তাই তখনই, মানে বিকাল তিনটে নাগাদ আমি লক্ষ্মী সাহার দোকানে এক বোতল মদ কিনি, আর তাকে বলি আমাকে বাঁচাতে হবে! লক্ষ্মী সা', কবুল খাচ্ছি হজুর, স্বীকার করেছি। এখন দেখছি, সে বঁকে দাঁড়িয়েছে! তা তাকেও দোষ দিতে পারি না—ঐ হজুর আমাকে যেভাবে জেরায় ফেলে—মানে এখন তার লাইসেন্স নিয়েই।

বাধা দিয়ে ঘোষসাহেব বলেন, সে সব কথা থাক। সে রাত্রে কি হল বলুন।

—যা হোক, মালিক সৃজাতা দেবীকে নিয়ে বাগানবাড়িতে পৌছে আমাকে বললেন গাড়ি থেকে মদের বোতলটা নিয়ে আসতে। আমি হজুর পালাবার পথই খুঁজছিলাম, বললাম বোতলটা ভেঙে গেছে। উনি টাকা দিলেন। আমি মদ কিনতে যাবার নাম করে ঐখানেই ঘাপটি মেরে লুকিয়ে রইলাম। ঐ

রাত্রে বিনা চশমার সাইকেলে চেপে শহরে যাবার ক্ষমতাই ছিল না আমার।
কাদের আলি জানত আমি চলে গেছি। কিছুক্ষণ পরে কাদেরকেও উনি সিগ্রেট
আনতে পাঠালেন। তারপরই ঘরে পরপর দুবার পিস্তলের আওয়াজ হল।
আমি ছুটে গিয়ে দেখি মালিক চৌকাঠের উপর উবুড় হয়ে পড়ে আছেন।
এ ছাড়া আমি আর কিছুই জানিনা ভজুর, হক কথা!

—কৌশিক বাবু কখন আসেন?

—ওর একটু পরে। স্বজাতা দেবী যা বলেছেন সব সত্যি কথা ভজুর।
আমি তাঁর হাত থেকে রিভলভারটা ছিনিয়ে নিয়েছিলাম। কৌশিকবাবু
নিজে থেকেই অপরাধটা তাঁর ঘাড়ে তুলে নেন। তাঁদের দুজনের অনুরোধে
আমি রাজি হই যে বলব, ধন্যধন্য দৃশ্টা আমি নিজের চোখে দেখেছি।
কৌশিকবাবু রিভলভারটা মুছে নিয়ে মালিকের হাতে গুঁজে দেন।

ঘোষসাহেব বলেন, তাহলে তুমি কেন বললে যে স্বচক্ষে দেখেছ কৌশিক
গুলি করে আগরওয়ালকে মেরেছে?

নকুল রমেন দারোগার দিকে ফিরে বলে, বলব ভজুর?

ঘোষসাহেব রমেনকে জবাব দেবার সুযোগ না দিয়ে বলেন, তুমি বলতে
চাইশ পুলিশ এভাবে তোমাকে তালিম দিয়ে কেস সাজিয়েছে?

—আমি কিছুই বলছি না ভজুর। মিছে কথা বলা আমার অন্তায় হয়েছিল।
আমাকে মাপ করুন। আমি করজোড়ে ক্ষমা চাইছি!

রমেন দাঁড়িয়ে উঠে বলে, না স্যার, ব্যাপারটা এভাবে খামতে দেওয়া উচিত
হবে না। আমরা মোটেই এভাবে কেস সাজাইনি। উনি স্বতঃপ্রণোদিত
হয়ে পরদিন থানায় এসে এভাবে এজাহার দিয়ে যান!

সুকুমার গুপ্ত তাকে খামিয়ে দিয়ে বলেন, রমেন, তুমিও প্রমাণ করতে
পারবে না যে তুমি সাক্ষীকে এভাবে তালিম দাওনি এবং নকুলবাবুও প্রমাণ
দিতে পারবেন না যে তাঁকে পুলিশে এভাবে শিখিয়েছিল। সুতরাং ও প্রসঙ্গ
থাক—

—কিন্তু এ ধরনের প্রকাশ্য অভিযোগ—

—রমেন!—সুকুমারবাবু ভ্রুকুটি করেন। রমেন গুহ চূপ করে যায়।

সুকুমারবাবু তখন কৌশিকের দিকে ফিরে বলেন, মিস্টার মিত্র, ঘটনা
এখন যে খাতে এসে দাঁড়িয়েছে তাতে আপনাকেই প্রশ্ন করতে বাধ্য হচ্ছি।
আপনি কি কিছু বলবেন?

কৌশিক অরুণের দিকে তাকায়।

অরুণ বলে, আপত্তি নেই কিছু!

কৌশিক সংক্ষেপে বলে—আমি ঘরে প্রবেশ করার পরে ঘটনার প্রবাহ সম্বন্ধে নকুলবাবু যা বলেছেন তা সত্য; আগরওয়ালের মাথার চুল অবিনশ্রুত করতে ভুলে গিয়েছিলাম আমি।

—অর্থাৎ সূজাতাকে বাঁচাবার জন্মই আপনি ঐ ধস্তাধস্তির গল্পটা তৈরী করেন?

—এখন আর তা অস্বীকার করার মানে হয় না। যেহেতু সূজাতা নিজেই সেটা স্বীকার করে নিয়েছে।

ঘরে অস্বস্তিকর নীরবতা।

নিরঞ্জন মাইতি এতক্ষণ কোন কথা বলেন নি। এবার তিনি বলে ওঠেন, তাহলে কি সাব্যস্ত হল শেষ পর্যন্ত? সূজাতা দেবীর দ্বিতীয় গুলি, সেটা স্বেচ্ছায় হ'ক আর অনিচ্ছাকৃতই হক, আগরওয়ালের মৃত্যুর কারণ?

গণপতি বলে—এই সমাধান মেনে নিলে যখন আর কোন অসঙ্গতি দেখা যাচ্ছে না, তখন এটাকেই মেনে নিতে হবে।

বলে তিনি উঠে দাঁড়ান। আরও দু' একজন উঠে দাঁড়াতে থাকেন।

বাসুমাহেবও অনেকক্ষণ নীরবে ঘটনার প্রবাহ লক্ষ্য করছিলেন, বললেন, উঠবেন না; বসুন। আমার কাছে কিন্তু কয়েকটা ছোট অসঙ্গতি রয়ে গেল।

—কি সেগুলি? প্রশ্ন করেন গণপতি পুনরায় উপবেশন করে।

—এক নম্বর, আগরওয়াল আজ দশদিন শহরের বাইরে। কাদের আলিকে গর্ত খুঁড়ে রাখবার নির্দেশটা সে দিল কেমন করে? একা হাতে অতবড় গর্ত খুঁড়তে একটা মানুষের সারাদিন লেগে যাবার কথা। সুতরাং যার কাছেই পাক সে সকালের দিকেই সে-নির্দেশ পেয়েছিল। এখন বিকেল বেলা নকুলবাবু গর্তটা দেখে চমকে উঠলেন বলেছেন। তাহলে কার নির্দেশে সে ওটা খুঁড়েছিল?

কেউ কোন জবাব দেয় না। আবার নতুন করে ভাবতে থাকে।

—দু' নম্বর সূজাতার আত্মহত্যার স্বীকৃতিটা যে জাল এটা প্রমাণ হওয়া অত্যন্ত সহজ। শহরের অস্তিত্ব পঞ্চাশজন গল্পশ্রোতা লোক সাক্ষ্য দেবেন, যে ওটা নাটকের একটা অংশ, সূজাতার স্বহস্তে লেখা, এবং পাণ্ডুলিপির সেই

পাতাটা খোয়া গেছে। আগরওয়ালের মত বর্ণ-ক্রিমিনাল কেন ঐ পাতাটা সংগ্রহ করেছিল? তিন নম্বর, 'আত্মহত্যা' যদি প্রমাণ করতে চাইবে তাহলে গর্তটা খুঁড়ে রাখা হবে কেন? চার-নম্বর, আগরওয়ালের মত পাকা ক্রিমিনাল স্জাতার নাগালের মধ্যে পিস্তলটা রেখে বারে বারে উঠে যাচ্ছিল কেন? পাঁচ-নম্বর, স্জাতার হাতে পিস্তলটা উদ্ধত দেখেও সে অগ্রসর হয়ে আসবার সাহস পায় কি করে?

এবার গণপতি বলে ওঠে, স্জাতা দেবী মেয়ে মানুষ, তিনি—

—কিন্তু স্জাতা যে কী জাতের মেয়েমানুষ তা তো আগরওয়াল হাড়ে হাড়ে জানত।

—তবু সে যে সত্যি সত্যি গুলি করতে পারে এটা সে আশঙ্কা করতে পারেনি নিশ্চয়!

বাসুসাহেব বলেন, সে ক্ষেত্রে আমার ছয় নম্বর প্রশ্ন স্জাতা সত্যি সত্যি গুলি করতে পারে এটা স্বচক্ষে দেখেও নকুল ছই কোন সাহসে তার দিকে এগিয়ে আসে ওটা ছিনিয়ে নিতে?

এবার আর কেউ কোন জবাব দেয় না।

মাইতি বলেন, আপনার কি অনুমান?

বাসুসাহেব হেসে বলেন, অনুমান নয় মিস্টার মাইতি, এ আমার স্থির সিদ্ধান্ত! ওরা দুজনে মিলে স্জাতাকে প্রচণ্ড ভয় দেখাতে চেয়েছিল। একা আগরওয়াল নয়, কাদের আলিকে গর্ত খোঁড়ার নির্দেশ নকুল ছাড়া অন্য কেউ দিতে পারে না!

—তার মানে?

—তার মানে? রমেন, সেই তিন নম্বর কাতুর্জটা দেখি?

রমেন নিঃশব্দে গুলভরা একটা রিভলভার বাসুসাহেবের দিকে এগিয়ে দেয়। বাসু-সাহেব তার চেম্বারটা খুলে স্কুয়ার গুলু এবং ঘোষসাহেবকে দেখিয়ে বলেন, এই হচ্ছে সেই তিন নম্বর বুলেট, যা নাকি রিভলভারটার আনডিস্চার্জড অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল।

ক্ষিপ্ৰহস্তে বুলেটটা রিভলভারে ভরে নিয়ে উনি উঠে দাঁড়ান। একাঙা আয়নাটাকে লক্ষ্য করে মুহূর্তমধ্যে তিনি গুলি ছোঁড়েন। প্রচণ্ড শব্দ হল একটা; কিন্তু আয়নার কাঁচ রইল অটুট!

আসন্ন গ্রহণ করে বাসু-সাহেব বলেন, আগরওয়াল এবং নকুল ছই

স্বজাতাকে এমন ভাবে প্ররোচিত করে তোলে যাতে সে আগরওয়ালকে হত্যা করতে বাধ্য হয়। ওরা দুজনেই অকুতোভয়ে রিভলভারের মুখে এগিয়ে এসেছিল, কারণ ওরা দুজনেই জানত রিভলভারে পরপর তিনটে ব্র্যাক-কাতুঁজ ভরা আছে !

ঘরে অবস্থিকর নীরবতা।

গণপতি গলা-খাঁকারি দিয়ে সর্ব প্রথম কথা বলে—আমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলাম না !

বাবুসাহেব বলেন, আগরওয়াল আর নকুল ছই স্বজাতাকে এমন কোণঠাশা করে তুলেছিল যাতে সে আগরওয়ালকে হত্যা করতে বাধ্য হয় ! পরিকল্পনা হয়েছিল ব্র্যাক-ফায়ার হবার পরেই আগরওয়াল মৃতবৎ পড়ে অভিনয় করবে এবং ছই তৎক্ষণাৎ ঘরে ঢুকে হতচকিত হত্যাকারীকে নিয়ে পালাবে। তাকে এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখবে যেখানে সভ্য জগতের সংবাদ পৌঁছায় না। বেশীদিন নয়, পেটেন্টটা নিতে যে কদিন লাগে। তারপর ফিরে এলেও স্বজাতা আর কিছু করতে পারবে না ! অর্থাৎ আগরওয়াল জানত যে নকুল ছই মদ কিনতে যায়নি, ওখানেই লুকিয়ে বসে আছে।

গণপতি হেসে বসে. এ আপনার কষ্টকল্পনা ! প্রথমতঃ রিভলভারে তিনটে ব্র্যাক-কাতুঁজ ছিল, এটা প্রমাণ হয়নি। প্রমাণ হয়েছে যে তৃতীয় বুলেটটা যে কোন কারণেই হ'ক ফাঁকা ছিল। প্রথম দুটির একটি, সম্ভবতঃ দ্বিতীয়টি যে তাজা ছিল তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আগরওয়ালের মৃত্যু ! তিনটেই ফাঁকা বুলেট থাকলে আগরওয়াল গুলিবিদ্ধ হল কি করে ? ভৌতিক কাণ্ড নয় নিশ্চয় ?

বাবুসাহেবের চোখে বিদ্যুত খেলে গেল. বললেন, না, ভৌতিক নয়, পৈশাচিক ! ভূত শুধু মানুষকে ভয় দেখায়, পৈশাচিক উল্লাসে যে পার্টনার-ইন-ক্রাইমের সঙ্গে ডব্লু ক্রশিং করে, তাকে ভূত বলে না, বলে পিশাচ !

—কী বলছেন আপনি ?

—আমি বলছি আগরওয়ালের সহকারী জানত যে সে যদি স্বজাতাকে নিয়ে পালায় এবং আগরওয়াল যদি সেই সুযোগে পেটেন্টটা নিতে পারে তাহলে সে পাঁচ-দশ হাজার টাকা বক্শিশ পাবে। কিন্তু সে এও জানত যে পেটেন্টটা যদি সে নিজের নামে নিতে পারে তবে সে আগরওয়ালের চেয়েও ধনী হয়ে যাবে। তাই সে ভেবেছিল ব্র্যাক-কাতুঁজটা বদলে সে যদি একটা

তাজা-কাতুঁজ ওটাতে ভরে দিতে পারে তাহলেই তার পথ পরিষ্কার। স্বজাতা হত্যাকারীরূপে আত্মগোপন করবে এবং আগরওয়াল শেষ হয়ে যাবে। তাকে আর তখন পায় কে? তার পরিকল্পনা মতই কাজ হয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ অকুহলে কৌশিক এসে পড়ায় তাকে অন্য পথ ধরতে হল। তখন কৌশিকই হল তার একমাত্র বাধা। স্বজাতাকে বাঁচিয়ে সে কৌশিককে জেলে পাঠাতে চাইল কারণ সে জানত স্বজাতাকে ব্র্যাকমেল করার ব্যবস্থা তার হাতেই রইল।

অরূপ বলে উঠে—কিন্তু রিভলভারটা যতদূর জানা গেছে বরাবর আগরওয়ালের কাছেই ছিল, ফাঁকা কাতুঁজ বদল করবার সুযোগ নকুলবাবু পাবে কেমন কবে? আপনি বারে বারে বলেছেন আগরওয়াল ‘বর্ণ ক্রিমিনাল!’ যে রিভলভারের গুলি তাকে খেতে হবে তার কাতুঁজ তাজা কি ফাঁকা সেটা সে দেখে নেবে না?

বাহু হেসে বলেন, তা সে নিয়েছিল। নকুল যতবড় পাকা ক্রিমিনালই হ’ক, আগরওয়ালের পকেটে লুকানো পিস্তলের গুলি সে বদল করতে পারেনি!

গণপতি হো হো করে হেসে উঠে বলে কিছু মনে করবেন না ব্যারিস্টার সাহেব, এসব একেবারে এলোমেলো কথা হচ্ছে না? রিভলভারে তাহলে তাজা বুলেট এল কি করে? হ-নম্বর বুলেটটা যে তাজা ছিল এটা তো আমরা সবাই মেনে নিয়েছি!

বাহুসাহেব গম্ভীর হয়ে বলেন, না! আমি তো মেনে নিই নি। আমার থিয়োরি তিনটে বুলেটই ফাঁকা ছিল!

গণপতি ব্যঙ্গ করে বলে, তাহলে আমাকে আবার সেই প্রশ্নটাই পেশ করতে হয়। আগরওয়ালের মৃত্যুটা কি ভৌতিক কাণ্ড?

বাহুসাহেব বলেন, না! আগরওয়াল গুলিবিদ্ধ হয়েছিল কবি-কোম্পানীর ঐ বছরের তৈরী ঐ মডেলের আর একটি রিভলভারের গুলিতে!

গণপতি ক্র কুণ্ঠিত করে বলে, অমন একটা রিভলভার ওখানে আসবে কেমন করে?

—আঙ্ক রমেন! বাহু সাহেব গম্ভীর হয়ে জবাব দেন।

রমেন গুহ এগিয়ে এসে একখানা খাতা ঘোষসাহেবের সামনে মেলে ধরে বলে, ময়ূরকেতন আগরওয়ালের নামে জোড়া লাইসেন্স আছে তার। এক সপ্তাহে সে দুটো রিভলভার কিনেছিল আট বছর আগে। দুটোই সরাসরি কোম্পানির ঘর থেকে আনানো। স্পেশাল পারমিটে!

ঘোষসাহেব বিচলিত হয়ে পড়েন, বলেন, আই নী! সেই দ্বিতীয় রিভলভারটা কোথায়?

প্রশ্নটা করেন তিনি নকুল হুইয়ের দিকে তাকিয়ে।

—আমি জানিনা স্যার, আমি কিছুই জানিনা। থাকলে মালিকের কাছেই থাকবে। মালিকের সিঁদুকে থাকবে নিশ্চয়!

রমেন বলে, গত তেশরা নভেম্বর, অর্থাৎ ঘটনার চারদিন আগে নকুল হুই মশাই রিভলভার দুটির লাইসেন্স রিনিউ করিয়েছেন, ময়রকেতন আগরওয়ালের তরফে; ট্রেজারি চালান জমা দিয়েছিলেন নকুল হুই। অস্ত্র দুটো দেখিয়েও গিয়েছিলেন তিনি।

—তারপর সে দুটো আমি মালিককেই জমা দিয়েছিলাম হজুর। হক কথা!

বাহুসাহেব বলেন, ধনী এবং প্রতিপত্তিশালী মহামানবদের ক্ষেত্রে আইন কিছু শিথিল হয়। কেরিয়ার লাইসেন্স না থাকা সত্ত্বেও নকুল হুই প্রতি বছরই লাইসেন্স রিনিউ করিয়ে নিয়ে যেত। এবারও তাই করেছে; কিন্তু এবার আর একটিকে আগরওয়ালের মালখানায় জমা দেয়নি—

—না হজুর, এসব মিথ্যা। আমি কিছুই জানি না!

সে কথায় কর্ণপাত না করে বাহুসাহেব একই ভাবে বলতে থাকেন, জমা দেয়নি, রেখেছিল নিজের কাছে। মদের বোতল কিনতে যাবার অছিলায় সে বারান্দাতেই পিস্তল উত্তত করে প্রতীক্ষা করছিল। সূজাতা একবারই ফায়ার করেছে; দ্বিতীয় শব্দ যেটা স্বকর্ণে শুনেছে সেটা এসেছিল ওদিক থেকে। সেই বুলেটটাই আগরওয়ালের পৃষ্ঠদেশে আঘাত করে। সূজাতার হাতের রিভলভারে যে দ্বিতীয় ডিসচার্জড বুলেটটা ছিল সেটা বোধহয় অনেক আগে থেকেই ছিল ওতে!

গণপতি চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে ওঠে, বলে—আপনি এতগুলি ভদ্রলোকের সামনে এমন মানহানিকর অভিযোগ—

তাকে থামিয়ে দিয়ে বাহুসাহেব বলেন মান যার হানি হয়েছে তাঁর দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন জানা মশাই। তাঁর চেহারাই প্রমাণ দিচ্ছে এ অভিযোগ বর্ণে বর্ণে সত্যি!

নকুল হুইয়ের মুখটা ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গিয়েছিল। সেও উঠে দাঁড়ায়, বলে—কখনও নয়! আমি—আমি কিছুই জানি না! কোন প্রমাণ নেই! কোন সাক্ষী নেই!

বাসুসাহেব হেসে বলেন, মাকী আছে হুই মশাই। একেবারে প্রত্যক্ষদর্শী। আপনি যেমন লুকিয়ে বসেছিলেন বারান্দায়, মদ কিনতে যাননি, আপনার চোখে ধুলো দিয়ে আপনার মতই আর একজন ‘বর্ণ-ক্রিমিনাল’ আবার আপনার পিছনে লুকিয়ে বসেছিল। সেও সিগ্রেট কিনতে যাননি! তার এভাহারটা এবার শুধুন!

বাসুসাহেবের ইঙ্গিতে পাশের ঘর থেকে রমেন নিয়ে এল কাছের আলি মোলাকে। লম্বা সেলাম করে সে শুধু বললে—আমার মালিক দেবতা ছিলেন না হজুর। কিন্তু তিনিই আমার অন্নদাতা! কালাপানি ফেরত এ মাহুযটাকে তিনিই দানাপানি দিতেন। তাঁর ছি-চরণে কাদা ছিল, তবু সেখানেই ঠাই জুটেছিল আমার। এই কুড়া তাঁকে নিজের হাতে গুলি করে মেরেছে, আমি স্বচক্ষে দেখেছি হজুর! তা আমি কালাপানি ফেরত দাগী আসামী, আমার কথায় দারোগা বাবু পেতায় যাবেন না। আর কি বলে ভালো, ফরিয়াদি হওয়া আমার ধাতের নেই। তাই ভেবেছিলুম দুদিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকি। তারপর আমিও শোধ তুলব ঐ সম্বন্ধের পোর উপর।

নকুল হুই লাফ দিয়ে ওঠে!

কিন্তু তার আগেই রমেন বজ্রমুষ্টিতে তাকে ধরে ফেলে। একজন কন্সটেবল তার হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেয়।

বাসুসাহেব দাঁড়িয়ে উঠে বলেন, আমি দুঃখিত মিস্টার জানা, শুধু কাছের আলির সাক্ষ্য কাজ হত না। হাজার হ’ক সে একজন কনভিক্ট! তাই নকুলের নিজস্ব স্বীকৃতির প্রয়োজন ছিল যে তার এ্যালোবাইট মিথ্যা!

আর তারপর সুকুমার গুপ্তের দিকে ফিরে বলেন, এ্যাণ্ড কর য়োর ইন্করমেনসন্ স্টার, লক্ষীমাহা নেমকহারামি করেনি! সে বলেনি যে নকুল দিনের বেলা মদটা কিনে নিয়ে যায়। সে বলেছিল রাত ঠিক সাতটা পঞ্চায়ে সে এসে মদের বোতলটা কিনেছিল। আমার অনুরোধে রমেন গুটুকু মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করেছিল। মাইগু বু ‘তথ্য! তা তথ্যকে বিকৃত করতে আমি বাধ্য হয়েছিলাম সত্যের খাতিরে!

। ছাব্বিশ ।

রাত্রে ডিনার টেবিলে খেতে বসেছিলেন সবাই। পরিবারভুক্ত কজন ছাড়া সুকুমার গুপ্ত আজও উপস্থিত! কাল সকালে কলকাতা ফিরে যাবেন তিনি। প্রগতি আর কোতূহল দমন করতে পারেনা, বলে, আপনি কখন ঠিক বুঝতে পারেন দাছ যে কাণ্ডটা নকুল ছইয়ের ?

বাহুসাহেব বাঁ-হাতে ফর্ক দিয়ে মাংসের টুকরোটাকে চেপে ধরে ডান হাতে ছুরি দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করতে ব্যস্ত ছিলেন। চোখ তুলে বলেন, নিঃসন্দেহ হলাম রমেন যখন জানালো যে আগরওয়ালের জোড়া লাইসেন্স আছে, অবশ্য সন্দেহ আমার প্রথম অবস্থা থেকেই ছিল কিছুটা।

মিসেস ঘোষ বলেন, আশ্চর্য, আমরা তো নকুলবাবুকে কখনই সন্দেহ করিনি !

—স্বাভাবিক। কারণ তোমরা আমার মত অপরাধ-বিজ্ঞান নিয়ে জীবন কাটাও নি। মাঝে মধ্যে মথের গোয়েন্দা কাহিনী পড়েছ মাত্র !

প্রগতি বলে, ওভাবে এক কথায় এড়িয়ে গেলে চলবে না। আপনি ধাপে ধাপে কিভাবে এটা বুঝতে পারলেন আমাদের বুঝিয়ে বলুন।

—বলছি। যে কটা থিয়োরি আমরা পেয়েছিলাম তার প্রত্যেকটির মধ্যে কিছু না কিছু অসঙ্গতি ছিল। তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আর বিচার বিশ্লেষণ হয়েছে। কিন্তু আমার কাছে সবচেয়ে বড় অসঙ্গতি মনে হয়েছিল আগরওয়ালের আচরণ। তার মত পাকা ক্রিমিনাল কেন ঐ আত্মহত্যার স্বীকৃতিটা সংগ্রহ করল ! কেনই বা গর্তটা খোঁড়া হল ! তাছাড়া আগরওয়াল জানত যে কৌশিক তাকে দেখেছে সুজাতাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে যেতে। ফলে সুজাতাকে সে ঐভাবে হত্যা করতে পারে না। তবে তাকে ঐরকম প্রচণ্ড ভয় দেখিয়ে একে একে সকলকে সরিয়ে সে দিল কেন ? তাছাড়া তাকে ঐভাবে এ্যাবডাক্ট করে এনে তার নাগালের মধ্যে রিভলভরটা রেখে সে বারে বারে উঠেই বা যাচ্ছিল কেন ?

প্রগতি বলে, একবার কিন্তু সে সুজাতাদিকে সেটা তুলে নেবার সুযোগ দেয়নি।

—ই্যা, কিন্তু কোনবার? সেবার সে আশঙ্কা করেছিল বাইরে কারও পদশব্দ শোনা গেছে। নকুল পদশব্দ করবে না, যদি কৌশিক হয় তাহলেও তার চালাকি ধরা পড়ে যাবে। তাই সেবার সে সজ্ঞাতাকে স্বেপন দেয়নি। তারপর লক্ষ্য করলাম, আগরওয়ালকে গুলিবিদ্ধ হতে দেখেও নকুল উচ্চত রিভলভারকে উপেক্ষা করে এগিয়ে এসেছিল। এ থেকে সন্দেহ দৃঢ় হল যে সজ্ঞাতার হাতের রিভলভারে ফাঁকা-কাতুঁজই ছিল! স্বতই মনে প্রশ্ন আসে, তাহলে আগরওয়াল গুলিবিদ্ধ হল কি করে? আবার অন্তান্ত সূত্রগুলি পরীক্ষা করতে থাকি। প্রথমত: সজ্ঞাতা একবার ফায়ার করেছে, কিন্তু ছবার পিস্তলের শব্দ শুনেছে। দ্বিতীয়ত: নকুল একটা মিথ্যা ‘এ্যালোবাই’ খাড়া করবার জন্ত প্রাণপাত করেছে। তৃতীয়ত: গুলি আগরওয়ালের পিঠে লেগেছে বুকে নয়। ফলে, আমি রমেনকে খোঁজ নিয়ে দেখতে বললাম, ৩৮ বোরের কবি কোম্পানীর আর কোনও রিভলভারের লাইসেন্স ধারে কাছে অল্প কেউ পেয়েছে কিনা। রমেন পরদিনই জানাল আগরওয়ালের নামেই দুটো রিভলভারের লাইসেন্স আছে। দুটোই কবি কোম্পানির, দুটিই একই বোরের, একই বছরের তৈরী। শুধু তাই নয় ঘটনার মাত্র চারদিন আগে নকুল সে দুটির লাইসেন্স রিনিউ করিয়েছে। এ থেকে ঘটনা কি ঘটেছে তা পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, রমেনও পারল। কাল সকালেই সে বলেছিল নকুলকে এ্যারেস্ট করতে চায়! সুকুমার বাবুকেও সব কথা বলা হয়েছিল; কিন্তু আমিই আপত্তি তুলি। তখনও একটি সমস্তার সমাধান হয়নি, কাদের আলি কেন আত্মগোপন করে আছে। গতকাল রাতে রমেন আমাকে জানায় যে, কাদের আলি ধরা পড়েছে এবং সে প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে সাক্ষী দিতে চায়। তখনই বুঝলাম নাটকের স্ববনিকা আসন্ন। কিন্তু কাদের আলি খুনের মামলার দ্বীপাস্তরে গিরোচ্ছল। শুধুমাত্র তার এভিডেন্সে নকুলের বিরুদ্ধে ফাস্ট ডিগ্রি মার্ডারের চার্জ টিকত না। তার আগে নকুলকে দিয়ে কবুল করাতে হবে যে তার এ্যালোবাইটা মিথ্যা। মুশকিল হয়েছিল এই যে লক্ষী সাহা কিছুতেই স্বীকার করেনি যে রাত আটটা নাগাদ নকুল তার দোকানে আসেনি।

প্রণতি বাধা দিয়ে বলে, কিন্তু আপনি আদালতে প্রমাণ করেছেন যে রাত সওয়া আটটার আগে নকুল কিছুতেই লক্ষী সাহার দোকানে আসতে পারে না।

—সো হোরটি? তা থেকে প্রমাণ হত যে লক্ষী সাহা রাত সওয়া আটটার মত বেচেছে। আবগারী বিভাগ সে জন্ত তাকে ফাইন করতে

পারে. কিন্তু এ মামলার তাতে কি সুরাহা হত? নকুল সমস্তক্ষণ দ্বিতীয় পিস্তলটা হাতে ঐ বারান্দাতেই লুকিয়েছিল একথা প্রমাণ না হলে কেমন ভাবে প্রমাণ হবে যে নকুলের কাজ এটা? যে মুহূর্তে সূজাতা গুলি করবে, ঠিক সেই মুহূর্তেই তাকেও গুলি করতে হবে—সে যদি ঐ অবস্থায় মদ কিনতে শহরে এসে থাকে তাহলে তার এ পরিকল্পনাটাই প্রতিষ্ঠিত হয় না।

—আচ্ছা সূজাতার হাতের রিভলভারে দ্বিতীয় ডিস্চার্জড বুলেটটা এল কেমন করে?

—সম্ভবতঃ কাতুর্জগুণী সত্যই ফাঁকা কিনা সেটা নকুল আগরওয়ালের সামনেই একটা ফায়ার করে দেখেছিল বিকেল নাগাদ। বুদ্ধি করে সেটা সে খুলে নেয়নি।

—মিস্টার গুপ্ত কখন বুঝতে পারলেন? প্রশ্ন করে প্রশ্নতি।

বাসুসাহেব হেসে বলে, শুধু মিস্টার গুপ্ত একা নন, তোমার বাবাও সমস্ত ব্যাপারটা জানতেন কাল রাত্রি থেকেই!

প্রশ্নতি ঘোষ সাহেবের দিকে ফিরে বলে, তুমি জানতে বাপি?

ঘোষসাহেব জবাব দেন না। বাসু সাহেবই বলেন, ওরে বাবা! এ দারিদ্র্য কি আমি একা নিতে পারি? জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আর পুলিশের মাথাকে লুকিয়ে এতবড় কাণ্ড কি আমি করি?

এই সময় একজন আদালী এসে ট্রের উপর একখানা কাগজ নিয়ে বাসুসাহেবের দিকে বাড়িয়ে ধরে।

মিসেস ঘোষ বিরক্তি প্রকাশ করে বলেন, এত রাত্রে আবার কে দেখা করতে চায়?

আহার সমাপ্ত হয়েছিল ঔদের। বাসুসাহেব বলেন, চশমাটা নেই, ছোটখুকি দেখতো কাগজটা।

প্রশ্নতি ট্রের উপর থেকে কাগজটা তুলে নিয়ে বলে, আপনার নাতনি নাতজামাই, না নাতি-নাতবৌ তা বলতে পারব না, লেখা আছে ‘সূজাতা আর কৌশিক’।

মিসেস ঘোষ ধমক দিতে গিয়ে হেসে ফেলেন, কী কথার ছিরি!

বাসুসাহেব ডুইংকয়ের দিকে পা বাড়ান।

বাইরের ঘরে অপেক্ষা করছিল ওরা দুজন। বাসুসাহেবকে আসতে দেখে ওরা দুজনেই উঠে দাঁড়ায়। এগিয়ে এসে প্রণাম করে তাঁকে।

কৌশিক কি একটা কথা বলতে যায়, তার আগেই ওপাশ থেকে শ্রীমন্ত
মালী ডেকে ওঠে—সাব। শিগ্রির !

তিনজনেই চম্কে ওঠেন।

—কী, অমন করছিস কেন ? প্রশ্ন করেন বাহুসাহেব !

—সেই ফুলটা স্মার !

—তাই নাকি ? এস এস, তোমরাও এস—

কৌশিকের কথাটা আর বলা হয় না। দুজনের হাত ধরে বাহুসাহেব
হুড়মুড়িয়ে বাগানে নেমে পড়েন। টর্চ হাতে শ্রীমন্ত পথ দেখিয়ে আগে
আগে চলে।

—তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি !

রিভলভার গুলি খুনজখম অপরাধ-বিজ্ঞান সব পিছনে পড়ে রইল ;
বাহুসাহেব রুদ্ধশ্বাসে ছুটেছেন ফুল ফোটা দেখতে।

বাগানে নাকি আবার ফুটেছে একটি ‘নাগচম্পা’ !

শেষ

নব্য চিন্তা

নারায়ণ সান্যাল

